STEPHEN HAWKING

and LEONARD MLODINOW

THE GRAND DESIGN

Bengali Translation

By

N.C. Das

মহান নকশা

স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ ম্লোদিনাও

ভাষান্তর- এন.সি. দাস

জবাবদিহি

মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহেইমার প্রায়ই একটি কথা বলতে পছন্দ করতেন। আর তা হচ্ছে, পদার্থবিদ্যা ও কবিতা একই বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। 'দ্য গ্রান্ড ডিজাইন'-এর লেখক স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ ম্লোদিনাও বলতে চেয়েছেন যে, পদার্থবিদ্যা ও অধিবিদ্যার মধ্যে দূরত্ব কমে আসছে।

হকিং ও ম্লোদিনাও বইটিতে বলছেন, 'পদার্থবিদ্যার অমোঘ নিয়মের ফলাফল আজকের মহাবিশ্ব। এর সৃষ্টিতে ঈশ্বরের সহায়তার প্রয়োজন হয়নি। মাধ্যাকর্ষণের মতো সূত্র থাকার কারণে, মহাবিশ্ব নিজেকে শূন্য থেকেই সৃষ্টি করতে পারে এবং পারবে। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির যুক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, শূন্যতার চেয়ে বরং কিছু একটার অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা জানতে পারছি, এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ কী, আর আমাদেরই বা অস্তিত্বের কারণ কী।

বলা বাহুল্য, এর মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি আইজ্যাক নিউটনের তত্ত্ব নাকচ করেছেন। নিউটনের মতে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়নি। ঈশ্বরের মাধ্যমে এটি গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। (এর আগে, হকিং-এর বিখ্যাত বই 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'-এ পৃথিবীর সৃষ্টিতে ঈশ্বরের হাত আছে এই সম্ভাবনার কথা তিনি নাকচ করেননি)।

বইটিতে বলা হয়েছে, আজকের বহুত্ববাদী যুগে আমাদের অনেকগুলো তত্ত্ব দরকার যার মাধ্যমে আমরা বহুবিশ্বকে (মাল্টিভার্স) ব্যাখ্যা করতে পারি। মহাবিশ্বে এমন একটা পরিবেশ বিরাজ করছে যেখানে কৃষ্ণগহ্বর, অতিকৃষ্ণ গহ্বর, কৃষ্ণবস্তু, কৃষ্ণশক্তি, এম-তত্ত্ব, বিকল্প অতীত ও বিকল্প ভবিষ্যৎ রয়েছে। তাই কেবল একক মহাবিশ্ব বা এমনকি একগুচ্ছ মহাবিশ্বের ব্যাপারেই নয়, এর বাইরেও আমাদের ভাবতে হচ্ছে। আর সব মহাবিশ্বে যে একই সূত্র বা নিয়ম কার্যকর রয়েছে, আমাদের মহাবিশ্বের মতো, তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

এর অর্থ এই নয় যে, মাল্টিভার্সের প্রতিটি অংশ তার প্রতিবেশীর চেয়ে মূলগতভাবে আলাদা। তবে আমরা বিতর্ক তুলতে পারি, একগুচ্ছ বৈজ্ঞানিক সূত্র একক মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে বা একটি ছায়াপথের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও অন্য মহাবিশ্ব বা ছায়াপথের ক্ষেত্রে নাও খাটতে

পারে। এমনকি যে সূত্রগুলো আমরা স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নিয়েছি, যেমন আলোর গতিবিষয়ক সূত্র, তা নিকট-অসীমের মহাবিশ্বগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

এই বইটি মানবজাতির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করা বিভিন্ন অতিপ্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক তত্ত্বের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। একেবারে শুরু থেকে মহাবিশ্ব সম্পর্কে যতো ব্যাখ্যা এসেছে সবই আমরা জানতে পারি। বইটির শুরু হয়েছে প্রাচীন গ্রিক মনীষীদের জেগে ওঠার সময় থেকে। বিজ্ঞানী এরিস্টার্কাস (খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৩১০ থেকে খ্রিস্টপূর্বাব্দ ২৩০) হিসেব কষে দেখিয়েছিলেন, পৃথিবীর চেয়ে আকারে সূর্য বড়। অন্যান্য নত্রের মতো আমাদের পৃথিবীও একটি কক্ষপথে ঘোরে।

লেখক দুইজন বিতর্ক তুলেছেন, প্রকৃতি যদি একগুচ্ছ সূত্রের অধীনেই চলে তাহলে তিনটি উত্থিত হয়:

- ১. ওই সূত্রগুলোর ধরন কি?
- ২. সেগুলোর কি ব্যতিক্রম আছে (যেমন অলৌকিক ঘটনাসমূহ)?
- ৩. এখানে কি কেবল সমরূপ একগুচ্ছ সূত্র রয়েছে?

'দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইনে' এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। পরিবর্তনশীল বাস্তবতার মডেলের ওপর আমরা কিভাবে নির্ভরশীল তাও দেখানো হয়েছে। লেখকদের যুক্তিগুলো পৃথিবী, মহাবিশ্ব, বহুবিশ্বকে দেখার কাছাকাছি নিয়ে যায় আমাদের। যদিও এর আগের প্রজন্ম এটাকে অতিপ্রাকৃতিক বলে বাতিল করে দিয়েছিলো। এই বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে হকিং ও ম্লোদিনাও একগুচ্ছ চিন্তাসম্পদকে জড়ো করেছেন, যা সব দুর্বোধ্য জটিলতা সত্ত্বেও আধুনিক পদার্থবিদ্যা বুঝতে আমাদের সহায়তা করে।

স্টিফেন হকিং সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় দেওয়ার কিছু নেই। বইটির আরেকজন লেখক পদার্থবিদ লিওনার্দ ম্লোদিনাও ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজিতে অধ্যাপনা করেন।

এন.সি. দাস

Website: **http://nclover.page4.me**

সূচীপত্র

১

অস্তিত্বের রহস্য

আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বই খুবই কম সময়ের জন্য। আর এই ক্ষণিকের অস্তিত্বে এই মহাবিশ্বের খুব কম অংশই আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব। কিন্তু মানুষ খুবই কৌতুহলী প্রজাতি। সে জানতে চায়, উত্তর খোঁজে। এই কোমল-কঠোর পৃথিবীর বুকে জন্ম গ্রহন করে উপরের সুবিশাল মহাকাশ আর নক্ষত্রপুঞ্জ দেখে যুগে যুগে আমাদের মত মানুষ হাজারো প্রশ্ন করে গেছে: এই যে মহাবিশ্বে আমরা আছি, একে বোঝার উপায় কী? এই মহাবিশ্বের আচরণ কেমন? বাস্তবতার প্রকৃতিই বা কেমন? সবকিছু কোথা থেকে এলো? মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে কি কোনো সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন আছে? আমাদের বেশির ভাগই এসব প্রশ্ন নিয়ে সারাক্ষণ মাথা ঘামায় না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই কখনো না কখনো এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করে।

সাধারণত এ প্রশ্নগুলো ছিলো দর্শনে এখতিয়ারে, কিন্তু দর্শনের মৃত্যু ঘটেছে। দর্শন ব্যর্থ হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিক সব উন্নয়নের সাথে তাল রাখতে । এখন বিজ্ঞানীরাই সত্যের সন্ধানে আমাদের একমাত্র আলোকবর্তিকা। এই বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার এবং তাত্বিক অগ্রগতির আলোকে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। এসব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আমাদের মহাবিশ্বের এবং তাতে আমাদের অবস্থানের এক নতুন চিত্র আঁকতে সক্ষম হয়েছে যেটা গতানুগতিক চিত্র থেকে অনেকটাই আলাদা, এমনকি দুয়েক দশক আগের চিত্র থেকেও অনেক খানিই ভিন্ন। অবশ্য, এই নতুন ধারণার খসড়ার ইতিহাস প্রায় এক শতাব্দী পুরানো।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা অনুযায়ী যে কোনো বস্তু সুনির্ধারিত পথে পরিভ্রমন করে এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট অতীত থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা তার অবস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নির্ধারণ করতে পারি। যদিও দৈনন্দিন অনেক কাজেই এই ধারণা দারুণ কার্যকর, কিন্তু ১৯২০ র দিকে দেখা যায় এই 'ক্লাসিক্যাল' ধারণা দিয়ে ভৌত জগতের পারমাণবিক ও অতিপারমাণবিক স্তরে যেসব আপাত উদ্ভট ঘটনাসমূহ ঘটে সেসবের কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। তাই এর বদলে তখন একটা ভিন্ন তাত্বিক কাঠামোর আশ্রয় নিতে হয় যার নাম কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা। এসব অতিপারমানবিক ঘটনার বর্ণনায় কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনুমানগুলো খুবই নির্ভুল এবং এদেরকে যখন বৃহত্তর বস্তুসমূহের উপর প্রয়োগ করা হয় তখন ক্লাসিকাল তত্বের অনুমানসমূহের সাথে মিলে যায়। কিন্তু কোয়ান্টাম এবং ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যা ভৌত বাস্তবতার সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ধারণার উপর অবস্থিত।
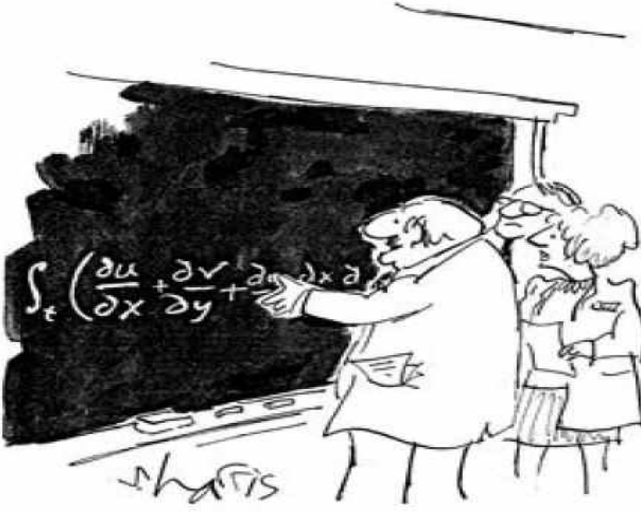
"... And *that* is my philosophy."

কোয়ান্টাম তত্ত্বকে বিভিন্ন ভাবেই বর্ণনা করা সম্ভব, তবে সবচেয়ে সহজাত (ইনটুইটিভ) বর্ণনাটা দিয়েছেন রিচার্ড (ডিক) ফাইনম্যান, ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজির একজন বর্ণিল চরিত্রের অধিকারী বিজ্ঞানী, যিনি কখনো কখনো কাছেরই একটা স্ট্রিপ বারে বঙ্গো ড্রাম বাজাতেন। ফাইনম্যানের মতে, একটা সিস্টেম শুধু মাত্র একটাই ঘটনাপ্রবাহ নয় বরং সম্ভাব্য সকল ঘটনাপ্রবাহের সমষ্টি। আমাদের উত্তর খোঁজার পথে আমরা ফাইনম্যানের এই পদ্ধতিকে বিশদে ব্যাখ্যা করব এবং এটা প্রয়োগ করে দেখবো যে মহাবিশ্বের কোনো একক ঘটনাপ্রবাহ (ইতিহাস) নেই, এমনকি এর কোনো স্বাধীন অস্তিত্বই নেই। অনেক পদার্থবিজ্ঞানীর কাছেও এটা বৈপ্লবিক কোনো ধারণা মনে হতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্য অনেক ধারণার মত এটাও আমাদের সাধারণজ্ঞানের সাথে মেলে না। কিন্তু সাধারণজ্ঞান তো তৈরি হয় দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দেখা পারমানবিক জগৎ বা আদি মহাবিশ্বের চিত্রের উপর ভিত্তি করে নয়।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের উদভবের আগে সাধারণত ভাবা হত বিশ্বের সকল জ্ঞানই সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব অর্থাৎ কোনো একটা বস্তুকে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে আমরা যেভাবে অনুভব করি বস্তুগুলি তেমনই। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের চমকপ্রদ সাফল্য- যেটা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা নয়, বরং ফাইনম্যানের ধারণার মত ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত- থেকে দেখা যায় যে বাস্তবতা তেমন নয়। তাই বাস্তবতার প্রচলিত সরল চিত্র আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সাথে সুসঙ্গত নয়। এ ধরণের বিভ্রান্তি মোকাবেলা করতে আমরা যে কৌশলের আশ্রয় নিই তাকে বলে রূপায়ননির্ভর বাস্তবতা। এই কৌশলটার পিছনে মূল ধারণা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে পাওয়া প্রেসনার সাপেক্ষে বাস্তব জগতের একটি কাল্পনিক রূপ বা কাঠামো তৈরি করে। যখন এমন একটা কাঠামো বিভিন্ন ঘটনাকে সফল ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তখন আমরা এই কাঠামোকে এবং এই কাঠামোর সকল গাঠনিক ও ধারণাগত উপাদানকে বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য বা পরম সত্য হিসাবে গ্রহন করি। কিন্তু এই একই ভৌত ঘটনাকে হয়তো অন্য কোনো ভাবেও কাঠামোবদ্ধ করা যায়, যেখানে ভিন্নতর

মৌলিক উপাদান এবং ধারণাসমষ্টি ব্যবহৃত হবে। এমন দুইটি ভিন্ন কাঠামো যখন কোনো ভৌত ঘটনাকে নিখুত ভাবে অনুমান করতে পারে তখন আর এদের একটিকে অপরটিচ চেয়ে বেশি বা কম বাস্তব হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না; বরং তখন আমরা নিজের সুবিধামত যেকোনো একটি কাঠামোকে ব্যবহার করার স্বাধীনতা পেয়ে যাই।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা একের পর এক উন্নততর তত্ব এবং ধারণা-কাঠামো আবিষ্কার হতে দেখেছি, সেই প্লেটো থেকে শুরু করে নিউটন হয়ে আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ব। এই প্র খুবই স্বাভাবিক যে, এই ধারা কি চলতেই থাকবে নাকি একটি পরম তত্বে গিয়ে থামবে, যে পরম তত্বের সাহায্যে মহাবিশ্বের সকল বল, সকল পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে? নাকি আমরা একের পর এক উন্নততর তত্ব আবিষ্কার করে যেতেই থাকবো, অর্থাৎ এমন কোনো পরম তত্বই আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না যেটার আর উন্নয়ন সম্ভব নয়? এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর আমাদের হাতে এখনো নে।ই কিন্তু আমাদের হাতে এমন একটি তত্ব আছে যেটি নিজেকে সকল কিছুর পরম তত্ব হিসাবে দাবী করতে পারে; যার নাম এম-তত্ব। এম-তত্বই এখনো পর্যন্ত একমাত্র ধারণা-কাঠামো যার সেই সকল বৈশিষ্টই আছে একটি পরম তত্বের যে বৈশিষ্টগুলো থাকার কথা। আমাদের পরবর্তি আলোচনার অনেক অংশই পরিচালিত হবে এই তত্বের উপর ভিত্তি করে।

এম-তত্বকে ঠিক একক কোনো তত্ব বলা যায় না। এটা অনেকটা এক গুচ্ছ তত্বের একটা সমষ্টি যার প্রতিটি সদস্য তত্ব ভৌত ঘটনা সমুহের কোনো নির্দিষ্ট অংশকে বর্ণনা করে। যেন একটা মানচিত্রের মত। এটা সবার জানা যে কোনো একক মানচিত্রে পুরো পৃথিবীর ভূ-তল কে দেখানো সম্ভব নয়। সমতল মানচিত্র তৈরিতে যে মারক্যাটর অভিক্ষেপ ব্যবহার করা হয়, তাতে যতই উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর দিকে যাওয়া হয় ততই ক্ষেত্রফলগুলো বিবর্ধিত করে আঁকা হতে থাকে। আর এ ধরণের মানচিত্রে কোনো ভাবেই উত্তর আর দক্ষিন মেরুবিন্দু দেখানো সম্ভব নয়। তাই পুরো পৃথিবীর একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিকৃতি তৈরি করতে হলে আমাদেরকে কোনো একক মানচিত্রের বদলে একগুচ্ছ ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্র ব্যবহার করতে হবে, যেখানে এককেটি মানচিত্র পৃথিবীর এককেটি অংশকে নির্ভুল ভাবে প্রকাশ করে। এবং মানচিত্রগুলোর কিছু অংশ একে-অপরের উপর আপতিত হলে এই আপতিত অংশও ঐ এলাকার ভূচিত্রকে নির্ভুল ভাবে বর্ণনা করবে। এম-তত্ব অনেকটা এমন। এম-তত্বের তত্বগুচ্ছের বিভিন্ন সদস্য তত্ব দেখতে অনেকসময় একে অপর থেকে ভিন্ন হলেও তাদেরকে আসলে একটি অন্তর্নিহিত একক তত্বের বিভিন্ন অংশ হিসাবে দেখা যায়। এরা হচ্ছে মূল তত্বের বিভিন্ন রূপ যার এককেটা এককে সীমায় প্রযোজ্য, উদাহরন স্বরূপ- যখন কিছু চলকের মান, যেমন শক্তির পরিমান, খুবই কম তার জন্য আছ একটি তত্ব। এ যেন সেই মারকেটর প্রজেকশন থেকে পাওয়া পৃথিবীর মানচিত্রের বিভিন্ন অংশ, যে অংশে একাধিক মানচিত্র একে অপরের উপর আপতিত হবে সে অংশেও এই তত্বসমূহের অনুমান পরস্পরের সাথে সুসংহত। আর পুরো ভূত্বকের যেমন কোনো ভালো সমতল প্রতিলিপি বা মানচিত্র নেই তেমনি তেমন কোনো একক তত্ব নেই, যেটা একাই সকল অবস্থায় সব ধরণের পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করতে পারে।
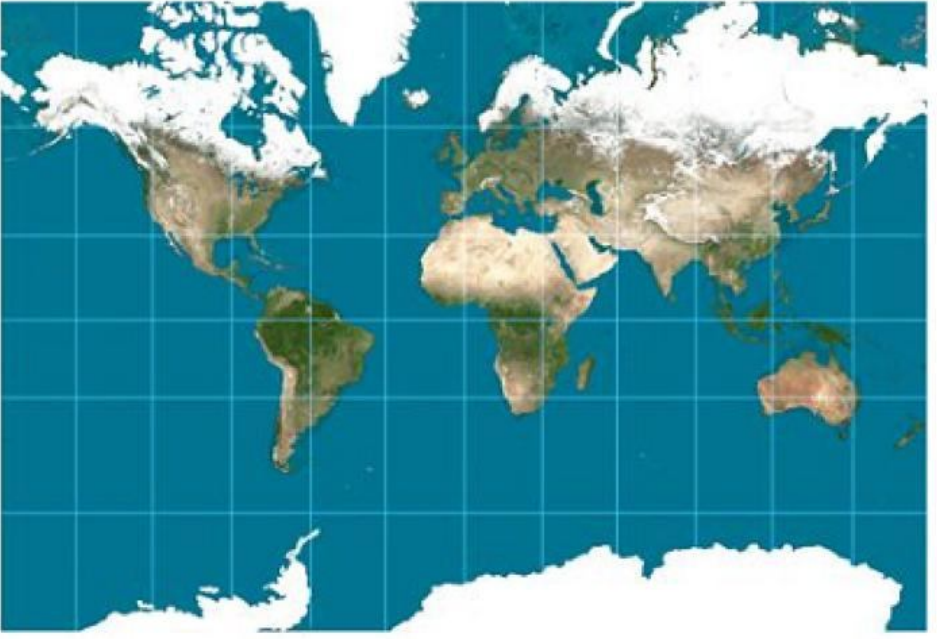
World Map It may require a series of overlapping theories to represent the universe, just as it requires overlapping maps to represent the earth.

M-তত্ব কীভাবে সৃষ্টিবিষয়ক প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারে সেটা আমরা বর্ণনা করব। এই তত্ব মতে আমাদের মহাবিশ্বই একমাত্র মহাবিশ্ব নয়। বরং, M-তত্ব বলছে একদম শূন্য থেকে বহু সংখ্যক মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে। তাদের সৃষ্টিতে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরের অংশগ্রহন প্রয়োজন নেই। বরং ভৌত সূত্রসমূহ থেকেই এই বহুসংখ্যক মহাবিশ্বের উদভব হয়। এদের উদভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই। প্রতিটি মহাবিশ্বের ঘটনা প্রবাহেরেই বহুসংখ্যক ইতিহাস আছে এবং পরবর্তি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, (যেমন বর্তমান সময়টা হচ্ছে সৃষ্টির সূচনা থেকে শুরু করে অনেক পরের একটা সময়) এরা সম্ভাব্য অনেক অবস্থাতেই থাকতে পারে। এসব অবস্থার বেশিরভাগই আমরা যে মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং কোনো ধরনের 'জীবন'-এর জন্য একদমই প্রতিকুল। এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকেই আমাদের মত প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। তাই আমাদের অস্তিত্বই সম্ভাব্য আর সব মহাবিশ্ব থেকে শুধুমাত্র যেগুলোতে আমাদের অস্তিত্ব সম্ভব সেগুলোকেই নির্দিষ্ট করে দেয়। যদিও মহাজাগতিক স্কেলে আমরা অতিব ক্ষুদ্র এবং গুরুত্বহীন কিছু, তারপরও এই যে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ঘটনা, এটাই আমাদেরকে বসিয়ে দিয়েছে অনেকটা সৃষ্টির কর্তার আসনে।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে গভীরতম উপলব্ধি লাভের জন্য তাই আমাদেরকে শুধু সবকিছু 'কীভাবে' ঘটে জানলেই হবেনা, জানতে হবে 'কেন'।

কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?
কেন আমাদের অস্তিত্ব আছে?
কেন ভৌত সূত্র সমূহের ঠিক এই সেটটাই আমরা দেখছি, অন্যরকম নয় কেন?

এটাই জীবন, মহাবিশ্ব এবং সবকিছুর পরমতম প্রশ্ন। এই বইয়ে আমরা এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চেষ্টা করব। ‘হিচহাইকারস গাইড টু গ্যালাক্সি’র মত আমাদের উত্তর শুধু “৪২” হবে না।

২

বিধিসূত্র

“Skoll the wolf who shall scare the Moon
Till he flies to the Wood-of-Woe:
Hati the wolf, Hridvitnir’s kin,
Who shall pursue the sun”. - GRIMNISMAL, *The Elder Edda*

ভাইকিং পুরাণে আছে, স্কল এবং হাটি সূর্য এবং চন্দ্রকে তাড়া করে বেড়ায়। এরা যখন কোনো একটাকে ধরে ফেলে তখনই সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়। আর তখন পৃথিবীর মানুষ চন্দ্র-সূর্যকে উদ্ধার করার জন্য খুব জোরে হৈচৈ করতে থাকে যাতে নেকড়ে দুটো পালিয়ে যায়। অন্যান্য সংস্কৃতিতেও এধরণের পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। কিন্তু মানুষ নিশ্চই একসময় খেয়াল করতে শুরু করে যে তারা হৈচৈ করুক বা না করুক চন্দ্র বা সূর্য ঠিকই গ্রহণ কাটিয়ে ওঠে। এবং আরো পরে তারা নিশ্চই এটাও খেয়াল করে যে এসব গ্রহণ এলোমেলো ভাবেও ঘটে না। বরং একটা নিয়মিত এবং পুনরাবৃত্ত ধারায় ঘটতে থাকে। চন্দ্রগ্রহণের জন্য এই ধারাটা পর্যবেক্ষণ করা বেশ সহজসাধ্য। প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ানরা এসব পর্যবেক্ষণ থেকে চন্দ্রগ্রহণের প্রায় নিখুঁত ভবিষ্যতবাণী করতে সক্ষম হয়েছিলো। যদিও তাদের এটা জানা ছিলো না যে চন্দ্রগ্রহণ ঘটে পৃথিবী সূর্যের আলো আটকে ফেলার ফলে। সে তুলনায় সূর্যগ্রহণের সময়কাল গণনা করা ছিলো অনেক কঠিন। কারণ এমনকি সূর্যগ্রহণ ঘটার সময়ও সেই গ্রহণ দেখা যায় পৃথিবীপৃষ্ঠের শুধু মাত্র ৩০ মাইল চওড়া কোনো একটা ফালি থেকে। তবু গ্রহণের এই ছন্দটা একবার বুঝে ফেললে এটা স্পষ্ট যে য়, যে গ্রহণ কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার খামখেয়ালির উপর নির্ভর করে না, বরং নির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে।
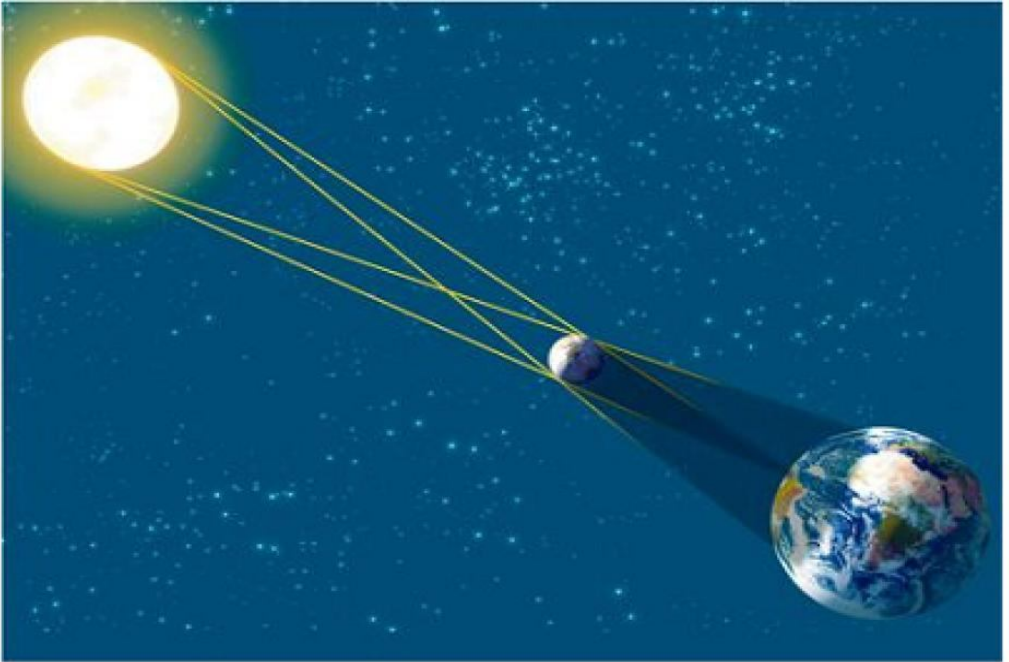
Eclipse The ancients didn’t know what caused eclipses, but they did notice patterns in their occurrence.

আদিতে আমাদের পূর্বপুরুষরা যদিও কিছু গ্রহ নক্ষত্রের গতি হিসাব করতে পেরেছিলো তারপরও প্রকৃতির বেশিরভাগ ঘটনাই ছিলো তাদের ব্যাখ্যাতীত। আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, ঝড়, মহামারি, মাংসের ভিতরে বেড়ে যাওয়া পায়ের নখ, এসবই মনে হতো যেন ঘটছে কোনো নিয়ম বা কারণ ছাড়াই। প্রাচীণকালে প্রকৃতির এসব বিধ্বংসী কর্মকান্ডকে কোনো রাগী ঈশ্বর বা ধ্বংসাত্বক দেব-দেবীর অপকান্ড বলে মনে করা হতো। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে দেখা হত দেবতাদের রাগিয়ে দেওয়ার প্রতিফল হিসাবে। উদাহরণ স্বরূপ, খৃষ্টপূর্ব ৫৬০০ বছর আগে ওরাগনের মাউন্ট মাজুমা আগ্নেওগিরিতে অগ্নুতপাত হয়, যার ফলে কয়েক বছর জ্বলন্ত কয়লা এবং আগ্নেয় শিলা বৃষ্টিপাতের মত ঝরে। এরপর বহু বছরের বৃষ্টিতে সেই জ্বালামুখ পানিপূর্ণ হয়ে ক্রেটার লেক গঠন করে। কালামাথ ইন্ডিয়ানদের পৌরাণিক কাহিনিতে এই ঘটনার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সাথে মূল ঘটনার সকল ভূতাত্বিক বর্ণনার মিল রয়েছে। সেই সঙ্গে বাড়তি নাটকিয়তা যোগ করতে তারা এই দুর্ভাগ্যের কারণ হিসাবে দায়ী করে একজন মানুষের কর্মফলকে। আসলে মানব জাতির অপরাধবোধে ভোগার ক্ষমতাটাই এমন যে, যেকোনো কিছুতেই তারা শেষমেষ নিজের কোনো না কোনো দোষ খুঁজে নিতে পারে। কথিত আছে , ভূজগতের ঈশ্বর লাও কালামাথ সর্দারের সুন্দরী মানব কন্যার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এই প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিশোধ স্বরূপ লাও পুরো কালামাথকেই আগুন দিয়ে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। কিন্তু এও কথিত আছে, যে তখন উর্ধ্বজগতের ঈশ্বর স্কেল মানব জাতির উপর সদয় হয়ে তাদের রক্ষা করার জন্য লাও এর সাথে লড়াই করে। শেষ পর্যন্ত লাও আহত হয়ে মাউন্ট মাজামার মধ্যে পড়ে যায়, এর ফলেই সৃষ্টি হয় সেই জ্বালামুখের যেটা পরে ভরে গেছে পানিতে।

প্রকৃতির নিয়ম বিষয়ক অজ্ঞতাই সেই প্রাচীন কালের মানুষদের বিভিন্ন দেবতা উদ্ভাবন করতে উদ্যত করেছে, যারা মালিকের আসনে বশে ছড়ি ঘোরাতো মানব জীবনের সকল বিষয়াদিতে। তাদের ভালোবাসার এবং যুদ্ধের জন্য দেবতা ছিলো; ছিলো সূর্যের, পৃথিবীর এবং আকাশের জন্য; দেবতা ছিলো মহাসমূদ্রের এবং নদীর, বৃষ্টির এবং বজ্রের, এমনকি ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির জন্যও দেবতা বানিয়েছিলো তারা। দেবতারা যখন সন্তুষ্ট তখন মানবজাতিকে তারা দিত সুন্দর আবহাওয়া, শান্তি, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগবালাই থেকে মুক্তি। আর যখন তারা অসন্তুষ্ট, তখনই আসতো খরা, যুদ্ধ, মহামারী আর দুর্ভিক্ষ। যেহেতু প্রকৃতিতে বিদ্যমান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘটনা তাদের অজানা ছিলো তাই তাদের দেবতাদের মনে হতো অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য, আর মানুষ ছিলো তাদের মর্জির শিকার। কিন্তু ২৬০০ বছর আগে মিলেথাসের থালেসের (আনুমানিক, খৃপূ ৬২৪ – ca খৃপূ) সময় থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। তখন প্রথম এই ধারণার উদ্ভব হয়, যে প্রকৃতি কিছু সুসংহত নিয়মাবলি মেনে চলে যেগুলোর মর্মোদ্ধার করা সম্ভব। আর এখান থেকেই দেবদেবীদের রাজত্ব হটিয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত মহাবিশ্বের ধারণার যাত্রা শুরু হয়, একদিন যার নীলনকশা আমরা পড়ে ফেলতে শিখবো।

মানবেতিহাসের সময়রেখা ধরে হিসাব করলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান একটি বেশ নবীন অভিজ্ঞা। আমাদের প্রজাতি, হোমো সেপিয়েন্স, এর উদ্ভব হয়েছিলো সাহারার দক্ষিণে আফ্রিকায় প্রায় দুলক্ষ বছর আগে। সে তুলনায় লেখ্য ভাষার সৃষ্টি হয়েছে কৃষিনির্ভর সমাজে, মাত্র সাত হাজার বছর আগে। (প্রাচীনতম যেসব লিখিত দলিলের সন্ধান পাওয়া যায় তাদের কিছুর বিষয়বস্তু ছিলো প্রতি নাগরিককে কতখানি বিয়ারের ভাগ অনুমোদন

করা হবে সে নিয়ে)। গ্রীক সভ্যতার যে প্রাচীনতম লিখিত দলিল পাওয়া যায় সেগুলো খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর, কিন্তু এই সভ্যতার শিখর অর্থাৎ 'ক্লাসিক্যাল যুগ' এর সূচনা হয় ৫০০ খৃস্টপূর্বাবদের কিছু আগে দিয়ে। অ্যারিস্টটলের (খৃপূ৩৮৪-খৃপূ৩২২) ভাষ্য মতে এই সালের কাছাকাছি সময়ে থালেস কর্তৃক এই ধারণার সূত্রপাত হয়, যে আমাদের চারিপাশে ঘটতে থাকা জটিল ঘটনাবলিকে সরলতর নিয়মের আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কোনো ধরণের পৌরাণিক বা ধর্মীয় ব্যাখ্যা ছাড়াই।

থালেসই খৃষ্টপূর্ব ৫৯৫ সালে সর্বপ্রথম সফল ভাবে সূর্যগ্রহনের সময় গণনা করে বের করতে সক্ষম হন। যদিও ধারণা করা হয় তিনি যে সূক্ষতার সাথে অনুমানটি করতে পেরেছিলেন তাতে ভাগ্যের অনেক সহায়তা পেয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন অন্তরালের মানুষ যিনি নিজের হাতে কোনো লেখা রেখে যান নি। আয়োনিয়া নামক যে অঞ্চলে তিনি থাকতেন সেখানে তার বাড়িটি ছিলো একটি অন্যতম জ্ঞানকেন্দ্র। গ্রীকরা আয়োনিয়াতে উপনিবেশ গঠন করার পরে থালেসের প্রভাব তূরস্ক থেকে সুদূর ইটালি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আয়োনীয় বিজ্ঞান- যার মূল অভিক্ষা ছিলো মৌলিক সূত্রাবলীর উন্মোচনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা করা- ছিলো মানুষের ধারণার জগতে অগ্রগতির ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক মাইলফলক। তাদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ছিলো যুক্তিনির্ভর এবং অনেক বিষয়েই তারা এমন সব উপসংহারে পৌছাতে পেরেছিলো যেগুলো আমাদের অত্যাধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে পাওয়া ফলাফলের সমতুল। এটা ছিলো একটা বিশাল সূচনা। কিন্তু এরপর কয়েক শতাব্দীব্যাপি সময়ের প্রবাহে আয়োনীয় বিজ্ঞানের অনেক কিছুই হারিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে একাধিকবার পুনরাবিষ্কৃত ও পুনরুদ্ভাবিত হয়।

কিংবদন্তি মতে, প্রথম যে গাণিতিক সূত্র প্রকৃতির একটা নিয়মকে সূত্রবদ্ধ করতে পেরেছিলো সেটা পিথাগোরাস (আনুমানিক. খৃপূ ৫৮০ – খৃপূ ৪৯০) নামক একজন আয়োনীয় আবিষ্কার করেন, সূত্রটি পিথাগোরাসের উপপাদ্য নামে পরিচিত। এ উপপাদ্য বলে: একটি সমকোনী ত্রিভূজের অতিভুজের বর্গ, সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের বর্গের সমষ্টির সমান। বলা হয়ে থাকে পিথাগোরাস বাদ্যযন্ত্রের টানা তারের দৈর্ঘ্য এবং যন্ত্রটি সে অনুযায়ী যে সুরসঙ্গতি সৃষ্টি করে তার মধ্যকার গাণিতিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। এখনকার ভাষায় বললে সম্পর্কটা হচ্ছে: একটি নির্দিষ্ট টানে টানা তারের কম্পাঙ্ক- প্রতি সেকেন্ডে তারটি কতবার কাঁপে-তারটির দৈর্ঘ্যের বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। এখান থেকেই বলা যায় বেজ গিটারের তারের দৈর্ঘ্য কেন সাধারণ গিটারের চেয়ে বেশি হবে। হয়তো এই সম্পর্কটা পিথাগোরাস নিজে আবিষ্কার করেন নি- তার নামে যে উপপাদ্য, হয়তো সেটিও তার নিজের আবিষ্কার নয়- কিন্তু এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে টানা তারের দৈর্ঘ্য আর তার কম্পাঙ্কের মধ্যকার সম্পর্ক তার সময়ে মানুষের জানা ছিলো। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এই অতি সাধারণ গাণিতিক সূত্রকেই আমরা তাত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম নিদর্শন বলতে পারি।

Ionia Scholars in ancient Ionia were among the first to explain natural phenomena through laws of nature rather than myth or theology.

পিথাগোরাসের এই তারের সূত্র ছাড়া আর যে কয়েকটি মাত্র ভৌতবিধি প্রাচীন কালে সঠিক ভাবে জানা ছিলো সেগুলোর আবিষ্কারক আর্কিমিডিস (আনুমানিক খৃপূ ২৮৭- খৃপূ ২১২), প্রাচীন যুগের উজ্জ্বলতম পদার্থবিজ্ঞানী। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায়, লিভারের সূত্র আমাদের বলে, যে খুব ক্ষীণ বলও অনেক বড় ওজন তুলতে পারে কারণ লিভার তার স্থিরবিন্দুর থেকে বলপ্রয়োগ বিন্দু দ্বয়ের দূরত্বের অনুপাতে বলকে বিবর্ধিত করে দেয়। ভাসমান বস্তুর সূত্র আমাদের বলে, যে কোনো একটা ভাসমান বস্তু সেই পরিমান উর্ধমূখী বল অনুভব করবে যতটুকু ওজনের তরল সে অপসারণ করেছে। এবং প্রতিফলনের সূত্র বলে, যে আপতিত আলোর সাথে আয়না যে কোণ সৃষ্টি করে প্রতিফলিত আলোর সাথেও আয়নাটি একই কোণ সৃষ্টি করে। কিন্তু আর্কিমিডিস এগুলোকে সূত্র বা বিধি আখ্যা দেন নি। এমনকি কোনো পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের সাপেক্ষেও সেগুলোকে ব্যাখ্যা করেন নি। বদলে তিনি এগুলোকে গাণিতিক স্বতসিদ্ধের মত করে ধরে নিয়েছেন, ঠিক যেভাবে ইউক্লিড তার জ্যামিতি সৃষ্টির জন্য স্বতসিদ্ধগুলো ধরে নিয়েছিলো।

এভাবে আয়োনীয় প্রভাব যখন বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যেতে লাগলো তখন দেখা গেল অন্য অনেকেই খেয়াল করছে যে মহাবিশ্বের মধ্যে এক ধরণের অন্তর্নিহিত সুবিন্যস্ততা আছে, যেটাকে পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে অনুধাবন করা সম্ভব। আনাক্সিমান্ডার,(আনুমানিক. খৃপূ ৬১০- খৃপূ ৫৪০) যিনি ছিলেন থালেসের বন্ধু, এবং সম্ভবত ছাত্র, যুক্তি দেখান, যেহেতু মানব শিশু জন্মের পর একদম অসহায় অবস্থায় থাকে, তাই পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষ যদি শিশু অবস্থায় হাজির হতো তাহলে সে টিকতো না। এটা হয়তো মানবেতিহাসে বিবর্তনের ধারণার প্রাচীনতম চিহ্ন। থালেসের যুক্তিতে মানুষ তাহলে নিশ্চই অন্য কোনো

প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে যাদের শিশুরা মানবশিশুর চেয়ে শক্তপোক্ত। সিসিলিতে, এম্পেডোক্লেস (আনুমানিক. খৃপূ ৪৯০- খৃপূ ৪৩০) ক্লেপ্সিড্রা নামক এক যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করেন। যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা ডালের চামচের মত। এতে লাঠির মাথায় একটি গোলকের মত থাকে যে গোলকের উপরের অংশ ফাঁকা এবং নিচে একটি ছোট্টো ছিদ্র আছে। গোলকটিকে পানিতে ডুবালে ভিতরটি পানিপূর্ণ হয়ে যায় এর পরে উপরের ফাকা অংশটা আটকে ক্লেপ্সিড্রাটি তুলে ফেললেও নিচের ছিদ্র দিয়ে পানি পড়ে যায় না। সে চিন্তা করে দেখেছিলো, যে অদৃশ্য কিছু নিশ্চই পানিকে নিচের ছিদ্রদিয়ে পড়ে যেতে বাধা দিচ্ছে- এভাবেই সে বায়ু নামক জড় পদার্থটি আবিষ্কার করে।

প্রায় একই সময়ে উত্তর গ্রীসের একটি আয়োনীয় কলোনিতে ডেমোক্রিটাস (আনুমানিক, খৃপূ ৪৬০ – খৃপূ ৩৭০) কোনো বস্তুকে বারবার ভাঙতে বা কাটতে থাকলে কী হবে সেটা নিয়ে চিন্তা করছিলেন। তার যুক্তি মতে যে কোনো বস্তুকে এভাবে অসীম সংখ্যক বার ভাগ করা যাবে না। বরং তিনি একটি স্বতসিদ্ধ প্রস্তাব করেছিলেন যে সবকিছু এমনকি সকল জীবিত সত্বাও এমন কিছু মৌলিক কণিকার সমন্বয়ে গঠিত যাদেরকে আর ভাগ করা যাবে না। তিনি এই পরমতম কণিকার নাম দিয়েছিলেন ‘এটম’ বা ‘পরমাণু’ গ্রীক ভাষায় যার অর্থ ‘অকর্তনীয়’। ডেমোক্রিটাস বিশ্বাস করতেন সকল ভৌত ঘটনা এসব পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে ঘটে। এ মতবাদকে ‘পরমাণুবাদ’ আখ্যা দেওয়া হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী, সকল অ্যাটম শূন্যে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যদি বাহ্যিকভাবে প্রভাবিত করা না হয় তাহলে তারা চিরকাল একই দিকে চলতেই থাকবে। আধুনিক কালে এই ধারণাকে আমরা বলি জড়তার সূত্র।

আমরা যে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বসবাসরত কোনো বিশেষ সত্বা নই বরং মহাবিশ্বের অতি নগন্য একদল বাসিন্দা এই যুগান্তকারী ধারণাটিতে প্রথম পৌঁছান এরিস্টার্কাস (আনুমানিক খৃপূ ৩১০ –খৃপূ ২৩০) যিনি ছিলেন অন্যতম শেষ আয়োনীয় বিজ্ঞানী। তার করা শুধুমাত্র একটি গাণিতিক হিসাবই কালের প্রবাহে টিকে আছে, যেখানে তিনি জটিল জ্যামিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়ার আকার নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। তিনি তার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই উপসংহারে পৌঁছান যে সূর্যের আকার নিশ্চই পৃথিবীর থেকে বহুগুণে বড়। আর যেহেতু ক্ষুদ্র বস্তুকেই বৃহৎ বস্তুর চারিদিকে আবর্তিত হতে হবে উলটোটা নয়,তাই তিনি প্রথম বলেন যে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র নয় বরং এটা সহ অন্যান্য গ্রহ গুলোও সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। পৃথিবী যে স্রেফ মামুলি আরেকটা গ্রহ, এই উপলব্ধি থেকে শুরু করে পরে সূর্যও যে বিশেষ কিছু নয়, এই ধারণায় পৌঁছানো বরং বেশ ছোট একটা ধাপ। এরিস্টার্কাসও এটাই সন্দেহ করেছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন তারাগুলো দূরবর্তী সূর্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনে অনেক রকম ধ্যান-ধারণাই প্রচলিত ছিলো, যাদের আবার কোনো-কোনোটার একে অপরের সাথে ছিলো প্রথাগত বিরোধ। আয়োনীয়রা ছিলো এদের মধ্যেই আরো একটি দল। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রকৃতির আয়নীয় ধারণা- যে প্রকৃতিকে কিছু সাধারণ সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা এবং এর কার্যকরণ অল্প কিছু মৌলিক নীতিতে নামিয়ে আনা সম্ভব- শক্তিশালী প্রভাব রাখতে পেরেছিলো মাত্র কয়েক শতাব্দী। এর একটা কারণ হচ্ছে আয়োনীয় তত্বে স্বাধীন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের কোনো স্থান ছিলো না, আর এই তত্ব মতে বিশ্বের পরিচালনায় ঈশ্বরদের হস্তক্ষেপের কোনো অবকাশ নেই। এসব জিনিষের এই

আকস্মিক অনুপস্থিতি তখনকার গ্রীক চিন্তাবিদদেরকে ততটাই গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো যতটা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এখনকার অনেক মানুষও। যেমন, দার্শনিক এপিকুরাস (খৃপূ ৩৪১- খৃপূ ২৭০) পরমাণুবাদের ধারণাকে বর্জন করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে "প্রাকৃতিক দার্শনিকদের ভাগ্যের 'দাস' হবার চেয়ে পৌরাণিক দেবদেবীকে অনুসরণ করা শ্রেয়।" আরিস্টটলও পরমাণুর ধারণাকে পরিত্যাগ করেন, কারণ তার পক্ষে মানুষ যে পরমাণুর মত আত্মাহীন জড়বস্তুর দিয়ে গঠিত এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। মহাবিশ্ব যে মানব কেন্দ্রিক নয় এই আয়োনীয় ধারণা ছিলো আমাদের মহাজাগতিক উপলব্ধির একটি মাইলফলক। কিন্তু এই ধারণাকে বাতিল গণ্য করার পরে সেভাবেই ছিলো প্রায় বারো শতাব্দী, গ্যালিলিওর আগ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি।

প্রকৃতি সম্পর্কে গ্রীকদের কিছু অনুমান যতই অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হোক না কেন, তাদের বেশিরভাগ ধারণাই এখনকার বিজ্ঞানের মানদন্ডে ধোপে টিকবে না। এর একটা কারণ, গ্রীকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কারক নয়, তাদের তত্বগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার লক্ষ্যে গঠিত হতো না। তাই যদি একজন পণ্ডিত দাবি করতেন যে, একটা কণিকা সরল পথে চলতেই থাকবে যতক্ষণ না এর সাথে অন্য আরেকটি কণিকার সংঘর্ষ হচ্ছে, আর আরেক পণ্ডিত যদি দাবি করতেন একটি কণিকা সরল পথে চলতে থাকবে যতক্ষণ না সেটি একটি সাইক্লপ্স এর গায়ে গোত্তা খায়; তাদের এই বিবাদ মেটানোর কোনো ব্যবহারিক পদ্ধতি তাদের জানা ছিলো না। এবং তাদের ধারণায় মানব সৃষ্ট বিধি এবং ভৌতবিধির মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিলো না। যেমন, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আনাক্সিমান্ডার লিখেছেন যে সব কিছুরই সৃষ্টি হয় একটি প্রাথমিক সারবস্তু থেকে, এবং পরে তাতেই ফিরে যায়, যদি না "তারা তাদের অসমতার জন্য জরিমানা পরিশোধ করে"। এবং আয়োনীয় দার্শনিক হেরাক্লিটাসের (আনুমানিক খৃপূ ৫৩৫- খৃপূ ৪৭৬) মতে সূর্য তার নির্দিষ্ট আচরণ করে কারণ এর অন্যথা হলে বিচারের দেবী তাকে পাকড়াও করবে। এর কয়েক শতাব্দী পরে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের দিকে স্টয়িক্স নামক একদল গ্রিক দার্শনিক মানব সৃষ্টবিধি আর প্রকৃতির ভৌতবিধির মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হন। কিন্তু তারা কিছু মানব আচরণবিধি, যেগুলোকে তারা স্বার্বিক জ্ঞান করত, যেমন- ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্যকে প্রাকৃতিক নিয়মের তালিকায় ফেলেছিলো। এমনকি তারা প্রায়ই ভৌত ঘটনাবলির বর্ণনায় আইনি পরিভাষা প্রয়োগ করতো এবং বিশ্বাস করত জড়বস্তুগুলো যাতে ভৌতবিধিগুলো ঠিকঠাক মত 'মেনে চলে' তার জন্য ভৌতবিধিগুলো এভাবে জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন রয়েছে। মানুষকে ট্রাফিক আইন মানাতেই আমরা হিমসিম খেয়ে যাই, চিন্তা করুন তো গ্রহানূদেরও যদি আইন করে করে উপবৃত্তাকার পথে চলতে বাধ্য করতে হতো, তাহলে কী অবস্থাটা দাঁড়াতো।

এই মতবাদ গ্রিকদের উত্তরসুরী চিন্তাবিদদের মধ্যেও বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিলো। ত্রয়োদশ শতকে খৃষ্টান দার্শনিক থমাস আকুইনাস (আনুমানিক ১২২৫-১২৭৪) এই মতবাদ গ্রহন করেছিলেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন এই লিখে, "এটা সুস্পষ্ট যে জড়বস্তমূহ তাদের গতিপথের শেষে পৌছায় দৈবক্রমে নয় বরং স্বেচ্ছায়... তাই নিশ্চই এমন কোনো ব্যক্তিসত্বা আছে যিনি প্রকৃতির সবকিছুকে তার গতিপথের শেষে পৌঁছানোর আদেশ দিয়েছেন"। এমনকি এই ষোড়শ শতাব্দীর স্রেষ্ট জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) বিশ্বাস করতেন যে গ্রহগুলোর অনুভব করার মত চেতনা আছে

এবং তারা সচেতন ভাবেই গতির সূত্রসমূহ মেনে চলে যেগুলো তাদের "মন" অনুধাবন করতে সক্ষম।

এই যে ধারণা, যে প্রকৃতির নিয়মগুলোও সচেতন ভাবে মেনে চলতে হয়, এ থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন চিন্তাবিদের প্রশ্ন 'কীভাবে' প্রকৃতি আচরণ করে এর চেয়ে, 'কেন' প্রকৃতি এমন আচরণ করে, এতে বেশি নিবদ্ধ ছিলো। অ্যারিস্টটল ছিলেন এই ধারণার একজন নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা যিনি পর্যবেক্ষণনির্ভর বিজ্ঞানের ধারণাকে বাতিল গণ্য করেন। অবশ্য সূক্ষ্ম পরিমাপ এবং গাণিতিক হিসাব নিকাশ সেই প্রাচীন কালে সহজসাধ্যও ছিলো না। দশভিত্তিক যে সংখ্যাব্যবস্থা এখন আমরা হিসাবের কাজে বহুলভাবে ব্যবহার করি তার যাত্রা হয়েছিলো ৭০০ সালের দিকে হিন্দুদের হাত ধরে। যারা সংখ্যাতত্বকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করেছিলো। যোগ এবং বিয়োগ চিহ্নের ব্যবহার পঞ্চদশ শতকের আগে চালু হয়নি। এমনকি ষোড়শ শতকের আগে সমতার চিহ্ন এবং সেকেন্ড ব্যবধানে সময় মাপতে পারে এমন ঘড়িরও অস্তিত্ব ছিলো না।

আরিস্টটল পরিমাপ ও হিসাবের এই বাধাকে, পরিমানগত অনুমান করতে পারে, তেমন পদার্থবিজ্ঞানের উন্নয়নে কোনো বাধা মনে করেন নি। বরং, তিনি মনে করতেন এসব হিসাব নিকাশের কোনো দরকারই নেই। এর বদলে আরিস্টটল তার পদার্থবিজ্ঞানকে দাঁড়া করিয়েছিলেন সেইসব নীতির উপর ভিত্তি করে যেগুলো তার কাছে বৌদ্ধিক আবেদন সৃষ্টি করতে পারতো। তিনি সেসব তথ্য আবেদনহীন মনে করতেন সেগুলো চেপে যেতেন এবং নিজের প্রচেষ্টাকে পুরোপুরি নিবদ্ধ করেছিলেন 'কেন' কোনোকিছু ঘটে এ প্রশ্নের প্রতি, 'কীভাবে' কিছু একটা ঘটে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে তিনি খুব কম শক্তিই ব্যয় করেছেন। অবশ্য যখন নিজের গণনার ফলাফল এতটাই বাস্তবতাবিবর্জিত হত, যে সেগুলো না পালটে আর উপায় থাকতো না, তখন তিনি হিসাবে কিছু পরিবর্তণ আনতেন। কিন্তু এইসব পরিবর্তন ছিলো অনেকটা জোড়াতালি দেওয়ার মত আপাতত ভুলচুক ঢেকে ফেলা ছাড়া যার আর কোনো দাম নেই। এভাবে তার তত্বের সাথে বাস্তবতার যত অমিলই থাকুক না কেন তিনি ঠিকই টুকটাক পরিবর্তন করে এসব সংঘাত মিটিয়ে নিতেন। যেমন তার তত্বে তিনি বলেছিলেন ভারী বস্তু তার নিজের ওজন অনুযায়ী স্থির গতিতে নিচে পতিত হয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে কোনো বস্তু যত পড়তে থাকে ততই তার গতি বাড়তে থাকে, তখন তিনি নতুন এক নীতি হাজির করেন, যে বস্তুসমূহ যতই তার নিজের লক্ষ্যের কাছে পৌছে যায় ততই সে খুশি হয়ে ওঠে এবং আরো জোরে লক্ষ্যের দিকে ছুটতে থাকে, এ নীতির সাহায্যে এক ধরণের মানুষের আচরণকে বর্ণনা করা গেলেও জড় বস্তুর আচরণ ব্যাখ্যায় এটা একদম অচল। যদিও অ্যারিস্টটলের তত্বসমূহের তেমন কোনো অনুমান ক্ষমতা ছিলো না তারপরও তার চিন্তাপদ্ধতির প্রভাব পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বছর আধিপত্য বিস্তার করেছে।

গ্রিকদের খৃষ্টান উত্তরসুরীরা, মহাবিশ্ব যে চেতনাহীন প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়, এই ধারণাকে বর্জন করেছিলো। তারা এই ধারণাকেও বর্জন করে যে মহাবিশ্ব মানুষের কোনো বিশেষ আসন নেই। এবং যদিও মধ্যযুগের দার্শনিক ধারণাগুলোতে কোনো সামঞ্জস্য ছিলো না, তবে তাদের সবার একটা মূলভাব ছিলো, যে মহাবিশ্ব হচ্ছে ঈশ্বরের খেলাঘর, এবং প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে গবেষণা করার চেয়ে ধর্মচর্চা করা বহুগুণে শ্রেয়। এমনকি ১২৭৭ সালে প্যারিসের বিশপ ট্যাম্পিয়ার পোপ জন XXI এর পক্ষ থেকে ২১৯ টি ভুলের

বা নাফরমানির একটি তালিকা প্রকাশ করেন যেগুলোকে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এসব নাফরমানির মধ্যে একটা ছিলো, এটা বিশ্বাস করা যে প্রকৃতি শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে, কারণ এ ধারণা সর্বময়ক্ষতার অধিকারী ঈশ্বরের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ। মজার ব্যাপার হলো, এর কয়েক মাস পরে পোপ জন নিহত হন মধ্যাকর্ষণ সূত্রের প্রভাবেই, যখন তার প্রাসাদের ছাদ ভেঙ্গে পড়ে তার উপর।

"If I've learned one thing in my long reign, it's that heat rises."

প্রাকৃতিক নিয়মগুলো সম্পর্কে আধুনিক ধারণার সূত্রপাত হয় সপ্তদশ শতকের দিকে। কেপলারই মনে হয় প্রথম ব্যক্তি যিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার আলোকে এই নিয়মগুলো বুঝতে সক্ষম হন, যদিও আমরা আগেই বলেছি যে তিনি জড়বস্তুকে একধরণের সত্বাজ্ঞান করতেন। গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) তার বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিক লেখনিতেই 'নিয়ম' বা 'বিধি' শব্দটি ব্যবহার করেননি (যদিও তার লেখার অনুবাদে এই শব্দটি পাওয়া যায়)। শব্দটি তিনি ব্যবহার করুন বা না করুন তিনি প্রচুর প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করতে সক্ষম হন, এবং এই ধারণার প্রসার ঘটান, যে পর্যবেক্ষণই হচ্ছে বিজ্ঞানের ভিত্তি আর বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন ভৌত ঘটনাবলির মধ্যকার পরিমাণগত সম্পর্ক নির্ণয় করা। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক নিয়মগুলোকে সুনির্দিষ্ট এবং যৌক্তিক ভাবে, যেমনটা আমরা বুঝি, সূত্রবদ্ধ করতে সক্ষম হন তিনি হচ্ছেন রেনে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০)।

দেকার্তে বিশ্বাস করতেন সকল ভৌত ঘটনা অবশ্যই নির্দিষ্ট ভরের বিভিন্ন বস্তুর সংঘর্ষের আকারে বাখ্যা করতে হবে, যেগুলো তিনটি মৌলিক সূত্র দ্বারা পরিচালিত হয়- এই সূত্রগুলো নিউটনের সূত্রের পূর্বসুরী। তিনি বলেছিলেন যে প্রকৃতির এই মৌলিক সূত্রগুলো স্থান কাল পাত্র ভেদে কার্যকর। এবং তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন এই আইন মেনে চলার অর্থ এই নয় যে এসব বস্তুর চেতনা আছে।

দেকার্তে, আমরা যাকে বলি "প্রাথমিক অবস্থা", তার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে কোনো একটা ব্যবস্থার আদি অবস্থা, নির্দিষ্ট কোনো সময় সীমার শেষে যে ব্যবস্থার শেষ অবস্থা আমরা গণনা করতে চাই। যদি একসেট প্রাথমিক অবস্থা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এরপর প্রাকৃতিক নিয়মগুলোই নির্ধারণ করে ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাটি কীভাবে বিবর্তিত হবে, কিন্তু যদি ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থার সেট নির্দিষ্ট করে দেওয়া না হয় তখন আর কোনো গণনা সম্ভব হয় না। যেমন, কোনো সময়-সীমার শুরুতে যদি মাথার ঠিক উপরে থাকা একটা কবুতর একটা পাথর টুকরা ছেড়ে দেয় তাহলে সেই পতনশীল বস্তুর গতিপথ নিউটনের সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে। কিন্তু ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আসবে যদি কতুবরটি মাথার উপর থাকা কোনো টেলিফোন তারে স্থির হয়ে বসে পাথরটা ছাড়ে অথবা ঘন্টায় ২০ মাইল বেগে উড়ে চলার সময় পাথরটি ছাড়ে। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো প্রয়োগ করতে হলে কোনো ব্যবস্থার কীভাবে শুরু হয়েছে, বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবস্থাটির অবস্থা কী সেটা জানতে হবে। (এই নিয়মগুলোর সাহায্যে সময়ের পিছনের দিকে কী ঘটেছিলো সেটাও নির্ণয় করা যায়।)

প্রাকৃতিক নিয়সমূহের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই নতুন জ্ঞানের সাথে সাথে সেগুলোকে নতুন করে ঈশ্বরের ধারণার সাথে মেলানোর চেষ্টাও চলতে থাকে। দেকার্তের মতে, ঈশ্বর ইচ্ছা করলে নৈতিকতা বিষয়ক প্রস্তাবগুলোর সত্যমিথ্যা পরিবর্তন করতে পারবে এমনকি গাণিতিক উপপাদ্যসমূহের সত্যমিথ্যাও তার ইচ্ছার অধীন, কিন্তু প্রকৃতিক নিয়মগুলো নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের সূচনা করেছেন কিন্তু এই নিয়মগুলো ছাড়া অন্য কিছু বানানোর তার আর কোনো উপায় ছিলো না; একমাত্র এগুলোই ছিলো সম্ভব। এতে মনে হতে পারে ঈশ্বরের কর্তিত্ব বুঝি খর্ব হলো, কিন্তু দেকার্তে বলেছিলেন এই নিয়মগুলো অপরিবর্তনীয় কারণ এগুলো ঈশ্বরেরই অন্তর্নিহিত প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। তাই যদি সত্যি হয় তাহলে কেউ ভাবতে পারে ঈশ্বরের হাতে নিশ্চই বিভিন্ন রকমের প্রথমিক চলক নির্ধারণ করে বিভিন্ন রকম মহাবিশ্ব তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু দেকার্তে এ সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে মহাবিশ্বের শুরুতে বস্তুসমূহের অবস্থা যেমনই হোকনা কেন সময়ের সাথে সাথে আমাদের বিশ্বের মত বিশ্বেরই উদ্ভব হতো। এ ছাড়া দেকার্তে মনে করতেন, একবার এই মহাবিশ্বকে শুরু করে দিয়ে, ঈশ্বর এটাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছেন।

একই ধরণের একটি অবস্থান (অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে) নিয়েছিলেন আইজ্যাক নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭)। নিউটন হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলো সর্বজনগ্রাহ্যতা লাভ করেছিলো তার গতির তিনটি সূত্র এবং মহাকর্ষ সূত্রের মাধ্যমে। তার সূত্রগুলোর সাহায্যে পৃথিবী, চাঁদ, সহ অন্যান্য গ্রহসমূহের কক্ষপথ নির্ণয় করা যায় এবং জোয়ার ভাটার মত ঘটনাও ব্যাখ্যা করা যায়। এই যে অল্প কিছু সমীকরণ তিনি তৈরি করেছিলেন, আর সেগুলোর উপর ভিত্তি করে যে বিস্তৃত গাণিতিক সংগঠন আমরা উপনিত হয়েছি, সেগুলো

আজও শেখানো হয়, এবং প্রয়োগ করা হয়, যখনই কোনো স্থপতি একটা বিল্ডিংএর নকশা করেন, বা কোনো প্রকৌশলি একটা গাড়ির নকশা করেন, বা একজন পদার্থবিজ্ঞানী হিসাব করেন কোন দিকে একটা রকেটকে উৎক্ষেপন করলে সেটা মঙ্গল গ্রহে গিয়ে পড়বে। যেমন কবি আলেক্সান্ডার পোপ বলেছিলেন,
"Nature and Nature's laws lay hid in night:
God said, Let Newton be! And all was light".

আজকালকার বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই বলবেন যে একটি প্রকৃতিক নিয়ম কোনো একটি ভৌত ঘটনার পুণরাবৃত্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয় এবং যা পরে ঐ পর্যবেক্ষণ ছাড়াও নতুন অনেক ঘটনা গণনা করতে পারে। যেমন, আমরা হয়তো খেয়াল করলাম যে আমাদের জীবনের প্রতিটা সকালেই পূর্বদিকে সূর্যোদয় হচ্ছে, এবং এ থেকে একটা প্রাকৃতিক নিয়ম প্রস্তাব করলাম যে, "সূর্য সবসময় পূর্ব দিকে ওঠে।" এখন এই সাধারণীকৃত নিয়মটা কিন্তু আমাদের সেই সূর্যোদয়ের অল্প কিছু পর্যবেক্ষণের বাইরের ঘটনাকেও হিসাবে আনে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরীক্ষণ যোগ্য অনুমান প্রদান করে। অন্যদিকে, "এই অফিসের কম্পিউটারগুলো কালো" এই বাক্যটি কিন্তু কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম নয় কারণ এটি শুধুমাত্র অফিসের বর্তমান কম্পিউটারগুলো সম্পর্কে বলছে এবং এর সাহায্যে "নতুন কিছু কম্পিউটার কিনলে সেগুলোও কালো হবে" এমন কোনো অনুমান করা যাচ্ছে না।

আধুনিক কালে "প্রাকৃতিক নিয়ম" বলতে কী বোঝায় সেটা নিয়ে দার্শনিকরা সুদীর্ঘ বিতর্ক করেছেন, এবং প্রথম দেখায় যতটা মনে হয় প্রশ্নটা আসলে তারচেয়েও সূক্ষ্ম। যেমন, দার্শনিক জন ডাব্লিউ. ক্যারল "সকল স্বর্ণগোকের ব্যাসই এক মাইলের কম" এই বাক্যটির সাথে তুলনা করেছেন "সকল ইউরেনিয়াম-২৩৫ গোলোকের ব্যাসই এক মাইলের কম"। বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা বলতে পারি একমাইল চওড়া কোনো স্বর্ণগোলক নেই এবং আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে ভবিষ্যতেও থাকবে না। তারপরও, এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে এটা সম্ভব নয়, তাই এই বাক্যটি কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। ওদিকে, "সকল ইউরেনিয়াম-২৩৫ গোলকের ব্যাস এক মাইলের কম" বাক্যটিকে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে ধরা যেতে পারে, কারণ নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা থেকে আমরা জানি কোনো ইউরেনিয়াম-২৩৫ গোলকের ব্যাস ছয় ইঞ্চির বেশি হয়ে গেলে সেটা পারমানবিক বিষ্ফোরণের মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে। তাই আমরা নিশ্চিত যে তেমন কোনো গোলক নেই। (এবং এরকম কিছু বানাতে যাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়)। এই পার্থক্যটা গূরত্বপূর্ণ এজন্য যে এ থেকে বোঝা যায় সব ধরণের সাধারণীকরণই প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে গ্রহনযোগ্য নয়। এবং প্রকৃতির বেশিরভাগ নিয়মই আরো বড় আকারের পরষ্পর সংযুক্ত কিছু নিয়মের একটা ব্যবস্থার অংশ।

আধুনিক বিজ্ঞানে প্রকৃতিক নিয়মগুলোকে সাধারণত গণিতের ভাষায় লেখা হয়। নিয়মগুলো হতে পারে একদম পূর্ণাঙ্গ অথবা প্রায় কাছাকাছি, কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই কোনো ধরণের ব্যতিক্রম ছাড়াই কাজ করতে হবে- সার্বিক ভাবে না হলেও অন্তত নির্ধারিত কিছু শর্ত সাপেক্ষে। যেমন, আমরা এখন জানি যে নিউটনের সূত্রগুলোকে পালটে নিতে হবে যদি গতি আলোর গতির কাছাকাছি হয়। তারপরও নিউটনের সূত্রগুলোকে আমরা প্রকৃতির নিয়ম হিসাবেই দেখি কারণ পৃথিবীতে আমরা যেসব গতির সম্মুখীন হই সেগুলো আলোর গতির চেয়ে অনেক কম তাই তারা নিউটনের সূত্র ভালো ভাবেই সিদ্ধ করে।

এখন প্রকৃতি যদি নিয়ম দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে তিনটি প্রশ্ন চলে আসে:
১. এই নিয়মাবলির উৎস কী?
২. এইসব নিয়মের কি কোনো ব্যত্যয় হয় না, মানে অলৌকিক কিছু ঘটে কি?
৩. সম্ভাব্য নিয়মসমূহের সেট কি মাত্র একটাই?

বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন ভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করেছেন। প্রথম প্রশ্নটার যে সনাতন উত্তরটা দেওয়া হয় – কেপলার, গ্যালিলিও, দেকার্তে এবং নিউটন যে উত্তর দিয়েছিলো- সেটা হচ্ছে প্রকৃতিক নিয়মগুলো ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। অবশ্য এভাবে বললে তা ঈশ্বরকেই প্রকৃতিক নিয়মাবলীর সমষ্টি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার চেয়ে বেশি কিছু হয় না। কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে বাইবেলীয় গুণাবলী দ্বারা ভূষিত না করে তাহলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হিসাবে ঈশ্বরকে দেখানো স্রেফ একটা রহস্যকে আরেকটা রহস্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করারই নামান্তর হয়। আর তাই আমরা যদি ঈশ্বরকে প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সাথে জড়িত করি তখন মূল প্যাঁচটা লাগে দ্বিতীয় প্রশ্নে এসে: অলৌকিক কিছু কি ঘটে, যা এসব প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর নিয়ে মতামতের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্লেটো এবং আরিস্টটল যারা ছিলো সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রাচীন গ্রিক চিন্তাবিদ, তাদের মতে প্রকৃতির নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি বাইবেলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তাহলে দেখা যায়, ঈশ্বর শুধু নিয়মগুলো সৃষ্টিই করছেন না, বরং তার কাছে দেন দরবার করে তাকে দিয়ে এসব নিয়মের বত্যয় ও ঘটিয়ে নেওয়া সম্ভব। যেমন চাইলেই তিনি মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন, খরাকে থামিয়ে দিতে পারেন আগে আগেই, এমনকি ক্রোকুয়েটকে অলিম্পিক গেম হিসাবে পুনপ্রতিষ্ঠাও করতে পারেন। দেকার্তের ধারণার বিপরীতে গিয়ে, প্রায় সকল খৃষ্টান চিন্তাবিদই মনে করেন ঈশ্বরের হাতে অবশ্যই প্রাকৃতিক নিয়মগুলো স্থগিত করার ক্ষমতা আছে যেন তিনি অলৌকিক ঘটনাবলি ঘটাতে পারেন। এমনকি নিউটনও এক ধরণের অলৌকিকে বিশ্বাস করতেন। তিনি ভেবেছিলেন গ্রহসমূহের কক্ষপথগুলো অস্থিতিশীল হওয়ার কথা কারণ গ্রহগুলো একে অপরের উপর মহাকর্ষীয় বল প্রয়োগ করবে এবং এর ফলে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে সেটা সময়ের সাথে সাথে বাড়তেই থাকবে এবং হয় একসময় তারা সূর্যে পতিত হবে অথবা সৌরজগত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর নিশ্চই এই কক্ষপথকে বার বার পূনর্স্থাপন করেন, মানে ব্যাপারটা অনেকটা "সময় সময় ঘড়িতে চাবি দিয়ে সচল রাখার মত।" অবশ্য, পিয়েরে-সিওন, মারকুইস দ্য ল্যাপ্লাস (১৭৪৯-১৮২৭), যিনি ল্যাপলাস নামেই বেশি পরিচিত, যুক্তি দেখান যে গ্রহদের এই বিচ্যুতি ক্রমবর্ধনশীল হবার বদলে হবে পর্যায়বৃত্ত, অনেকটা পুনরাবৃত্ত চক্রের মত। ফলে সৌরজগত নিজেই নিজেকে ঠিকঠাক করে ফেলবে, তাই এটা কেন আজও টিকে আছে তার ব্যাখ্যায় কোনো ঐশ্বরইক হস্তক্ষেপ আনার প্রয়োজন নেই।

বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাবাদের অনুমিতিগুলোকে প্রথম সুস্পষ্টভাবে প্রস্তাব করার কৃতিত্ব ল্যাপ্লাসের। তিনি বলেন, যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র মহাবিশ্বের অবস্থা দেওয়া থাকে, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের একটা পরিপূর্ণ সেট অতীত ও ভবিষ্যত সব কিছুই নির্ধারণ করবে। এর ফলে অলৌকিক কিছু ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই সাথে ঈশ্বরের সক্রিয় ভুমিকা নাকচ হয়ে যায়। ল্যাপ্লাস যে বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাবাদের সূত্রায়ন করেছেন সেটাই দ্বিতীয় প্রশ্নে আধুনিক বিজ্ঞানীদের উত্তর। পুরো আধুনিক বিজ্ঞানের মূলভিত্তিই হচ্ছে এই বৈজ্ঞানিক

নিশ্চয়তাবাদ, এবং এই পুরো বই জুড়েই এই নীতিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে। কোনো অতিপ্রাকৃত সত্ত্বা নাক গলাবে কি না গলাবে তার উপর নির্ভর করে যে বৈজ্ঞানিক সূত্র সেটা কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র হতে পারে না। কথিত আছে এসব জানার পরে নেপোলিয়ন ল্যাপ্লাসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মহাবিশ্বের এই চিত্রে ঈশ্বরের যায়গা কোথায়? ল্যাপ্লাসের উত্তর ছিলো, "স্যার, ঐ হাইপোথিসিসটার আমার কোনো প্রয়োজন পড়েনি।"

যেহেতু মানুষও মহাবিশ্বেই বাস করে এবং অন্যান্য বস্তুসমূহের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহন করে সেহেতু এই বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাবাদ মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অবশ্য অনেকেই আছে যারা ভৌত জগতে এই নিশ্চয়তাবাদ কাজ করে মানলেও মানুষকে তার বাইরের কিছু মনে করে, কারণ তাদের বিশ্বাস আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। দেকার্তে এই মুক্তইচ্ছার ধারণাকে রক্ষা করার জন্য বলেছিলেন মানব মন ভৌত জগত থেকে আলাদা, ফলে ভৌতবিধিগুলো মেনে চলে না। তার মতে মানুষের গাঠনিক উপাদান দুইটি, শরীর এবং আত্মা। শরীর একটা মামুলি যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়, কিন্তু আত্মা বৈজ্ঞানিক নিয়মসমূহের উর্ধ্বে। শরীরতত্ব এবং অঙ্গসংস্থানত্বে দেকার্তের প্রচন্ড আগ্রহ ছিলো। পিনিয়াল গ্রন্থি নামক মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যকার একটা অঙ্গকে তিনি আত্মার মূল আসন মনে করতেন। তার বিশ্বাস ছিলো এই গ্রন্থিতেই আমাদের সকল চিন্তার উৎপত্তি হয়, এখান থেকেই বহে আমাদের মুক্তইচ্ছার ফল্গুধারা।
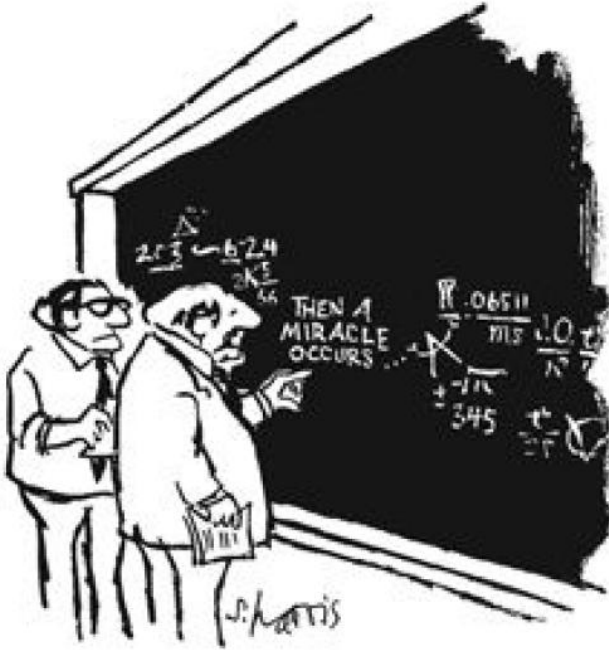
"I think you should be more explicit here in step two."

মানুষ কি স্বাধীন ইচ্ছা করতে সক্ষম? আমাদের যদি মুক্তইচ্ছা থেকেই থাকে তাহলে বিবর্তনের ঠিক কোন ধাপে সেটার উদ্ভব হয়েছে? নীল-সবুজ শৈবাল বা ব্যাক্টেরিয়াদের কি মুক্তইচ্ছা আছে, নাকি তাদের আচরণ স্বয়ংক্রিয়, বৈজ্ঞানিক ভাবে সূত্রবদ্ধ? শুধু বহুকোষী জীবেরই কি মুক্তইচ্ছা আছে, নাকি শুধু স্তন্যপায়ী প্রাণীদের? আমরা ভাবতে পারি যে একটা শিম্পাঞ্জি হয়তো নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই কলাটা চিবাচ্ছে, বা বিড়ালটা সোফা ছিড়ে কুটিকুটি করছে, কিন্তু তাহলে Caenorhabidis elegans নামক গোলকৃমির কথা কী বলব,যেটা শুধু মাত্র ৯৫৯টা কোষ দিয়ে গঠিত? সে নিশ্চই কখনো ভাবে না, "ওই যে, ওই মজার ব্যাকটেরিয়াটা আমি এখন মচমচিয়ে খাবো", কিন্তু দেখা যায় এমনকি তারও নির্দিষ্ট পছন্দ-অপছন্দ আছে এবং নিকটবর্তী অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সে হয় কোনো অনাকর্ষণীয় খাবারেই সন্তুষ্ট হয়, অথবা ছুটে যায় আরো ভালো কিছুর দিকে। এটা কি মুক্তইচ্ছার বহিপ্রকাশ?

যদিও আমরা ভাবি যে আমাদের মুক্ত ইচ্ছার ক্ষমতা আছে তারপরও আনবিক জীববিদ্যার জ্ঞান থেকে জানা যায় সকল জৈব প্রক্রিয়াই পদার্থবিজ্ঞান আর রসায়ণের সূত্রাবলি মেনে চলে, তাই তারা ঠিক ততটাই সুনির্ধারিত যতটা সুনির্ধারিত গ্রহসমূহের কক্ষপথ। স্নায়ুবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহ এই ধারণাকেই সমর্থন করে যে আমাদের মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের পরিচিত সূত্রগুলো মেনেই কাজ করে, এবং আমাদের সব ধরণের কর্মকান্ড নির্ধারণ করে, প্রকৃতির নিয়মের উর্ধের কোনো আজব কিছুর হাতে এই নিয়ন্ত্রণ নেই। জাগ্রত অবস্থায় রোগীর মস্তিষ্কে অপারেশন করার সময় এটা দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বৈদ্যুতিক ভাবে উদ্দীপ্ত করে রোগীর মধ্যে হাত-পা নাড়ানোর, ঠোঁট নাড়ানোর, এমনকি কথা বলার আকাংক্ষা সৃষ্টি করা সম্ভব। আমাদের সকল আচরণ যদি ভৌত বিধিগুলো দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তাহলে এখানে মুক্তইচ্ছার অবস্থান কোথায় সে চিন্তা করা দুষ্কর। তাই দেখা যাচ্ছে আমরা কিছু জৈব যন্ত্র ছাড়া কিছুই নই, এবং 'মুক্তইচ্ছা' শুধুই একটা বিভ্রম।

যদিও আমরা মানি যে মানুষের আচরণ অবশ্যই পুরোপুরি প্রকৃতির নিয়মগুলো দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয় তারপরও এই আচরণ এত বেশি সংখ্যক চলকের উপর নির্ভর করে যে একে গণনা করা বাস্তবে অসম্ভব। কারণ এই হিসাবের জন্য কাউকে মানব দেহের লক্ষ-লক্ষ-কোটি কণিকার আদি অবস্থা জানতে হবে এবং প্রায় সমসংখ্যক সমীকরণ সমাধান করতে হবে। এসব হিসাব করতে যে কয়েক বিলিয়ন বছর লাগবে তাতে এত দেরী হয়ে যাবে যে সামনের লোকটা ঘুষি দিতে শুরু করলে মাথাটা সরিয়ে নেওয়ার আর সময় হবে না।

যেহেতু মৌলিক ভৌতবিধিসমূহ হিসাব করে মানব আচরণ অনুমান করতে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়,সেহেতু এই কাজে আমরা এক ধরণের কার্যকর তত্ব ব্যবহার করি। পদার্থবিজ্ঞানে কার্যকর তত্ব হচ্ছে এমন একটা গাণিতিক সংঠন যেটার সাহায্যে কোনো পর্যবেক্ষণলব্ধ ঘটনাকে হিসাবের আয়তায় আনা যায় ভিতরের বিশদ প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি না ধরেই। উদাহরণ স্বরুপ, আমরা চাইলেই একটা মানুষের শরীরের প্রতিটি পরমাণুর সাথে পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণুর মহাকর্ষীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমীকরণগুলো সমাধান করতে পারি না। কিন্তু সকল ব্যবহারিক কাজের জন্য একজন মানুষ আর পৃথিবীর মধ্যে মহাকর্ষীয় বল মাত্র কয়েকটা সংখ্যার সাহায্যেই গণনা করা যায়, যার একটা সংখ্যা হচ্ছে মানুষটির মোট ভর। একই ভাবে, জটিল সব অণু-পরমাণুর মধ্যে যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলে সেগুলোর

নিয়ন্ত্রণকারী সমীকরণগুলোকে আমরা সমাধান করতে পারি না। কিন্তু আমরা রসায়ণ নামক একটি কার্যকর তত্ব উদ্ভাবন করতে পেরেছি যেটা অণু-পরমাণুর অনেক খুঁটিনাটি হিসাবে না এনেই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু তাদের আচরণ নির্ধারণকারী সমীকরণগুলো সমাধান করতে পারি না সেহেতু আমরা একটা কার্যকর তত্ব ধরে নেই, যে তাদের মুক্তইচ্ছার ক্ষমতা আছে। মনোবিজ্ঞান নামক বিজ্ঞানের একটি শাখায় মানুষের এই ইচ্ছা এবং সে থেকে উদ্ভুত আচরণের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থনীতিও একটি কার্যকর তত্ব যেখানে ধরে নেওয়া হয় যে মানুষের মুক্তইচ্ছা করার ক্ষমতা আছে এবং সে বিকল্প সকল সিদ্ধান্ত বিচার করে সবচেয়ে সেরাটা গ্রহণ করতে সক্ষম। মানুষের আচরণ বর্ণনায় এই কার্যকর তত্বটির মাঝারি সাফল্য দেখা যায় কারণ আমরা সবাই জানি, যে অনেক সময়ই মানুষের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো ঠিক যৌক্তিক নয় অথবা এর পিছনে আছে ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণ। এই কারণে দুনিয়াটার এই বেহাল দশা।

তৃতীয় প্রশ্নে জানতে চাওয়া হচ্ছে প্রকৃতির যে নিয়মগুলোর দ্বারা মহাবিশ্ব এবং মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলো অদ্বিতীয় কিনা। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর যদি হয় ঈশ্বর এই নিয়মগুলো সৃষ্টি করেছে, তখন যে প্রশ্নটা আসে সেটা হলো, এই নিয়মগুলো বাছাইয়ের সময় ঈশ্বরের হাতে অন্য কোনো পছন্দের অবকাশ ছিলো কিনা। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল উভয়েই,এবং পরবর্তীতে আইনস্টাইনও দেকার্তের মত মনে করতেন যে প্রকৃতির মৌলিক নীতিগুলোর সৃষ্টি হয়ছে “প্রয়োজনের নিমিত্তে” কারণ সেগুলোই একমাত্র নিয়মগুচ্ছ যেগুলো যৌক্তিক। এই যে বিশ্বাস, যে প্রকৃতির নিয়মগূলোর উৎস হচ্ছে যুক্তি, এটার কারণে আরিস্টটল এবং তার অনুসারীরা মনে করতেন যে প্রকৃত ভৌতঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ না করেও, কেউ শুধুমাত্র যুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির মৌলিক নিয়মগুলোকে “প্রতিপাদন” করা সম্ভব। ভৌত নিয়মগুলো কী, সে চিন্তা না করে বস্তুসমূহ কেন ভৌত নিয়ম মেনে চলে এই চিন্তায় বেশি নিবদ্ধ হওয়ায় তিনি মূলত কিছু বর্ণনামূলক নিয়ম পেতে সক্ষম হন। তার এই চিন্তাধারা যদিও এর পরে কয়েক শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাকে কর্তৃত্ব করেছে, তবু তার বর্ণনা করা অনেক নিয়মই ছিলো ভুল আর আসল কথা সেগুলো তেমন কোনো কাজে লাগতো না। মানুষ এই অ্যারিস্টটলীয় ধারণার কর্তৃত্বকে খর্ব করার সাহস দেখায় অনেক পরে, যেমন গ্যালিলিও ‘খাঁটি যুক্তি’ অনুযায়ী কী ঘটা উচিত, তার বদলে প্রকৃতিতে আসলেই কী ঘটছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন।

এই বইয়ের ভিত্তিমূল নিহিত আছে বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাবাদের ধারণায়, তার মানে দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে ‘অলৌকিক’ ঘটনা বলে কিছু নেই এবং প্রকৃতির নিয়মগুলো অলংঘনীয়। আর এক ও তিন নাম্বার প্রশ্ন- প্রকৃতির নিয়মগুলো কীভাবে এলো এবং এরাই একমাত্র সম্ভাব্য নিয়ম কিনা- নিয়ে আমরা সামনে গভীর আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখে নেব প্রকৃতির নিয়মগুলো আসলে কোন জিনিষকে বর্ণনা করে। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই বলবেন যে এ নিয়মগুলো হচ্ছে বহির্জগতের একটি গাণিতিক প্রতিবিম্ব যার অস্তিত্ব পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আর সেই পর্যবেক্ষণের আলোকে আশেপাশের জগৎ সম্পর্কে ধারণা গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করি তাহলে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হই, সেটা হলো- আমাদের কি এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ আছে, যে নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা বলে কিছু আছে?

UNITED STATES
20c

৩

বাস্তবতা কী?

ক'বছর আগে ইটালির মনজা নগরীর নগর পরিষদ গোলাকার পাত্রে গোল্ডফিশ রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। এই সিদ্ধান্তের সমর্থকদের একটা যুক্তি ছিলো, এধরনের বক্রতলওয়ালা পাত্রে গোল্ডফিশ রাখাটা নিষ্ঠুরতা, কারণ এতে গোল্ডফিশটা বাইরে তাকিয়ে বাস্তবতার একটা বিকৃতরূপ দেখে। কিন্তু আমরা নিজেরাই বাস্তবতার যে চিত্র দেখি সেটাই বা কতটা সত্য? কিভাবে জানবো যে সেটাও বিকৃত নয়? এমন কি হতে পারে না, যে আমরাও একটা বৃহৎ গোল্ডফিশের পাত্রে আছি এবং আমাদের দৃষ্টিও একটা বিশালাকার লেন্সের কারণে বিকৃত হচ্ছে? গোল্ডফিশটির বাস্তবতার চিত্রটা হয়তো আমাদের থেকে আলাদা, কিন্তু আমরা কি নিশ্চিত হতে পারি যে সেটা আমাদের চাইতে কম বাস্তব?

পাত্রে থাকা গোল্ডফিশের দৃষ্টি আমাদের নিজেদের মতো না, তবুও গোল্ডফিশটা কিন্তু চাইলে তার দেখা বাইরের জগতের বস্তুগুলোর গতিসূত্র প্রতিপাদন করতে পারবে। যেমন এই গোলীয় বিকৃতির কারণে পাত্রের বাইরে সোজাপথে চলা কিছুকে পাত্রের ভিতর থেকে দেখে মনে হবে চলছে বক্র পথে। কিন্তু তারপরেও, গোল্ডফিশের সেই গোলীয় নির্দেশ কাঠামো থেকেই বেশকিছু বৈজ্ঞানিক সূত্র প্রতিপাদন করা সম্ভব। যেগুলো বস্তুর সেই আপাত বক্রগতিকেই হিসাব করতে পারে এবং এর সাহায্যে সবসময় বাইরের গতিশীল বস্তুসমূহের গতিপথ গণনা করা যায়। সংগত কারণেই গোল্ডফিশের সূত্রগুলো হবে আমাদের সূত্রগুলো থেকে জটিলতর। কিন্তু কোনো গাণিতিক সূত্রকে জটিল বা সহজ মনে করাটা স্রেফ একটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। এখন গোল্ডফিশের পক্ষে যদি এমন একটি সঠিক তত্ত্ব সূত্রায়ন করা সম্ভব হয়, তাহলে গোল্ডফিশের দেখা জগতটাকেও বাস্তবতার একটা গ্রহণযোগ্য চিত্র হিসাবেই মেনে নিতে হবে।

বাস্তবতার এরকম ভিন্নতর চিত্রের একটা বিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে ১৫০ সালের দিকে টলেমির (ca ৮৫ – ca ১৬৫) করা মহাকাশীয় বস্তুসমূহের গতির গাণিতিক রূপায়ন। টলেমি তার কাজ তেরো খন্ডের একটা বই আকারে প্রকাশ করেন, যার আরবি শিরোনাম ছিলো, আলমাজেস্ত। আলমাজেস্তের শুরুতে টলেমি কারণ দেখিয়েছেন কেন তিনি পৃথিবীকে গোলকীয়, চিরস্থির, মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং মহাকাশের বস্তুসমূহের দূরত্বের তুলনায় নগণ্য আকারের মনে করছেন। যদিও আরিস্টারকাসের সূর্যকেন্দ্রিক রূপায়ন ততদিনে জানা ছিলো, তারপরও অ্যারিস্টটলের পর থেকে শিক্ষিত গ্রিকরা মহাবিশ্বের পৃথিবীকেন্দ্রিক রূপকেই গ্রহণ করে। অ্যারিস্টটল আধ্যাত্মিক কোনো কারণে পৃথিবীকেই মহাবিশ্বের কেন্দ্র মনে করতেন। টলেমির মডেলে সবকিছুর কেন্দ্রে স্থির দাঁড়িয়ে ছিলো পৃথিবী; আর অন্য সব গ্রহ-নক্ষত্র এপিসাইকেল, মানে চাকার উপর চাকা যেভাবে ঘোরে তেমন, আকৃতির কক্ষপথে মহাকাশে ঘোরাফেরা করত।

The Ptolemaic Universe In Ptolemy's view, we lived at the center of the universe.

এই রূপায়ন একদম স্বাভাবিক মনে হবার কারণ আমরা কখনো আমাদের পায়ের নিচে পৃথিবী সরছে সেটা অনুভব করি না (ভূমিকম্প আর আবেগঘন পরিস্থিতি ছাড়া)। পরবর্তীতে এসব গ্রিক ধারণার উপর ভিত্তি করেই ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান গড়ে ওঠে, আর এভাবেই অ্যারিস্টটল আর টলেমির ধারণাগুলো স্থান করে নেয় পশ্চিমা চিন্তার ভিত্তিমূলে। ক্যাথলিক চার্চ মহাবিশ্বের টলেমীয় রূপায়নটাকে গ্রহণ করে এবং তখন থেকে প্রায় চৌদ্দশো বছর কোনো ঘটনা ছাড়া এটাই ছিলো তাদের আনুষ্ঠানিক মতবাদ। এরপর ১৫৪৩ সালের আগে মহাবিশের আর বিকল্প কোনো রূপায়ন প্রস্তাব করা হয়নি। এ বছর কোপার্নিকাস তার 'মহাকাশীয় গোলকসমূহের আবর্তন' (On the revolutions of Celestial Spheres) নামক বইটি প্রকাশ করেন, তিনি মারাও যান সেই বছরেই (অবশ্য এ বিষয়ে কাজ করছিলেন প্রায় কয়েক দশক ধরে)।

কোপার্নিকাসও তার সতেরশ বছর আগেকার মনিষী অ্যারিসটারকাসের মতো এমন একটি বিশ্বের বর্ণনা দেন যেখানে সূর্য স্থির আছে এবং গ্রহগুলো তার চারপাশে বৃত্তাকার পথে আবর্তিত হচ্ছে। এই ধারণাটা যদিও নতুন নয়, কিন্তু এর পুনর্জাগরণকে শুরুতে তীব্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সবাই মনে করছিলো কোপার্নিকাসের বক্তব্য বাইবেলের বিরুদ্ধ। কারণ তখন বাইবেলের যেভাবে অর্থ করা হতো, তাতে মনে হত এটা বলছে সকল গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, যদিও বাইবেলে কোথাও স্পষ্ট করে সে কথা বলা নেই। আসলে, যে যুগে বাইবেল লেখা হয়েছিলো সে যুগে মানুষ মনে করত পৃথিবী চেপ্টা। পরবর্তীতে সৌরজগতের কোপার্নিকাসীয় মডেল, পৃথিবী আসলে স্থির কি না, তা নিয়ে তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয়। কোপার্নিকাসীয় ধারণাকে সমর্থন করায় এবং "পবিত্র গ্রন্থে একরকম বলে দেওয়ার পরেও একটা ভিন্ন মত ধারণ এবং তা রক্ষার চেষ্টা" করার দায়ে ১৬৩৩ সালে গ্যালিলিওকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত করার পরে তাকে বাকি জীবন গৃহবন্দি করে রাখা হয় এবং নিজের বক্তব্য প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়। শোনা যায় তখনো তিনি বিড়বিড় করে বলছিলেন, "Eppur si muove", "তবুও এটা ঠিকই গতিশীল"। অবশেষে ১৯৯২ সালে রোমান ক্যাথলিক চার্চ স্বীকার করে যে গ্যালিলিওকে দোষী সাব্যস্ত করা তাদের ভুল ছিলো।

তাহলে বাস্তব কোনটা, টলেমীয় নাকি কোপার্নিকাসীয় ব্যবস্থা? যদিও প্রায়ই শোনা যায় মানুষ বলছে, কোপার্নিকাস টলেমিকে ভুল প্রমাণিত করেছেন, কিন্তু সে ধারণাটা সত্যি নয়। ব্যাপারটা অনেকটা ঐ আমাদের দেখা আর গোল্ডফিশের দেখার মধ্যকার তুলনাটির মতো। আসলে যে কোনো একটা চিত্র ব্যবহার করেই মহাবিশ্বের সঠিক রূপায়ন করা সম্ভব কারণ আমাদের মহাকাশ বিষয়ক পর্যবেক্ষণগুলো পৃথিবী বা সূর্য যেকোনো একটাকে স্থির ধরেই ব্যাখ্যা করা যায়। এ ধারণা মহাবিশ্বের প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিক বিতর্কে আগুন যোগালেও, বাস্তবে কোপার্নিকাসীয় রূপায়নের যেটা আসল গুণ সেটা হচ্ছে, সূর্যকে স্থির ধরলে গতির সূত্রগুলো বেশ সহজ আকারে আসে।

একটা ভিন্ন ধরনের বিকল্প বাস্তবতার দেখা পাওয়া যায় 'দ্য মাট্রিক্স' নামক চলচ্চিত্রে। এখানে পুরো মানব জাতি নিজের অজান্তেই বাস করতে থাকে একটা গণানুকৃত কল্পবাস্তবের জগতে। কম্পিউটারের স্মৃতির মধ্যে সেই জগতটিকে তৈরি করেছে বুদ্ধিমান কম্পিউটাররা। মানুষের মনকে সেই কল্পজগতে আটকে রাখার ফলে তাদের শরীর থেকে জৈবতড়িৎ শক্তি (সে যা-ই হোক) শুষে নেওয়ার সময়ও তারা সন্তুষ্ট ও সচল থাকে। হয়তো এমন দিন খুব বেশি দূরে নয়, কারণ এমনকি আজকালও প্রচুর মানুষ 'সেকেন্ড লাইফ' নামক ওয়েবসাইটে কল্পবাস্তব একটা জগতে বসবাস করতে পছন্দ করে। আর এখনই বা আমরা কীভাবে নিশ্চিত হবো যে আমরা আসলেই কম্পিউটারে তৈরি কোনো মহাকাব্যের চরিত্র নই? আমরা যদি কোনো কৃত্রিম কল্পনার জগতে বাস করতাম তাহলে সেখানকার ঘটনাপ্রবাহে যৌক্তিকতা, বা ধারবাহিকতা, বা কোনো ধরনের বিধিবদ্ধতা না থাকলেও চলত। হয়তো যেসব ভিনগ্রহের বাসিন্দারা আমাদের সেই কল্পজগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা মজা দেখার জন্য ভাবলো, দেখিতো কী হয় যদি হঠাৎ করে পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে, বা দুনিয়ার সবাই যারা মেদ কমানোর চেষ্টা করছে তারা হঠাৎ কলার সরপিঠা খাওয়ার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা বোধ করতে শুরু করে। কিন্তু এমন না করে ভিনগ্রহবাসীরা যদি সত্যিই কিছু সুসন্নিবিষ্ট বিধি মেনে চলে, তাহলে সেই গণানুকৃত বাস্তবতার পিছনে যে অন্য আর কোনো বাস্তবতা আছে সেটা বোঝার আমাদের আর

কোনো উপায়ই থাকবে না। এখন সেই ভিনগ্রহবাসিদের জগতটাকে 'বাস্তব' আর ঐ কৃত্রিম জগতটাকে 'অবাস্তব' আখ্যা দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু যদি –আমাদের মতো- সেই গণানুকৃত জগতের বাসিন্দাদের পক্ষেও তাদের মহাবিশ্বের বাইরে থেকে জগতটাকে দেখার কোনো উপায়ই না থাকে, তাহলে তারা নিজেদের সেই জগতকে নিশ্চয়ই বাস্তব মনে করবে। এ যেন সেই পুরাতন ধারণারই নতুন রূপ, যে আমরা সবাই অন্য কারো স্বপ্নের অংশ।

এসব উদাহরণ থেকে এই পুরো বইয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপসংহারে আমরা পৌঁছাতে পারি: *বাস্তবতার কোনো চিত্র- বা তত্ত্ব-অনির্ভর অস্তিত্ব নেই।* তাই আমরা বাস্তবতার যে ধারণাটা গ্রহণ করব সেটাকে বলব রূপায়ননির্ভর বা রূপায়ণনির্ভর বাস্তবতা: *এ ধারণা অনুযায়ী ভৌত তত্ত্ব এবং বিশ্বচিত্র হচ্ছে একধরনের গাণিতিক কাঠামো বা রূপায়ণ যেখানে একগুচ্ছ নিয়ম এ কাঠামোর বিভিন্ন অংশের সাথে পর্যবেক্ষণের যোগসূত্র তৈরি করে।* এই কঠামোনির্ভর বাস্তবতাই হচ্ছে সেই ধারণাগত সংগঠন যার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানকে বোঝা যায়।

প্লেটোর পর থেকে বছরের পর বছর ধরে দার্শনিকরা বাস্তবতার প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক করেছেন। ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞান এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে একটি বাস্তব বহির্জগতের অস্তিত্ব আছে, তা কোনো পর্যবেক্ষক দেখুক বা না দেখুক। ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞান অনুযায়ী বাস্তব বস্তুসমূহের গতি, ভর এ ধরনের কিছু ভৌত গুণাবলি আছে যেগুলোর সুনির্দিষ্ট মান রয়েছে। আর আমাদের তত্ত্বগুলো হচ্ছে এসব বস্তুকে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহকে বর্ণনা করার কিছু প্রচেষ্টা। যেগুলোর সাথে আমাদের পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ মিলে যায়।

ক্লাসিক্যাল ধারণামতে ‘পর্যবেক্ষক’ ও ‘তার পর্যবেক্ষণের বিষয়’ উভয়ই এমন একটা জগতের অংশ যেটার নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব আছে, তাই তারা আলাদা কি না তাতে কিছু আসে যায় না। অন্যভাবে বললে, আপনি যদি দেখেন যে একদল জেব্রা পার্কিং গ্যারেজে কোনো একটা জায়গার দখল নিতে লড়াই করছে তার মানে আসলেই একদল জেব্রা পার্কিং গ্যারেজের ঐ জায়গাটার জন্য লড়াই করছে। অন্য যেসব পর্যবেক্ষক এটা পর্যবেক্ষণ করবে তারাও জেব্রাগুলোর একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবে। এমনকি কেউ পর্যবেক্ষণ না করলেও জেব্রাগুলোর ওই বৈশিষ্ট্যগুলোই থাকবে। দর্শনে এই বিশ্বাসকে বলে বাস্তবতাবাদ।

যদিও বাস্তবতাবাদ একটা বেশ আকর্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গি, আমরা পরে দেখব যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী একে সমর্থন করা মুশকিল। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার নীতি – যেটা প্রকৃতির নিখুঁত বিবরণ – অনুযায়ী একটা কণিকার কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান বা গতি নেই যদি না এবং যতক্ষণ না কোনো পর্যবেক্ষক সেটাকে পরিমাপ করছে। তাই একটা পরিমাপ থেকে আমি এই মান পেয়েছি, তার মানে যাকে মাপা হলো, পরিমাপের ঠিক আগমূহুর্তে তার সেই মান ছিলো এমন ভাবা *সঠিক নয়*। এমনকি, অনেকক্ষেত্রে অনেক বস্তুর কোনো স্বাধীন অস্তিত্বই নেই যদি না তারা বহু জিনিসের একটা সন্নিবেশ আকারে থাকে। আর হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপাল নামক তত্বটা যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা এবং আমাদের এই চতুর্মাত্রিক জগত হয়তো বৃহত্তর, পঞ্চ-মাত্রার, একটা স্থান-কালের সীমানায় ছায়া মাত্র। সেক্ষেত্রে এই মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থা ঐ গোল্ডেফিশটার মতোই।

কড়া বাস্তববাদীরা যুক্তি দেখান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর সাফল্যই এদের বাস্তবতার প্রমাণ। কিন্তু ভিন্নতর ধারণাকাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে তৈরি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের পক্ষেও একই ঘটনাকে সফল ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব। এমন অনেক সফল বৈজ্ঞানিক তত্বই পরে ভিন্ন- এবং একই রকম সফল তত্ব দ্বারা পালটানো হয়েছে। যখানে নতুন তত্ত্বগুলোর বাস্তবতার ধারণা পুরানোটা থেকে সম্পূর্ণই আলাদা।

প্রচলিতরীতিতে, যারা বাস্তবতাবাদকে গ্রহণ করেনি তাদেরকে বলা হতো প্রতি-বাস্তববাদী। প্রতি-বাস্তববাদীরা ব্যবহারিক জ্ঞান এবং তাত্বিক জ্ঞানকে পৃথক বিবেচনা করে। তাদের যুক্তিতে, পর্যবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণই হচ্ছে অর্থবহ, আর তাত্বিক জ্ঞান এসব নিরীক্ষণের হাতিয়ার মাত্র। তাত্বিক জ্ঞানে পর্যবেক্ষিত ঘটনা সম্পর্কে বাড়তি কোনো অন্তর্নিহিত গভীর সত্য লুকিয়ে নেই। কিছু প্রতি-বাস্তববাদী বিজ্ঞানকে শুধু মাত্র পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়াদিতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এ কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দিকে অনেকেই পরমাণুর ধারণাকে পরিত্যাগ করে এই ভিত্তিতে যে আমরা কখনোই পরমাণু দেখতে পাবো না। জর্জ বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩) ছিলেন আরো কয়েক কাঠি সরেস, তার মতে মন এবং তার মধ্যকার ধারণাগুলো ছাড়া আর কিছুরই কোনো অস্তিত্ব নেই। যখন ইংরেজ লেখক এবং অভিধানবিদ ডঃ স্যামুয়েল জনসনকে (১৭০৯-১৭৮৪) তার এক বন্ধু বলেছিলেন যে বার্কলের দাবিকে হয়তো খণ্ডন করা যাবে না, শোনা যায়, তখন ডঃ জনসন উঠে গিয়ে একটা বড় পাথরে সজোরে লাথি দিয়ে বলেছিলেন, “আমি করলাম, এইভাবে”। অবশ্য, পাথরে লাথি দিয়ে ডঃ জনসন পায়ে যে ব্যথা অনুভব করেছিলেন, সেটাও তার মনেরই একটা ধারণা, তাই আসলে তিনি বার্কলের ধারণাকে খণ্ডন করতে পারেন নি। অবশ্য তার এই কাণ্ড দার্শনিক ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে, যিনি লিখেছিলেন যদিও নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতায় বিশ্বাস করার আমাদের কোনো যৌক্তিক কারণ

নেই, তারপরও এটাকে সত্যি বিবেচনা করা ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো উপায়ও নেই।

রূপায়ণনির্ভর বাস্তবতাবাদ এই বাস্তববাদী এবং প্রতি-বাস্তববাদীদের এই সব তর্কবিবাদের ইতি টেনেছে।

"You both have something in common. Dr. Davis has discovered a particle which nobody has seen, and Prof. Higbe has discovered a galaxy which nobody has seen."

রূপায়ণনির্ভর বাস্তবতাবাদ অনুযায়ী কোনো গাণিতিক রূপায়ন বাস্তব কি না সে অর্থহীন, শুধু দেখার বিষয় সেটা পর্যবেক্ষণের সাথে মিলছে কি না। যদি দুইটা ভিন্ন রূপায়ন থাকে যারা উভয়েই পর্যবেক্ষণের সাথে মেলে, যেমন সেই গোল্ডফিশের এবং আমাদের, তাহলে কোনটা কার চেয়ে বেশি বাস্তব সে আলোচনার আর কোনো অবকাশ নেই।। যখন যেটা প্রয়োগ করা সুবিধা সেটা প্রয়োগ করলেই হলো। যেমন, কেউ যদি সেই পাত্রের মধ্যে অবস্থান করে তাহলে সেই গোল্ডফিশের রূপায়নটাই তার জন্য সবচেয়ে কার্যকর। কিন্তু পাত্রের বাইরে কোনো দূরবর্তী গ্যালাক্সিতে বসে পাত্রের নির্দেশ কাঠামোর সাপেক্ষে হিসাব করা খুবই বিদঘুটে ব্যাপার হবে। তার উপর পাত্রটাও তো ঘুরতে থাকবে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির কারণে।

বিজ্ঞানচর্চায় আমরা বিভিন্ন জিনিসের ধারণাকাঠামো তৈরি করে থাকি, কিন্তু সেটা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও করি। রূপায়ণনির্ভর-বাস্তবতাবাদ শুধু বৈজ্ঞানিক রূপায়নগুলোই না, সচেতন ও অবচেতন ভাবে দৈনন্দিন পৃথিবীকে বোঝার জন্য আমরা যে

মানসিক চিত্র তৈরি করি তার উপরও প্রযোজ্য। এ মত অনুযায়ী পর্যবেক্ষককে বাদ দিয়ে বিশ্বজগত সম্পর্কে এখন আর কোনো ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। কারণ এই ধারণা গড়েই ওঠে পর্যবেক্ষকের –মানে আমাদের- স্নায়বিক প্রেসনাসমূহকে চিন্তা ও যুক্তি খাটিয়ে প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়কর্তৃক পর্যবেক্ষণ কোনো সরাসরি প্রক্রিয়া নয়। বরং আমাদের সব পর্যবেক্ষণই মস্তিষ্কের অনুধাবনপ্রবণ গঠন দ্বারা প্রভাবিত; দৃষ্টি যেভাবে লেন্স দ্বারা প্রভাবিত হয় অনেকটা তেমন। তাই আমাদের পর্যবেক্ষণনির্ভর তত্ত্বগুলোও এই লেন্সের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

রূপায়ণনির্ভর বাস্তবতার সাথে আমাদের দৃষ্টি যেভাবে কাজ করে তার মিল রয়েছে। আমাদের মস্তিষ্ক চোখের স্নায়ু থেকে ধারাবাহিক সংকেত পেতে থাকে। এই সংকেতগুলো টিভি সিগন্যাল যেভাবে আসে তেমন নয়। যেমন, আমাদের দেখা চিত্রের মধ্যে একটা ছিদ্র থাকে, রেটিনার সাথে যুক্ত দর্শনস্নায়ুগুলো ওই অংশ দিয়ে এসে যুক্ত হয়। এবং পুরো চোখের মধ্যে রেটিনার কেন্দ্রে যে অংশটা সূক্ষ্মভাবে দেখতে সক্ষম, আমাদের সমগ্র দৃষ্টিকোণের মাত্র ১ডিগ্রি অংশ তার আওতায় পড়ে। অর্থাৎ হাতটা পুরোপুরি সামনে বাড়িয়ে বুড়ো আঙুল উঁচু করে ধরলে সেই আঙুলের নখের প্রতিবিম্ব আমাদের রেটিনার যে অংশে আপতিত হবে চোখের শুধু ততটুকু অংশ হচ্ছে সূক্ষ্ম দৃষ্টি সক্ষম। তাই চোখ থেকে যে কাঁচা তথ্য আমাদের মস্তিষ্কে যায় তার ঐ অংশটুকু বাদে বাকি চিত্রে অনেক শূন্যস্থান থাকে। ভাগ্যিস, মানব মস্তিষ্ক উভয় চোখ থেকে পাওয়া আলাদা আলাদা সংকেত থেকে সেই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে নেয়। তার উপর, এটা রেটিনা থেকে প্রাপ্ত দ্বিমাত্রিক তথ্য থেকে একটা ত্রিমাত্রিক স্থানের আভাস তৈরি করে। অন্যভাবে বললে, আমাদের মস্তিষ্ক এসব সংকেতের আলোকে একটি মানসিক চিত্র বা কাঠামো গঠন করে নেয়।

মানুষের মস্তিষ্ক এই কাল্পনিক কাঠামো তৈরিতে এতই পটু, যে কেউ যদি এমন কোনো চশমা ব্যবহার করে যেটা দৃষ্টির উপরদিককে নিচের দিকে উলটে ফেলে, তাহলেও কিছু সময় পরে তার মস্তিষ্ক সেটাকে মনে মনে সোজা করে নেবে। এবং একসময় ঐ চশমার ব্যবহারকারী সব কিছু সোজাই দেখতে থাকবে। এরপর যদি চশমাটা সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সে আবার কিছুক্ষণ সবকিছু উলটো দেখবে, কিন্তু মানব মস্তিষ্কের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এতই বেশি, যে একটু পরে আবারো সে সবকিছু সোজা দেখতে থাকবে। এ থেকে বোঝা যায়, যখন কেউ বলে “আমি একটা চেয়ার দেখতে পাচ্ছি” তার অর্থ ওই সময় সে, ওই চেয়ার দ্বারা বিক্ষিপ্ত আলো ব্যবহার করে চেয়ারটার একটা মানসিক চিত্র বা কাঠামো গঠন করতে পেরেছে। এই মানসিক কাঠামোটা যদি উলটো হয় তাহলে হয়তো সেই ব্যক্তি চেয়ারে বসতে চেষ্টা করার আগেই তার মস্তিষ্কটি কাঠামোটিকে সোজা করে নেবে।

রূপায়ণনির্ভর বাস্তবতা আর যে সমস্যাটির সমাধান দেয়, বা অন্তত এড়াতে সক্ষম হয়, সেটা হলো, অস্তিত্বের অর্থ। একটা টেবিলের অস্তিত্ব আছে, সেটা আমি কীভাবে নিশ্চিত হবো, যদি আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাই এবং টেবিলটা আমার দৃষ্টিসীমায় না থাকে? যখন বলা হয় প্রোটন, নিউট্রন এদের যে গাঠনিক উপাদান ইলেক্ট্রন, কোয়ার্কদের, তাদের আমরা দেখতে না পেলেও তাদের অস্তিত্ব আছে, তখন কী অর্থে বলা হয়? একজন তো এমন একটা ধারণা কাঠামোও তৈরি করতে পারে যেখানে আমি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেই সে ঘরের সবকিছু নেই হয়ে যায় আবার ঘরে ফেরার সাথে সাথে সবকিছুর উদয় হয়। কিন্তু তাহলে ব্যাপারটা কেমন বিদঘুটে হবে, তার উপর আমি ঘরের বাইরে থাকা সময় যদি ছাদ ধসে

পড়ে তখন? আমি-ঘর-ছাড়লেই-টেবলিটি-হারিয়ে-যায় এই কাঠামোতে, ছাদ ভেঙে পড়ার পরে আমি ফিরে আসলে আগেই হারিয়ে যাওয়া টেবলিটিও যখন ভগ্ন অবস্থায় ধ্বংসস্তুপের মধ্যে ফিরে আসবে সে চিত্র কীভাবে মেলাব? তাই দেখা যাচ্ছে, যেই ধারণাকাঠামোতে টেবিলটা সবসময় অস্তিত্বশীল থাকে সেটাই সবচেয়ে সরল এবং পর্যবেক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই হলো ব্যাপার।

অতিপারমাণবিক কণিকা, যেমন- ইলেক্ট্রন আমরা দেখতে পারি না কিন্তু এমন ভাবে ভেবে নিতে পারি যেন ক্লাউড চেম্বারে তার ফেলে যাওয়া দাগের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এছাড়াও টেলিভিশন পিকচার টিউবের প্রতিটা আলোকবিন্দু আরো অনেক ঘটনারই ব্যাখ্যা মেলে ইলেকট্রনের ধারণা থেকে। কথিত আছে ১৮৯৭ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরির বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জে. জে. থম্পসন প্রথম ইলেক্ট্রন আবিষ্কার করেন। তিনি শূন্য কাচনলের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ নিয়ে গবেষণা করছিলেন, যে ঘটনা ক্যাথোড রে নামে পরিচিত। এ গবেষণা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে এই রহস্যজনক রশ্মি হচ্ছে এমন কিছু 'কণিকা' যার দ্বারা পরমাণু গঠিত। যদিও তখনো পরমাণুকে পদার্থের অবিভাজ্য একক মনে করা হতো। থম্পসন ইলেক্ট্রন 'দেখেননি' এমনকি তিনি যে পরীক্ষাটা করেছিলেন তাতে ইলেকট্রনের ইঙ্গিত থাকলেও, ঐ পরীক্ষায় ইলেক্ট্রনের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু তার কল্পিত ইলেক্ট্রণের ধারণা বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে। এবং দেখা না গেলেও এখনকার সব পদার্থবিজ্ঞানী ইলেক্ট্রনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

Cathode Rays We can't see individual electrons, but we can see effects they produce.

কোয়ার্কও আমরা দেখতে পারি না, কিন্তু পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে কোয়ার্ক-এর ধারণা কাজে লাগে। যদিও বলা হয়ে থাকে প্রোটন

এবং নিউট্রন কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত, তবু আমরা কখনো আলাদাভাবে কোয়ার্ক পর্যবেক্ষণ করতে পারবো না। কারণ, এদের মধ্যকার দূরত্ব যতই বাড়তে থাকে আকর্ষণ বল বা বন্ধন বলও ততই বাড়তে থাকে। তাই প্রকৃতিতে কোয়ার্ক মুক্তভাবে থাকে না। বদলে, তারা সবসময় তিনটির একটি গ্রুপ আকারে (প্রোটন এবং নিউট্রনে), বা একটি কোয়ার্ক ও একটি এন্টি-কোয়ার্ক এর যুগল (পাই মেসনে) আকারে থাকে এবং এমন আচরণ করে যেন তারা একে অপরের সাথে রাবারব্যান্ড দিয়ে যুক্ত।

অতিপারমাণবিক কণিকাদের কোয়ার্ক রূপায়ন যখন প্রথম প্রস্তাব করা হয় তখন, যে বস্তু কখনো আলাদা করে দেখা যায় না তার অস্তিত্বের অর্থ কী, তা নিয়ে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু অতিপারমাণবিক কণিকাসমূহও যে কিছু 'অতিঅতিপারমাণবিক' কণিকার সমন্বয়ে গঠিত এই ধারণা ব্যবহার করে তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু যদিও, একটা কণিকার দ্বারা অন্য কণিকা কীভাবে বিচ্যুত হচ্ছে সে উপাত্ত থেকে প্রথম কণিকার অস্তিত্ব প্রমান করার পদ্ধতি বিজ্ঞানী মহলে অনেকদিন থেকেই পরিচিত, তবুও অনেক বিজ্ঞানী সেই, প্রায় অপর্যবেক্ষণীয়, কোয়ার্ক এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান নি। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে এই কোয়ার্ক রূপায়ন যখন সঠিক গণনা ও অনুমান দিতে লাগলো তখন সকল ভিন্নমত দূর হয়। এমনটা অবশ্যই সম্ভব যে কোনো ভিনগ্রহের বাসিন্দারা -যাদের সতেরোটা হাত, অবলোহিত দৃষ্টির চোখ, এবং হয়তো যাদের হয়তো কান দিয়ে দুধের সর বের হয় -তারাও অতিপারমাণবিক কণিকা বিষয়ে আমাদের মতো একই পর্যবেক্ষণ করবে কিন্তু পুরো জিনিসটা বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করবে কোয়ার্ক রূপায়ন ছাড়াই। তবে আসল কথা হলো, রূপায়ণনির্ভর বাস্তবতাবাদ অনুযায়ী, যে রূপায়ন অতিপারমানবিক কণিকাসমূহ সম্পর্কে আমাদের পর্যবেক্ষণের সাথে মেলে, সে রূপায়নে কোয়ার্ক এর অস্তিত্ব আছে।

রূপায়ণনির্ভর বাস্তবতাবাদ আমাদের এমন একটা যৌক্তিক সংগঠন দেয় যার সাহায্যে আমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, যেমন: যদি মহাবিশ্ব একটা সসীম সময় আগেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তার আগে কী ঘটেছিলো? একজন আদি খৃষ্টান দার্শনিক, সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০) বলেছিলেন, প্রশ্নটির উত্তর এই নয়, যে ঈশ্বর তখন তাদের জন্য দোজখ বানাচ্ছিলেন যারা এসব প্রশ্ন করে। বরং সময়ও এই মহাবিশ্বেরই একটা অংশ, যেটা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। তার মতে এর আগে সময়ের অস্তিত্ব ছিলো না। সৃষ্টিবাদী লোকেরা, যারা জেনেসিসের সব লেখা আক্ষরিক অর্থেই সত্য মনে করে তাদের জন্য এটা একটা সম্ভাব্য রূপায়ন। কিন্তু পৃথিবীতে পাওয়া ফসিল এবং অন্যান্য অনেক আলামত থেকেই দেখা যায় যে পৃথিবীর বয়স জেনেসিসে বর্ণিত বয়সের চেয়ে অনেক বেশি। (তবে কি এসব আলামত আর ফসিলের উদ্দেশ্য আমাদের বোকা বানানো?) কেউ অন্য আরেকটা রূপায়নও ভাবতে পারে যেখানে সময় শুরু হয়েছে ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে, বিগ-ব্যাং এর মাধ্যমে। আমরা জানি যে রূপায়ন আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং সেই সাথে সকল ঐতিহাসিক ও ভূতাত্বিক আলামতসমূহকে ব্যাখ্যা করতে পারে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে সেরা। যেহেতু দ্বিতীয় রূপায়নটি বিভিন্ন ফসিল, তেজস্ক্রিয়তার উপাত্ত, এবং আমরা যে বহু মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সি থেকে আসা আলো দেখতে পাই, সেসবকে ব্যাখ্যা করে সেহেতু দ্বিতীয় রূপায়নটিই প্রথম রূপায়ন অপেক্ষা বেশি কার্যকর। তারপরও, একটাকে আরেকটার চেয়ে বেশি বাস্তব বলা যাবে না।
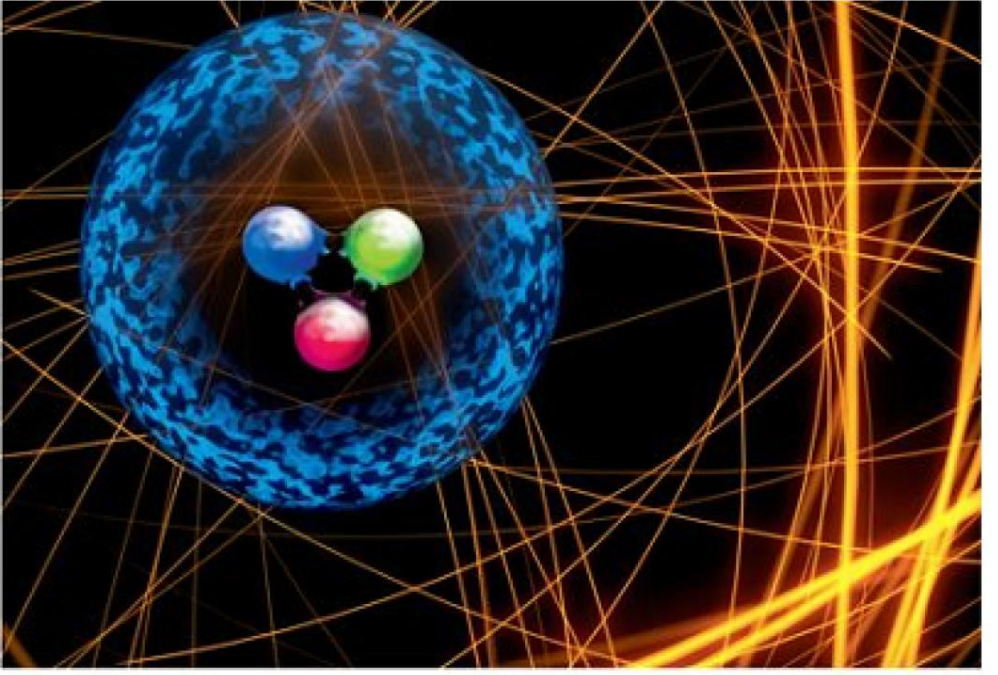
Quarks The concept of quarks is a vital element of our theories of fundamental physics even though individual quarks cannot be observed.

অনেকে মহাবিশ্বের এমন একটা রূপায়ন সমর্থন করেন যেখানে সময় বিগব্যাং-এরও অনেক পিছনে যেতে পারে। এটা এখনো স্পষ্ট নয়, যে তাদের সেই রূপায়ন বর্তমান পর্যবেক্ষণগুলো ব্যাখ্যায় কোনো কাজে লাগবে কি না। কারণ ধারণা করা হয়, মহাবিশ্ব প্রকৃতির যেসব নিয়ম মেনে বিবর্তিত হয় সেগুলো বিগ ব্যাং-এ ভেঙ্গে পড়ে। এটা যদি হয় তাহলে এমন কোনো রূপায়ন, যেখানে বিগ ব্যাং-এর ও আগের সময়কে গণনায় আনা হয়, তা কোনো কাজে লাগবে না। কারণ তার আগে কী ছিলো সেগুলো কোনো ভাবেই আমাদের বর্তমান মহাবিশ্বের কোনো ঘটনাকেই প্রভাবিত করবে না। তাই বিগ ব্যাং কে এই মহাবিশ্বের সূচনা হিসাবেই দেখা যেতে পারে।

কোনো একটা ভালো রূপায়নের বৈশিষ্ট্যগুলো এমন:
১. এটা নান্দনিক।
২. এতে অনির্দিষ্টচলক বা পরিবর্তনযোগ্য চলক কম।
৩. সকল বর্তমান পর্যবেক্ষণের সাথে মেলে ও ব্যাখ্যা করে।
৪. ভবিষ্যত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত গণনা ও অনুমান করে, যেগুলো না মিললে রূপায়ণটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে।

যেমন, অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব ছিলো বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে চারটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে, মাটি, বায়ু, আগুন এবং পানি এবং এসব বস্তু তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে মিলেমিশে কাজ করে। তত্ত্বটি বেশ নান্দনিক ছিলো এবং এতে কোনো অনির্দিষ্ট চলকও ছিলো না। কিন্তু,

অনেক ক্ষেত্রেই এটা নির্দিষ্ট অনুমান করতে পারতো না, এবং যে সব ক্ষেত্রে অনুমান সম্ভব হতো,অনেক সময় সেই অনুমান পর্যবেক্ষণের সাথে মিলতো না। যেমন একটা অনুমান ছিলো, বস্তু যত ভারী হবে তত দ্রুত নিচে পড়বে, কারণ নিচের দিকে পড়াই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। গ্যালিলিওর আগে কেউই এই কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার কথা ভাবেনি। কথিত আছে তিনি পিসার হেলানো মন্দির থেকে বিভিন্ন ওজনের বস্তু ফেলে এ পরীক্ষা করেছিলেন। মন্দির-পরীক্ষার ব্যাপারটা সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা এটা জানি যে তিনি একটি হেলানো তলে বিভিন্ন ওজনের বস্তু গড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। এবং দেখেছিলেন সব বস্তুই একই হারে গতি লাভ করছে, যেটা অ্যারিস্টটলের অনুমানের সাথে মেলে না।

এটা স্পষ্ট যে উপরের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বিষয়নির্ভর। একটা তত্ব কতটা নান্দনিক সেটা মাপার কোনো সহজ উপায় নেই, বিজ্ঞানীরা এই বৈশিষ্ট্যকে খুবই পছন্দ করেন কারণ দেখা যায় প্রকৃতির নিয়মগুলোই এমন, যে অনেক রকম ঘটনাকেই একটা সহজ সূত্রে বেঁধে ফেলা সম্ভব। তত্বের নান্দনিকতা আসলে একটা বাহ্য বৈশিষ্ট্য, অনির্দিষ্ট চলকের স্বল্পতা যার একটা নির্দেশক। কারণ গোঁজামিল দিয়ে মেলানো তত্বকে নান্দনিক বলা যায় না। এ বিষয়ে আইনস্টাইনের কথাটা নিজের মতো করে বললে দাঁড়ায়, একটা তত্বকে হতে হবে যতটা সম্ভব সরল, কিন্তু তার চেয়ে আর নয়। টলেমি তার মহাবিশ্বের রূপায়নে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাদের বৃত্তাকার কক্ষপথকে এপিসাইকেল হিসাবে চিন্তা করেছেন । এপিসাইকেলের উপর এপিসাইকেল যোগ করে, বা তার উপর আরো এপিসাইকেল যোগ করে তার গাণিতিক রূপায়নকে হয়তো আরো মেলানো যেতো। কিন্তু কিছু পর্যবেক্ষণকে মেলানোর জন্য যখন কোনো গাণিতিক রূপায়নকে ধারাবাহিকভাবে জটিল থেকে জটিলতর করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেই তত্বকে বিজ্ঞানীরা কোনো মৌলিক নীতির ধারক না ভেবে স্রেফ ভিন্ন চেহারার একটা তালিকা হিসাবে গণ্য করে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখবো যে অনেকেই 'স্ট্যান্ডার্ড মডেল'কে, যেটা প্রকৃতির মৌলিক কণিকাসমূহের মিথস্ক্রিয়া বর্ণনা করে, 'নান্দনিকতাহীন' মনে করেন। কিন্তু টলেমির এপিসাইকেলের চেয়ে এই রূপায়ণ অনেক বেশি সফল। এটা বেশকিছু নতুন কণিকার অস্তিত্ব অনুমান করতে পেরেছে, প্রকৃতিতে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করার আগেই। এবং, অসংখ্য পরীক্ষণের ফলাফল দারুণ সূক্ষ্মতায় গণনা করতে পেরেছে। কিন্তু এর মধ্যে কয়েকডজন পরিবর্তনযোগ্য চলক আছে, যেগুলো তত্ব থেকে নির্ধারিত হয় না, ফলাফলকে পর্যবেক্ষণের সাথে মেলানোর জন্য পুননির্ধারণ করতে হয়।

চতুর্থ পয়েন্টের ব্যাপারে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা খুবই খুশি হন যখন কোনো নতুন এবং চমকপ্রদ অনুমান মিলে যায়। অপরদিকে যদি অনুমান না মেলে তখন প্রথমেই ভাবা হয়, হয়তো পরীক্ষণে কোনো ভুল আছে। যদি দেখা যায় ঘটনা তাও না, তখনো অনেকে সেই তত্বকে বাতিল করতে চান না, বরং কিছু পরিবর্তন করে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। যদিও পদার্থবিজ্ঞানীরা তাদের পছন্দের তত্বকে বাঁচানোর ব্যাপারে রীতিমত নাছোড়বান্দা, তারপরও অনেক সময় একটা তত্বকে পরিবর্তন করতে করতে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে সেটাকে কৃত্রিম বা খুব ঝামেলাপূর্ণ মনে হতে থাকে, তখনই সেটা হয়ে পড়ে 'নান্দনিকতাহীন'।

নতুন সব পর্যবেক্ষণকে জায়গা দিতে যখন কোনো তত্বে আমূল পরিবর্তন আনা লাগে তখনই বোঝা যায় যে নতুন কোনো তত্বের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নতুন পর্যবেক্ষণের

আলোকে পুরানো তত্ত্বের বাতিল হওয়ার একটা উদাহরণ হচ্ছে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্ব। ১৯২০ সালের দিকে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই মনে করতেন মহাবিশ্ব স্থিতিশীল মানে এর আকার বাড়ছেও না কমছেও না। এরপর ১৯২৯ সালের দিকে এডুইন হাবল তার পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করলেন, যে মহাবিশ্ব আকারে বাড়ছে। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিলো গ্যালাক্সিগুলো থেকে আসা আলো নিয়ে। প্রতিটা গ্যালাক্সির গাঠনিক উপাদানের উপর নির্ভর করে তাদের থেকে আসা আলোয় কিছু বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন বা বর্ণালী থাকে, গ্যালাক্সিগুলো যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তখন এই বর্ণালীতে নির্দিষ্ট পরিমান পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন গ্যালাক্সির এই বর্ণালী বিশ্লেষণ করে হাবল তাদের গতিবেগ নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন দেখবেন যত সংখ্যক গ্যালাক্সি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তত সংখ্যক গ্যালাক্সিই কাছে এগিয়ে আসছে। কিন্তু বদলে তিনি দেখতে পান যে প্রায় প্রতিটা গ্যালাক্সিই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এবং গ্যালাক্সি যত দূরবর্তী তার দূরে সরে যাওয়ার গতিও তত বেশি। এ থেকে হাবল সিদ্ধান্ত নেন যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু অন্যরা যারা স্থিতিশীল মহাবিশ্বের তত্ত্বকেই ধরে ছিলো, তারা তাদের তত্ত্বের আলোকেই এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করল। যেমন, ক্যালটেকের পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিটজ জুইচকি প্রস্তাব করলেন, হয়তো কোনো অজানা উপায়ে অনেক দূর থেকে আসা আলো শক্তি হারাচ্ছে। এই শক্তির কমে যাওয়ার ফলে বর্ণালীতে যে পরিবর্তন আসবে তা হাবলের পরীক্ষণের ফলাফলের সাথে মিলে যেতে পারে। হাবলের পরেও কয়েক যুগ অনেক বিজ্ঞানী সেই স্থিতিশীলতার তত্ত্বই আকড়ে ধরে ছিলেন। কিন্তু মহাবিশ্বের সবচেয়ে স্বাভাবিক রূপায়ন ছিলো হাবলেরটাই, শেষমেষ সেটাই গৃহীত হয়েছে।

প্রকৃতির যেসব নিয়ম দিয়ে পুরো মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হয় যেগুলোর সন্ধানে গঠন করা হয়েছে একের পর এক তত্ত্ব বা রূপায়ন, যেমন- চার উপাদান তত্ত্ব, টলেমীয় রূপায়ন, আগ্নিকতত্ত্ব, বিগ-ব্যাং তত্ত্ব,এমন আরো। প্রতিটা নতুন তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বাস্তবতার ধারণা এবং মহাবিশ্বের মৌলিক গাঠনিক উপাদানগুলো বদলে গেছে। যেমন আলোর তত্ত্বের কথা ধরা যাক। নিউটন ভেবেছিলেন আলো খুবই ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত। এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আলো কেন সরল পথে যায়, এবং নিউটন এ তত্ত্বের সাহায্যে আলো কেন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে, যেমন বায়ু থেকে পানিতে, যাওয়ার সময় বেঁকে যায় বা প্রতিসারিত হয় তাও ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন।
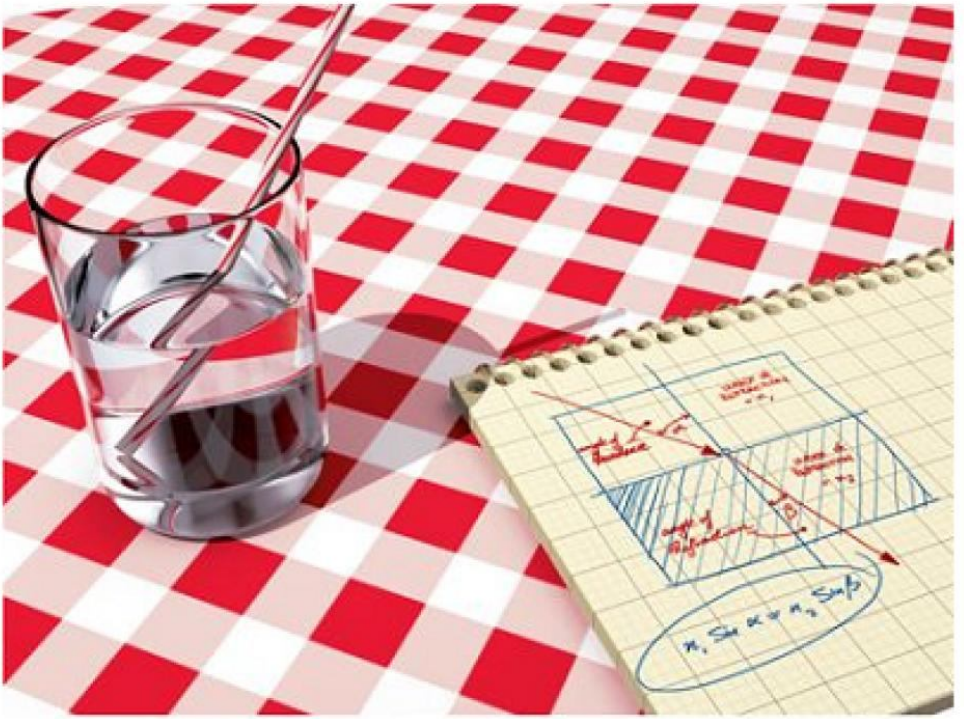
Refraction Newton's model of light could explain why light bent when it passed from one medium to another, but it could not explain another phenomenon we now call Newton's rings.

এই কণিকাতত্ব অবশ্য একটা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারতো না যেটা নিউটন নিজেই প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন, সেটা হচ্ছে নিউটন রিং। একটা সমতল প্রতিফলকের উপর একটি লেন্স রাখুন, তারপর কোনো একরঙা আলো, যেমন সোডিয়াম আলো, দিয়ে লেন্সটিকে আলোকিত করুন। এখন যদি উপর থেকে লেন্সটিকে দেখা হয়, তাহলে লেন্স যে বিন্দুতে প্রতিফলক তলকে স্পর্শ করেছে সে বিন্দুকে কেন্দ্র করে বেশকিছু গাঢ় ও হালকা চক্র দেখা যাবে। এটাকে আলোর কণিকা তত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা মুশকিল হয়ে যায়, কিন্তু তরঙ্গতত্ব একে সহজেই ব্যাখ্যা করে।

তরঙ্গতত্ব মতে এই হালকা ও গাঢ় চক্রগুলো যে ঘটনার কারণে সৃষ্টি হয় তাকে বলে ব্যতিচার। কোনো তরঙ্গের, যেমন পানির ঢেউ, কিছু উঁচু ও নিচু অংশ থাকে। যখন একাধিক তরঙ্গ একে-অপরের সাথে ধাক্কা খায় তখন যদি একটার উঁচু বা নিচু অংশ যথাক্রমে অপরটার উঁচু বা নিচু অংশের সাথে মিলে যায় তখন একে অপরকে জোরদার করে, এবং উঁচুটা আরো উঁচু এবং নিচুটা আরো নিচু হয়ে যায়। একে বলে গঠনমূলক ব্যতিচার। এ ক্ষেত্রে বলা হয় তরঙ্গ দুটো ‘সম দশা’য় আছে। অপর দিকে, যখন এক তরঙ্গের নিচু অংশ অন্য তরঙ্গের উঁচু অংশের সাথে মেলে তখন তারা একটি অপরটিকে নাকচ করে দেয় এবং ঐ অংশে আর কোনো ঢেউ থাকে না। তখন আমরা বলি তরঙ্গ দুটো ‘বিপরীত দশা’য় আছে। এই ঘটনাকে বলে ধ্বংসাত্বক ব্যতিচার।

নিউটনের রিং এ উজ্জ্বল চক্রগুলো কেন্দ্র থেকে এমন দূরত্বে থাকে যে অংশে লেন্স এবং প্রতিফলকের মধ্যকার পার্থক্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পূর্ণ সংখ্যার (১,২,৩,...) গুণিতক, তাই সেখানে গঠনমূলক ব্যাতিচার ঘটে। ওদিকে যেখানে এই দূরত্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধপূর্ণ সংখ্যার (১/২, ৩/২, ৫/২,...) গুণিতক হয় সেখানে ধ্বংসাত্বক ব্যাতিচার ঘটে ফলে প্রতিফলক তল থেকে প্রতিফলিত রশ্মি লেন্সের তল থেকে প্রতিফলিত রশ্মিকে নাকচ করে দেয়। এ কারণে আমরা ঐ অংশে অন্ধকার একটা চক্র দেখি।
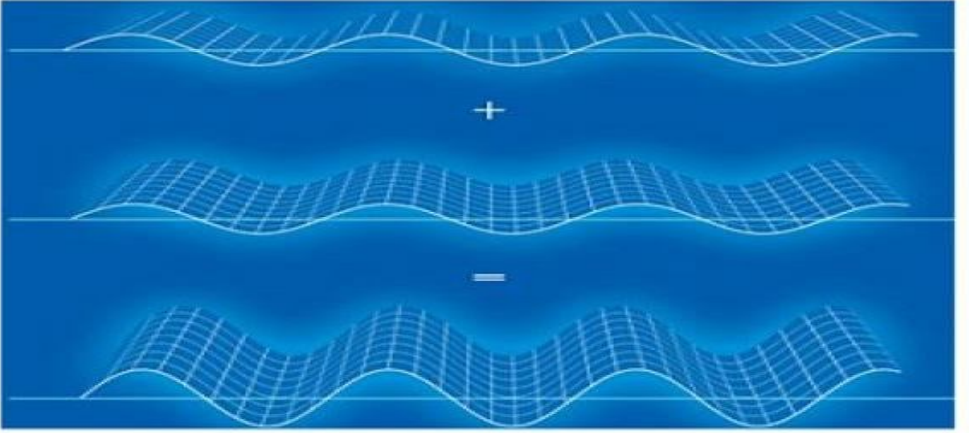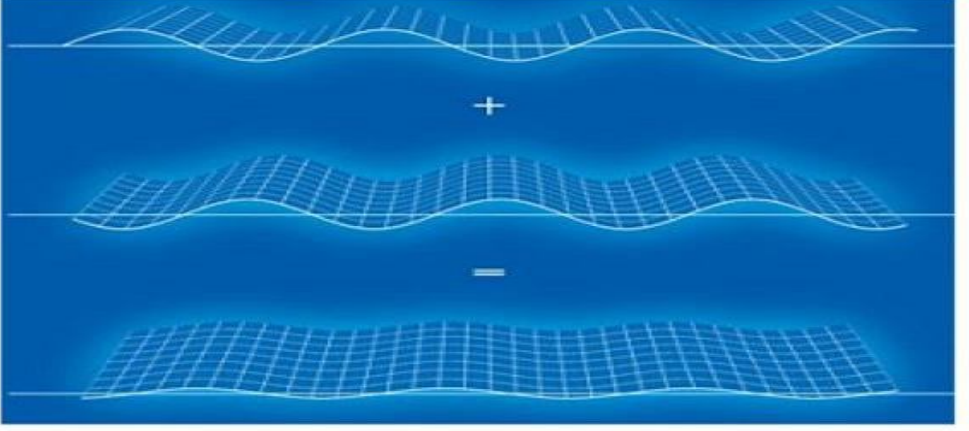
Interference Like people, when waves meet they can tend to either enhance or diminish each other.

ঊনিশ শতকে এ ঘটনাই আলোর কণিকাতত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে এবং তরঙ্গ তত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য, বিশ শতকের শুরুতে আইনস্টাইন দেখান যে আলোকতড়িৎক্রিয়া (এখন যেটা টেলিভিশন এবং ডিজিটাল ক্যামেরায় ব্যবহৃত হয়) ব্যাখ্যা করা যায় যদি আমরা ধরে নেই, আলোর একটি কণিকা বা কোয়ান্টাম, পরমাণুর একটি ইলেট্রনকে আঘাত করে বিচ্যুত করে ফেলছে। তাই আলো একই সঙ্গে তরঙ্গ ও কণিকাধর্মী।

সম্ভবত তরঙ্গ তত্বের ধারণা মানুষের মাথায় এসেছিলো কারণ সে সমূদ্রে বা পুকুরে ঢিল দিলে সেখানে তরঙ্গ সৃষ্টি হতে দেখেছে। এমনকি আপনি যদি কখনো পুকুরে এক সাথে দুইটি ঢিল ছুড়ে থাকেন তাহলে হয়তো আপনি উপরের চিত্রের মতো ব্যতিচারে ঘটনাও

দেখে থাকবেন। অন্যান্য তরলেও এই একই আচরণ দেখা যায়,সম্ভবত ওয়াইন বাদে, যদি আপনি খুব পান করে ফেলেন। কণিকার ধারণা মানুষের পরিচিত ছিলো পাথর, নুড়ি, এবং বালি থেকে। কিন্তু এই কণিকা/তরঙ্গ দ্বৈত অবস্থার ধারণা- যে একটা জিনিসকে একই সঙ্গে কণিকা বা তরঙ্গ আকারে বর্ণনা করা যেতে পারে- সেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এতটাই অপরিচিত, এ যেন এক টুকরো বেলেপাথরকে পান করে ফেলার মতো আজব ঘটনা।
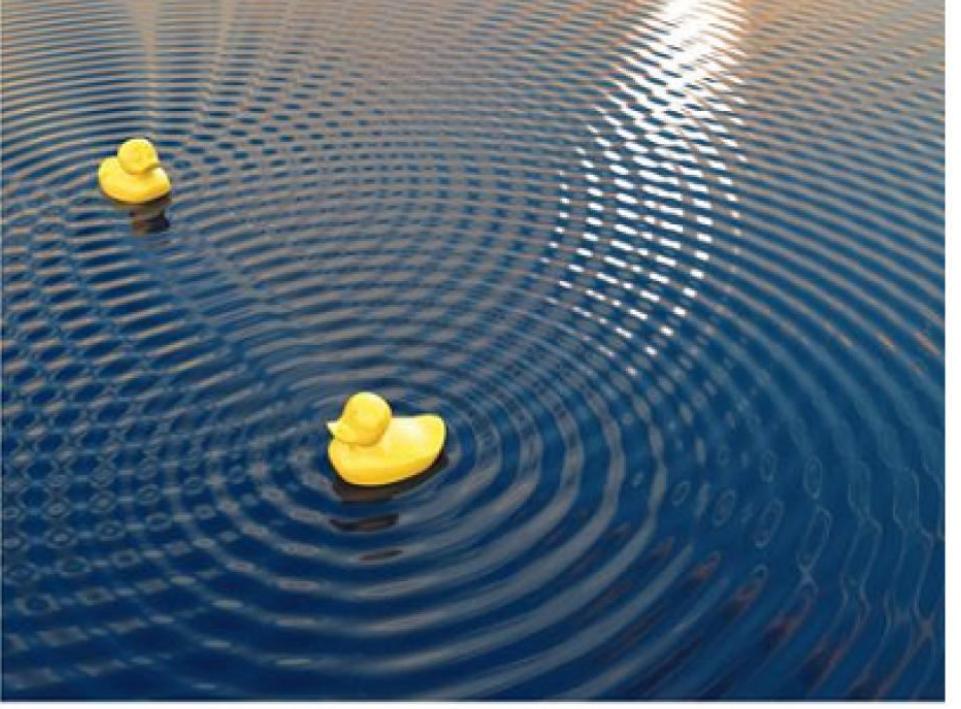
Puddle Interference The concept of interference shows up in everyday life in bodies of water, from puddles to oceans.

এ ধরনের দ্বিত্ব- যেখানে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব একই ঘটনাকে নির্ভুলভাবে বর্ণনা করছে- রূপায়ণনির্ভর বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যখন প্রতিটি তত্ত্বই বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারে, তখন একটাকে অপরটার চেয়ে ভালো বা বেশি বাস্তব বলার কোনো অবকাশ থাকে না। প্রকৃতির যেসব নিয়ম পুরো মহাবিশ্বকে পরিচালিত করছে তাদের সম্পর্কে আমরা বলতে পারি: মহাবিশ্বের সকল দিক বর্ণনা করতে পারে, এমন একক তত্ত্ব থাকা হয়তো সম্ভব নয়। তাই মনে হচ্ছে, কোনো একক তত্ত্বের বদলে আমাদের শুরুর অধ্যায়ে বলা সেই পরস্পর সংযুক্ত একগুচ্ছ তত্ত্বের জালিকার আশ্রয় নিতে হবে। যেটার নাম এম-তত্ত্ব। এম-তত্ত্বের প্রতিটি সদস্য তত্ত্ব একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারে। আর যেখানে একটার সীমা অপরটার উপর এসে পড়ে, সেখানেও তাদের ফলাফলগুলো একে অপরের সাথে মিলে যায়, তাই তাদের সবাইকে একটি একক তত্ত্বের বিভিন্ন অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এই জালিকার কোনো একটি সদস্য তত্ত্ব মহাবিশ্বের সব দিক -যেমন, প্রকৃতির সব বল, যেসব কণিকা সেই বল অনুভব করে, এবং স্থান-কালের যে কাঠামোর মধ্যে এইসব ঘটনা ঘটে- বর্ণনা করতে পারে না। যদিও এতে

পদার্থবিজ্ঞানীদের সবকিছুর একটি একক সার্বিক তত্ত্বের স্বপ্ন পূরণ হয় না, তবু এটা রূপায়ণনির্ভর বাস্তবতার ধারণায় গ্রহণযোগ্য।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দ্বৈতাবস্থা ও এম-তত্ত্ব নিয়ে আরো আলোচনা করব, কিন্তু তার আগে প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি যেসব মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে- কোয়ান্টাম তত্ত্ব, এবং বিশেষ করে কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিকল্প ইতিহাস রূপায়ন- সেগুলো একটু দেখে নেব। এ ধারণা অনুযায়ী মহাবিশ্ব কোনো একক অস্তিত্বের বদলে, সম্ভাব্য সকল রূপেই একই সঙ্গে অস্তিত্বশীল। যাকে বলে কোয়ান্টাম উপরিপাতন। এ তত্ত্বকে প্রায় আমাদের সেই, ঘর-ছাড়লেই-টেবিল-নেই-হয়ে-যায়, তত্ত্বের মতো উদ্ভট কিছু মনে হতে পারে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত একে যতগুলো ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার সবই এটি সফল ভাবে উতরে গেছে।

৪

বিকল্প ইতিহাস

১৯৯৯ সালে অস্ট্রিয়ার একদল পদার্থবিজ্ঞানী ফুটবল আকৃতির কিছু অণুকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে একটি পরীক্ষা করেন। ষাটটি কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরি এই অণুগুলোকে প্রায়ই বাকিবল নামে ডাকা হয়, কারণ স্থপতি বাকমিন্সটার ফুলার এই আকৃতির ভবন নির্মাণ করতেন। ধারণা করা হয় ফুলারের ভূ-আকৃতির গম্বুজগুলোই পৃথিবীর বুকে ফুটবল আকৃতির বৃহত্তম বস্তু। আর বাকিবলরা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম। বিজ্ঞানীরা যে দেয়ালের দিকে তাক করেছিলেন, সে দেয়ালে দুইটি চিড় বা লম্বা ফালি আকৃতির ছিদ্র ছিলো, যেগুলো দিয়ে বাকিবলগুলো পার হতে পারে। দেয়ালের পিছনে বিজ্ঞানীরা পর্দার মত একটা বস্তু বসিয়েছিলেন যেটা দেয়াল পার হয়ে আসা অণুগুলোকে নির্ণয় ও গণনা করতে পারে।
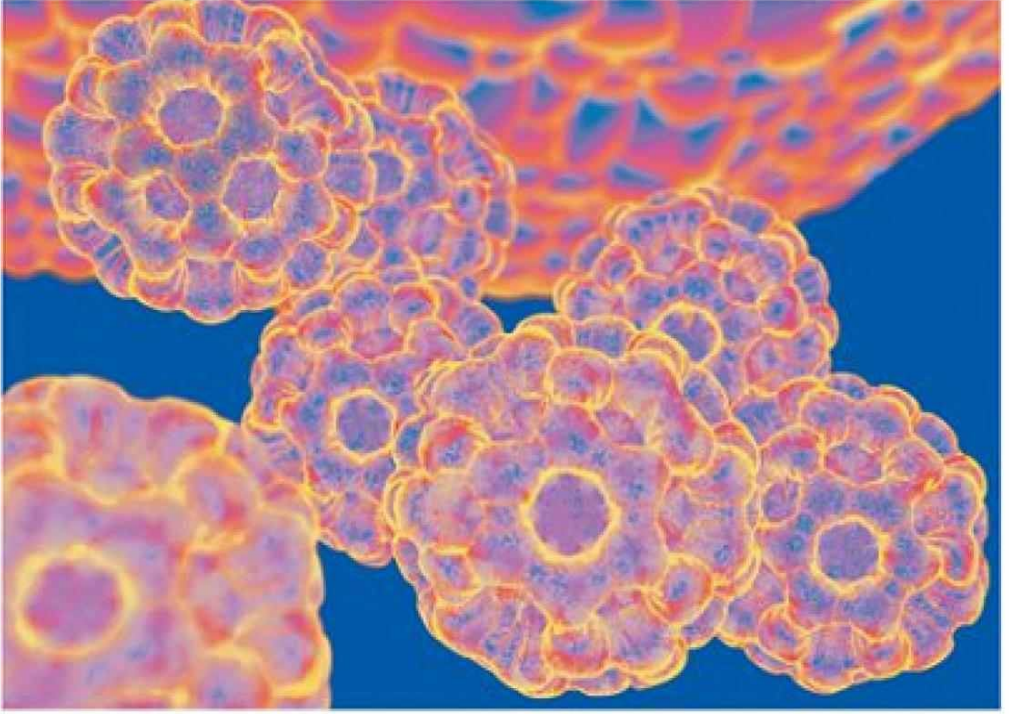
Buckyballs Buckyballs are like microscopic soccer balls made of carbon atoms.

সত্যিকারের ফুটবল দিয়ে যদি আমাদের এই পরীক্ষা করতে হয় তাহলে আমাদের এমন একজন খেলোয়ার লাগবে যার তাক অতটা ভালো না, তবে সে আমাদের বেঁধে দেওয়া একটা নির্দিষ্ট গতিতে একের পর এক ফুটবলে লাথি দিতে পারে। আমরা আমাদের সেই খেলোয়ারকে সেই দুইটি ফাঁকা স্থান বা ছিদ্রবিশিষ্ট দেয়ালটার সামনে দাঁড় করাবো। একই বরাবর দেয়ালের অপর দিকে আমরা দেয়ালের সমান্তরালে একটি খুব বড় জাল টাঙাবো। খেলোয়ারের বেশিরভাগ শটই দেয়ালে লেগে ফিরে আসবে, কিন্তু মাঝে মাঝেই দুয়েকটা শট দুইটি ছিদ্রের যে কোনো একটি দিয়ে পার হয়ে যাবে। এখন এই ছিদ্রদুটির ফাঁকা যদি বলের আকারের চেয়ে স্রেফ একটু বড় হয় তাহলে আমরা দেয়ালের অপর পাশ থেকে দুইটি সূক্ষ্ম ধারায় বলগুলোকে আসতে দেখবো। আর এই ফাঁকদুটি বলের আকারের চেয়ে

যত বেশি বড় হবে, বেরিয়ে আসা বলগুলোও তত বেশি ছড়িয়ে যেতে থাকবে (নিচের চিত্র দ্রষ্টব্য)।

লক্ষ্য করুন, এখন যদি আমরা একটা ছিদ্র বন্ধ করে দেই তাহলে স্রেফ বলের সেই ধারাটা আটকা পড়ে যাবে, অপর ধারার উপর এর কোনো প্রভাবই পড়বে না। তাপর যদি আবার খুলে দেই, তাহলে জালের বিভিন্ন বিন্দুতে পৌঁছানো বলের সংখ্যা বাড়বে, কারণ আগের মুক্ত ধারাটা তো ছিলোই, আর এখন নতুন করে খোলা ছিদ্র দিয়েও বল আসবে জালে। তার মানে দুইটি ছিদ্র খুলে দিয়ে আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি তা প্রতিটি ছিদ্র আলাদা আলাদা করে খুলে পাওয়া পর্যবেক্ষণদ্বয়ের যোগফলের সমান। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এ ধরনের একটি বাস্তবতার সাথেই পরিচিত। কিন্তু এই অস্ট্রিয়ান গবেষকদল তাদের অণুগুলো ছুঁড়ে দিয়ে সেই একই ফলাফল পান নি।
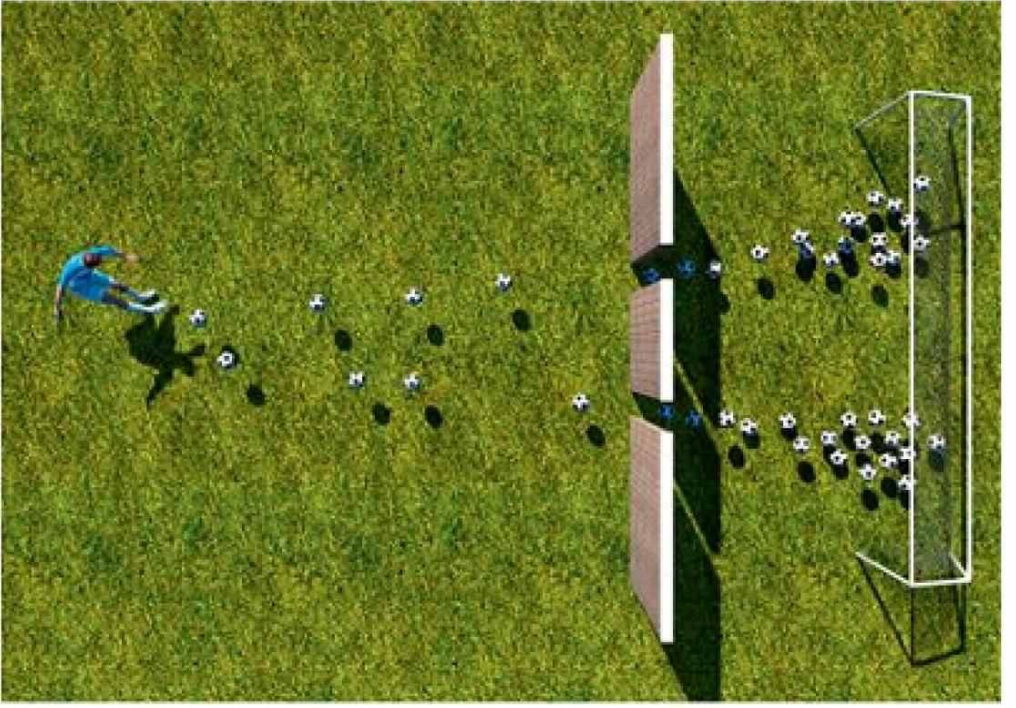
Two-Slit Soccer A soccer player kicking balls at slits in a wall would produce an obvious pattern.

এই অস্ট্রিয়ান পরীক্ষায়, দ্বিতীয় ছিদ্র খুলে দেওয়ার পর পর্দার কিছু কিছু অংশে পৌঁছানো অণুর সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু অন্য কিছু বিন্দুতে সংখ্যা কমেও গেছে। এমনকি, পর্দায় এমন কিছু জায়গাও পাওয়া গেছে যেখানে দুইটি ছিদ্র খোলা থাকা অবস্থায় কোনো বাকিবলই পৌঁছে নি, কিন্তু যেকোনো একটিকে বন্ধ করে অন্যটিকে খুললে ঠিকই ওখানে কিছু অণু পৌঁছায়। ব্যাপারটা অদ্ভুত। নতুন একটা ফাঁকা খুললে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছানো অণুর সংখ্যা কমে কী করে?
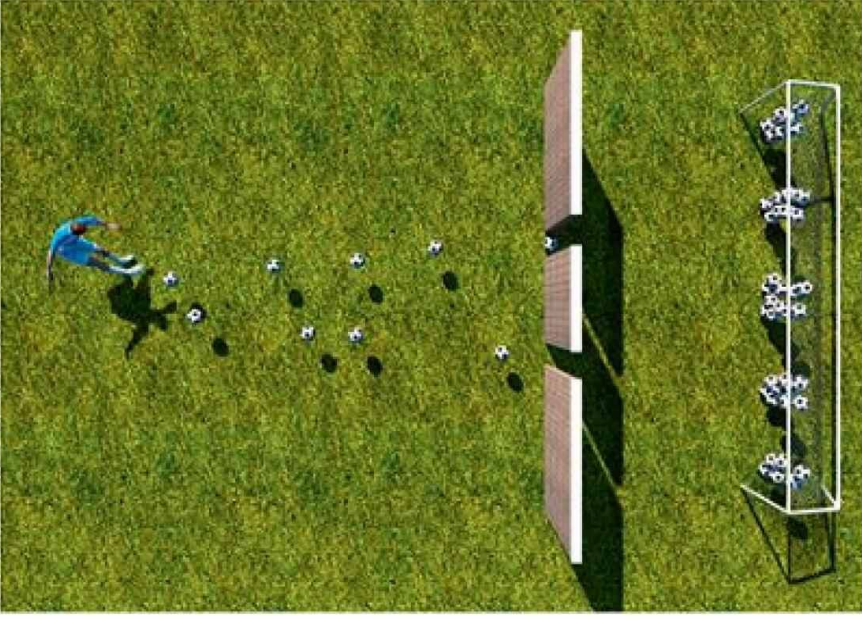
Buckyball Soccer When molecular soccer balls are fired at slits in a screen, the resulting pattern reflects unfamiliar quantum laws.

পুরো ব্যাপারটার খুঁটিনাটি খেয়াল করলে আমরা উত্তরের একটা আভাস পেতে পারি। আণবিক ফুটবল পরীক্ষার সময় দেখা যায় দুইটি ছিদ্রের যেকোনো একটি দিয়ে বল গেলে যেখানে পৌঁছানোর কথা তার একদম মাঝ অংশে বেশ কিছু অণু হাজির হয়। সেখান থেকে একটু দূরে সরলেই অণুর সংখ্যা কমে যায়, কিন্তু তার থেকে আরো একটু সরলে আবারো অণুর পরিমাণ বেড়ে যায়। এই ছাপটা দুইটা ছিদ্র আলাদা আলাদা ভাবে খুলে দিলে যে দুটি ছবি পাওয়া যায় তাদের যোগফলের সাথে মেলে না। বরং তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যতিচারী তরঙ্গের চিত্রের সাথে তার মিল আছে। যে অংশে কোনো অণু পৌঁছায় না সেখানে ছিদ্রদুটি থেকে আসা তরঙ্গদুটি বিপরীত দশায় পৌঁছাচ্ছে, তাই তাদের ধ্বংসাত্বক ব্যাতিচার ঘটছে; আর যেখানে বেশি অণু পাওয়া যায় সেখানে তরঙ্গদুটি সমদশায় পৌঁছাচ্ছে, তাই তাদের গঠনমূলক ব্যাতিচার ঘটছে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার শুরুতে প্রায় দুহাজার বছর সাধারণ জ্ঞান বা অন্তর্জ্ঞানই ছিলো তাত্বিক ব্যাখ্যার ভিত্তি। আমাদের প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে আমরা এই বাকিবল পরীক্ষার মত এমন অনেক পরীক্ষা করতে সক্ষম হই। এবং সেসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রকৃতির এমন এক রুপ দখতে পাই যেটা আমাদের দৈনিন্দিন অভিজ্ঞতা এবং তদলব্ধ অন্তর্জ্ঞানের সাথে মেলে না। এই বাকিবল পরীক্ষা হচ্ছে এ ধরনের আরো অনেক পরীক্ষার একটি বৈশিষ্ট্যসূচক পরীক্ষা যেটা ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রয়োজন পড়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের। রিচার্ড ফাইনম্যান তো বলেছেনই, এই যে উপরে বর্ণিত দ্বিচিড় পরীক্ষা, "এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সকল রহস্য।"

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন নিউটনীয় তত্ব পারমাণবিক এবং অতিপারমাণবিক স্তরে প্রকৃতির ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হলো তখনই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মূলনীতিগুলো

উদ্ভাবিত হয়। পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বগুলোর কাজ হচ্ছে প্রকৃতির সকল বল এবং বস্তুর সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা। ক্লাসিক্যাল নিউটনীয় তত্ত্ব আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে যৌক্তিককাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে অনুযায়ী পদার্থ দিয়ে তৈরি বস্তুসমূহের একক অস্তিত্ব আছে, এদেরকে নির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক আছে, এরা চলার সময় নির্দিষ্ট পথে চলে, এবং এমন আরো কিছু। এদিকে কোটান্টাম মেকানিক্স পারমাণবিক বা অতিপারমানবিক স্তরে কণিকাসমূহের আচরণ বোঝার একটা যৌক্তিক কাঠামো দেয়। কিন্তু আমরা পরে দেখবো এর যৌক্তিক কাঠামোটা এমন, যে তাতে কোনো বস্তুর অবস্থান, পথ, এমন কি তার অতীত-ভবিষ্যতও সুক্ষ্মভাবে নির্ধারিত নয়। মহাকর্ষবল, তড়িতচৌম্বকীয় বলের মত বল সমূহের কোয়ান্টাম তত্ব এধরনের একটা যৌক্তিক কাঠামোর উপর ভর করেই গঠিত।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে দারুণ সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতো। কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে তাই প্রশ্ন আসে, যে তত্ব এমন আজব এক যৌক্তিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে গঠিত সেটা কি দৈনন্দিন ঘটনাবলিকে সেভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে? পারবে, কারণ আমাদের আশেপাশের সব বস্তুই হচ্ছে এক ধরনের মিশ্রবস্তু যেগুলো অকল্পনীয় সংখ্যক অণু-পরমাণু দ্বারা গঠিত। এ সংখ্যা এতই বেশি যে আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য মহাবিশ্বেও এত নক্ষত্র নেই। এবং যদিও এসব বস্তুর গঠনকারী উপাদান কোয়ান্টাম মেকানিক্স মেনে চলে, এটা দেখানো যায় যে অণুপরমাণুগুলো মিলে যখন ফুটবল, বা শালগম বা জাম্বো জেট- এমনকি আমাদেরও- তৈরি করে তখন এটা ক্লাসিক্যাল আচরণই করে। ফলে এসব বড় আকারের বস্তুর জন্য সেই দ্বিচিড়ের মধ্যে দিয়ে ব্যতিচারও ঘটে না। তাই যদিও দৈনন্দিন বস্তুসমূহের গঠনকারী উপাদান কোয়ান্টাম মেকানিক্স মেনে চলে, তবুও নিউটনেরতত্ত্বকে একটা কার্যকর তত্ব হিসাবে নেওয়া যায় যেটা সূক্ষ্মভাবে আমাদের আশেপাশের জগৎকে বর্ণনা করছে।

এটা শুনে অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানে এমন অনেক উদাহরণই আছে যেখানে একটা বড় সন্নিবেশ তার গঠনকারী প্রতিটি উপাদানের থেকে ভিন্ন আচরণ করে থাকে। ঠিক যেমন মাত্র একটি নিউরনের বৈশিষ্ট্য থেকে পুরো মানব মস্তিষ্কের আচরণ বা মাত্র একটি পানির অণুর বৈশিষ্ট্য থেকে একটি পুরো হ্রদের আচরণ বোঝা যায় না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্ষেত্রে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা এখনো এ থেকে কীভাবে নিউটনের সূত্রগুলো আসে সেটার খুঁটিনাটি নিয়ে কাজ করছেন। তবে এটা আমরা নিশ্চিত জানি, যে সকল বস্তুর গঠনকারী ক্ষুদ্র উপাদানগুলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স মেনে চলে এবং নিউটনের সূত্রগুলো সেসব ক্ষুদ্র উপাদানের সন্নিবেশে গঠিত বৃহদায়তন বস্তুসমূহের আচরণ বর্ণনা করে।

তাই নিউটনীয় তত্ত্বের অনুমানগুলোই আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার চিত্রের সাথে মেলে। কিন্তু এককভাবে একটি অণু বা পরমাণু আমাদের অভিজ্ঞতার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে কাজ করে। তাই কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যাই হচ্ছে বাস্তবতার সেই নতুন রূপায়ণ বা মডেল যার সাহায্যে মহাবিশ্বের চিত্রটা পাওয়া যাচ্ছে। এটা এমন এক চিত্র যেখানে আমাদের আগেকার বাস্তবতা সংক্রান্ত অনেক ধারণারই আর কোনো অর্থ নেই।

দ্বিচিড় পরীক্ষাটি ১৯২৭ সালে প্রথম করেন বেল ল্যাবের নিরীক্ষণ-পদার্থবিজ্ঞানী ক্লিন্টন ডেভিসন এবং লেস্টার জার্মার। তারা বাকিবলের বদলে ব্যবহার করেছিলেন আরো সরল

বস্তু, ইলেক্ট্রন। যেখানে তারা নিকেল ক্রিস্টালের সাথে ইলেকট্রন রশ্মির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ইলেকট্রনের মত পদার্থের কণিকা যে পানির তরঙ্গের মত আচরণ করে সে থেকেই পরে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূচনা হয়। যেহেতু বৃহদায়দতনে এ ধরনের ঘটনা দেখা যায় না, তাই অনেক দিন ধরেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই কৌতূহল ছিলো যে কোনো বস্তু ঠিক কতটা বড় বা জটিল হয়ে যাওয়ার পরেও তাতে এই তরঙ্গসুলভ আচরণ পরিলক্ষিত হবে। যদি কোনো আস্ত মানুষ বা জলহস্তির উপর এ ধরনের ক্রিয়া দেখা যেতো তাহলে নিশ্চয়ই তুলকালাম ঘটে যেত, কিন্তু আমরা জানি যে বস্তু যত বড় হতে থাকে তার কোয়ান্টাম আচরণত ততই হারিয়ে যেতে থাকে। তাই এটা খুবই অসম্ভব যে চিড়িয়াখানার কোনো প্রাণী তরঙ্গের মত করে তার খাঁচার শিক গলে বেরিয়ে যাবে। অবশ্য ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানীরা দিনে দিনে বড় থেকে বড়তর বস্তুতে এ ধরনের আচরণ পর্যবেক্ষণ করছেন। বিজ্ঞানীরা একদিন বাকিবলের জায়গায় একটা ভাইরাস ব্যবহার করেও এই পরীক্ষা করতে পারবেন বলে আশাবাদী। যে ভাইরাস শুধু যে বাকিবলের চেয়ে অনেক বড় তাই-ই না, এটাকে অনেকে জীবন্ত গণ্য করে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা যেসব যুক্তি দেব সেগুলো বোঝার জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অল্পকিছু ধারণা থাকলেই হবে। যার অন্যতম একটা হচ্ছে তরঙ্গ/কণিকা দ্বৈতাবস্থা। পদার্থের কণিকাও যে তরঙ্গের মত আচরণ করতে পারে সেটা জেনে সবাই অবাক হয়। ওদিকে আলো যে তরঙ্গের মত আচরণ করে তাতে আমরা কেউ অবাক হই না। আলোর এই তরঙ্গসুলভ আচরণ খুবই স্বাভাবিক মনে হবার কারণ এই ধারণাটার সাথে আমরা প্রায় দুইশ বছর ধরে পরিচিত। আপনি যদি উপরে বর্ণিত পরীক্ষার চিড়দুটোতে আলো দিয়ে পরীক্ষাটা করেন তাহলে দুইটা চিড় থেকে দুইটা তরঙ্গ এসে পর্দায় পড়বে। কোথাও তাদের দুটিরই উঁচু বা নিচু অংশ পরস্পরের সাথে মিলবে সেখানে আলো হবে খুবই উজ্জ্বল আর কোথাও একটা উঁচু মিলবে একটা নিচু অংশের সাথে তারপর কাটাকাটি গিয়ে ওখানে সৃষ্টি হবে অন্ধকার এলাকা। ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী থমাস ইয়ং উনবিংশ শতাব্দীতে এই পরীক্ষা করেন, যেটা সবার কাছে এটাই প্রতীয়মান করে যে আলো তরঙ্গধর্মী, নিউটনের মত অনুযায়ী কণিকাধর্মী নয়।
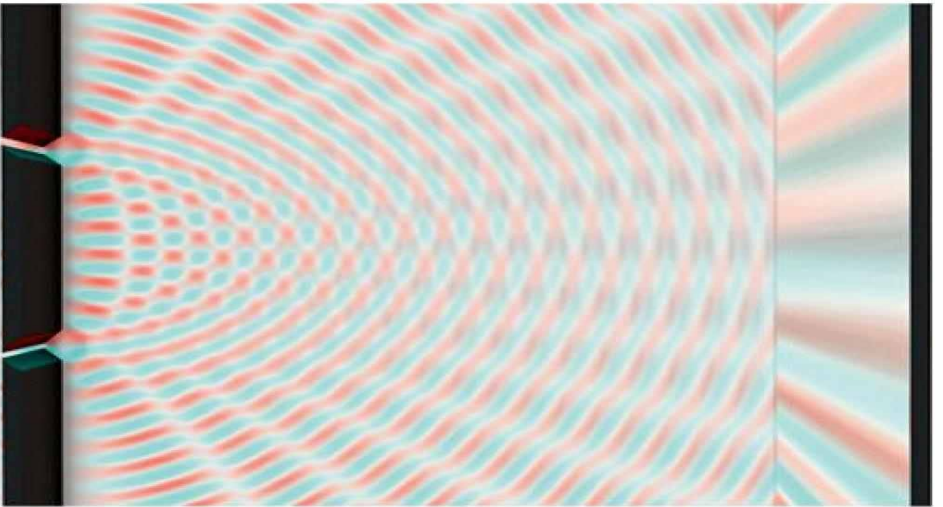
Young's Experiment The buckyball pattern was familiar from the wave theory of light.

অনেকে এটা ভাবতে পারেন যে নিউটন আলোকে তরঙ্গধর্মী না বলে ভুল করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখা গেছে আলো যে কণিকাধর্মী আচরণ করে তার সেই ধারণাটা সঠিক। এখন আমরা এই কণিকাকে বলি ফোটন। আমরা নিজেরা যেমন বিপুল পরিমান পরমাণুদ্বারা গঠিত তেমনি আমাদের দেখা আলো ও বিপুল পরিমান ফোটনের সমষ্টি। এমনকি একটি এক ওয়াটের ডিমলাইটও প্রতি সেকেন্ডে বিলিয়ন বিলিয়ন ফোটন নির্গত করে। মাত্র একটি ফোটন সহজে আলাদাভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু গবেষণাগারে আমরা ফোটনের এমন ক্ষীণ রশ্মি তৈরি করতে পারি যেখানে ফোটনগুলো একটা একটা করেই ছুটে যায়। সেই আলাদা আলাদা ফোটনকে আমরা ইলেকট্রন বা বাকিবলের মত একটা একটা করে নিরূপণ করতে পারি। এবং আমরা ইয়ং-এর পরীক্ষাটা এতটাই ক্ষীণ আলোকরশ্মি দিয়ে করতে পারি, যেন সেখানে একেকটা ফোটোন কয়েক সেকেন্ড পর পর দেয়ালে গিয়ে পৌঁছায়। আমরা যদি এ অবস্থায় বিভেদক দেয়ালের অপর পাশে পর্দায় পৌঁছানো ফোটনগুলোর ছাপ রেকর্ড করি, তাহলে একটা সময় দেখবো এই ছাপগুলো সবাই মিলে একটা ব্যতিচারী ছাপ সৃষ্টি করেছে। ঠিক এ ধরনের ছাপই দেখা যাবে যদি ফোটনের বদলে একটা একটা করে ইলেকট্রন বা বাকিবল ছুঁড়ে ডেভিসন-জার্মার পরীক্ষাটা করি। এখান থেকেই পদার্থবিজ্ঞানীরা একটি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন: যদি একটা একক কণিকাই নিজের সাথে ব্যতিচার করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই আলোর তরঙ্গ ঠিক অনেকগুলো কণিকার ঢেউ নয় বরং এর উপাদান প্রতিটা কণিকার নিজেরই তরঙ্গ ধর্ম আছে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আরেকটা স্বীকার্য হচ্ছে অনিশ্চয়তার নীতি, যেটা ১৯২৪ সালে ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ প্রথম বর্ণনা করেন। এই নীতি মতে কিছু কিছু চলকের মান আমাদের পক্ষে একই সঙ্গে নির্দিষ্ট করে জানা সম্ভব নয়, যেমন অবস্থান এবং গতি। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো কণিকার অবস্থানের অনিশ্চয়তার সাথে তার ভরবেগের (ভর এবং বেগের গুণফল) অনিশ্চয়তা গুণ করেন তাহলে সেই গুণফল কখনোই একটা নির্দিষ্ট ধ্রুবকের কম হতে পারবে না। এই ধ্রুবকের নাম প্লাঙ্ক ধ্রুবক। ব্যাপারটা জটিল মনে হতে পারে কিন্তু এর মূল কথা হলো: আপনি যত সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান নির্ণয় করবেন তার গতি নির্ণয়ের সূক্ষ্মতাও ততই কমবে। আরো লক্ষণীয় যে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য এককের তুলনায় প্লাঙ্ক ধ্রুবক অতিক্ষুদ্র। এসব এককে প্রকাশ করলে প্লাঙ্ক ধ্রুবকের মান আসে ৬/১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ এর কাছাকাছি। একটি বৃহদায়তন বস্তু যেমন ফুটবলের কথাই ধরা যাক। যদি প্রায় এক কেজির এক তৃতীয়াংশ ভরের একটি ফুটবলের অবস্থান এক মিলিমিটার সূক্ষ্মতায় নির্ণয় করা হয়, তারপরও তাত্ত্বিক ভাবে আমরা তার বেগকে এক কিলোমিটার পার ঘন্টার এক বিলিয়নের বিলিয়নের বিলিয়নের এক ভাগ সূক্ষতায় নির্ণয় করতে পারবো। এর কারণ এই এককে, ফুটবলটির ওজন ১/৩ এবং এর অবস্থানের অনিশ্চয়তা ১/১০০০। এত ক্ষুদ্র মান দিয়ে প্লাঙ্ক কন্সটান্টের দশমিকের পরের এতগুলো শূন্যকে বাগে আনা যায় না। তাই সেগুলো বেগের উপর চেপে বসে। কিন্তু সেই একই এককে ইলেকট্রনের ভর ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১, তাই ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ঘটনা হবে পুরো আলাদা। তাই আমরা যদি একটা ইলেকট্রনের অবস্থান একটি পরমাণু আকৃতির স্থানের মধ্যে নিশ্চিত করতে পারি তাহলে তার বেগকে খুব করে হলেও প্রতি সেকেন্ডে কম-বেশি ১০০০ কিলোমিটার এর মধ্যে নিশ্চিত করতে পারবো না, যেটা মোটেই সূক্ষ্ম পরিমাপ নয়।
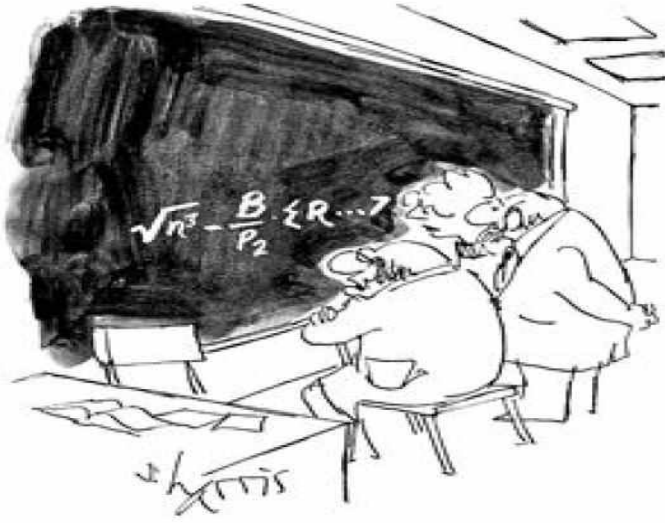
"If this is correct, then everything we thought was a wave is really a particle, and everything we thought was a particle is really a wave."

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মতে আমরা যতই তথ্য সংগ্রহ করি না কেন বা আমাদের গণনক্ষমতা যতই শক্তিশালী হোক না কেন আমরা কখনো কোনো ভৌত ঘটনার ফলাফল নিশ্চয়তার সাথে গণনা করতে পারবো না কারণ প্রকৃতিতেই নির্ধারিত নিশ্চিত মান বলেই কিছু নেই। বদলে, কোনো একটা ব্যবস্থার একটা আদি অবস্থা থেকে একটা শেষ অবস্থায় যাওয়ার মূলত একটা অনিশ্চিত প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যভাবে বললে, এমনকি একদম সরলতম ঘটনাতেও প্রকৃতি তার ফলাফলকে নির্ধারণ করে না। এর বদলে সে সম্ভাব্য সব রকম ঘটনাই ঘটার কিছু নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করে। আইনস্টাইনের মত করে বললে দাঁড়ায়, যেন ঈশ্বর প্রতিটি ভৌত ঘটনা ঘটার আগেই ছক্কা ছুঁড়ে দেখে। এই চিন্তা আইনস্টাইনের জন্য বেশ উদ্বেগের বিষয় ছিলো, তাই যদিও তিনি কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার অন্যতম স্থপতি, তবুও পরবর্তীতে তিনি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনেক সমালোচনা করেছেন।

এসব শুনে মনে হতে পারে প্রকৃতি সুনির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে না, কিন্তু সে ধারণা সত্যি নয়। বরং এটা নিশ্চয়তাবাদের এক নতুন ধারণা জন্ম দেয়: কোনো ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা দেওয়া থাকলে, প্রকৃতির নিয়মগুলো সেখান থেকে একটি নিশ্চিত পরবর্তী অবস্থা নির্ধারণ করার বদলে, সম্ভাব্য সকল পরবর্তী অবস্থার প্রতিটি ঘটার সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করে। ব্যাপারটা শুনতে যেমনই লাগুক, বিজ্ঞানীরা সে তত্বটাই মেনে নেবে যেটা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাথে মেলে, এমনকি তাদের মন মানতে না চাইলেও।

যাচাইযোগ্যতা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের একটা আবশ্যকীয় গুণ। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার এই সম্ভ্যাব্যতা নির্ভর তত্ব থেকে যদি এমন অবস্থা দাড়াতো যে এর অনুমানসমূহকে পরীক্ষা বা যাচাই করা যাচ্ছে না। তাহলে এটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মর্যাদা পেতো না। কিন্তু আমরা দেখি যে এ ধরনের সম্ভাব্যতাময় একটা রূপ থাকারপরও কোয়ান্টাম তত্বকে আমরা যাচাই

করতে পারি। যেমন আমরা পরীক্ষাগুলো অনেকবার করে দেখতে পারি, যে ফলাফল কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে অনুমান করা সম্ভাব্যতার সাথে মিলে যাচ্ছে। বাকিবল পরীক্ষাটার কথাই ভাবুন। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা বলছে, কোনো কিছুই একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থিত নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে তার ভরবেগের অনিশ্চয়তা হয়ে যাবে অসীম। এমনকি, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী, প্রতিটি কণিকাকেই মহাবিশ্বের যে কোনো অবস্থানে পাওয়া যাওয়ার কিছুটা হলেও সম্ভাব্যতা রয়েছে। তাই দ্বিচিড় পরীক্ষায় ছুঁড়ে দেওয়া ইলেকট্রন দেওয়াল পেরিয়ে পর্দায় পৌঁছানোর সম্ভাব্যতা যদিও খুব বেশি তারপরও এটা সবকিছু ছাড়িয়ে আলফা সেনচুরাই নামক নক্ষত্রের ওপারে বা আপনার অফিসের ক্যাফেটেরিয়ার আলুরদমের মধ্যে চলে যাওয়ারও কিছুটা হলেও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আপনি যদি একটা কোয়ান্টাম বাকিবলকে উঠিয়ে লাথি দেন, সেটা কোথায় গিয়ে যে পড়বে তা নিশ্চিত করে বলার কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু কোথায় পড়ার সম্ভাব্যতা কত সেটা নির্ণয় করা যায়। ফলে আপনি যদি এই পরীক্ষাটা বারবার করেন এবং কোথায় গিয়ে বাকিবলগুলো পড়ছে তার হিসাব রাখেন তাহলে দেখবেন সেই বিন্যাস আমাদের তাত্ত্বিকভাবে গণনা করা সম্ভাব্যতার সাথে মিলে যাচ্ছে।

এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানে বা দৈনন্দিন হিসাবে ব্যবহৃত সম্ভাব্যতার সাথে কোয়ান্টাম সম্ভাব্যতার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ব্যাপারটা বোঝা যায় যদি আমরা আমাদের বাকিবল ছোড়ার পরীক্ষায় পর্দায় সৃষ্ট ছাপের সাথে ডার্টবোর্ডে ছুঁড়ে দেওয়া ডার্টের প্যাটার্নের তুলনা করি। খেলোয়াড়রা যদি বিয়ার খেয়ে টাল হয়ে না থাকে তাহলে সাধারণত বোর্ডের বাইরের তুলোনায় মাঝেরদিকেই বেশির ভাগ ডার্ট এসে লাগবে। বাকিবলের মতই যেকোনো ডার্ট যেকোনো যায়গাতেই পড়তে পারে। এভাবে একটা সময় পরে ডার্টবোর্ডে ডার্টের আঘাতে সৃষ্ট গর্তের ঘনত্ব দেখে বোর্ডের বিভিন্ন যায়গায় ডার্ট লাগার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। আমরা এই ডার্টবোর্ডের বিভিন্ন অংশে ডার্টের ছাপের ঘণত্ব দেখে বলতেই পারি যে কোনো একটা ডার্ট, বোর্ডের কোনো অংশে পড়ার সম্ভাব্যতা এতটুকু। কিন্তু খেয়াল করার বিষয় হলো এই সম্ভাব্যতার সৃষ্টি হচ্ছে কারণ আমরা জানিনা একটা ডার্ট ঠিক কিভাবে ছোঁড়া হয়েছে। ডার্ট ছোড়ার অবস্থাটা সঠিকভাবে জানলে সেই ডার্ট বোর্ডের কোথায় গিয়ে লাগবে সেটা আমরা ঠিকই সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করতে পারতাম। অর্থাৎ একজন খেলোয়াড় ঠিক কোন স্থান থেকে ডার্টটা ছুঁড়েছেন, কত ডিগ্রি কোনে, কত বেগে, এবং শুরুতে ডার্টটির ঘূর্ণন কত এসব জানা থাকলে ডার্টটি বোর্ডের কোথায় আঘাত করবে সেটা যতটা ইচ্ছা ততটা সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। তাই দেখা যাচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে ধরনের সম্ভাব্যতার সম্মুখীন হই সেগুলো, সেইসব দৈনন্দিন ঘটনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়। বরং সেই ঘটনার আদি অবস্থা সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান না থাকার ফল।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্ভাব্যতা ভিন্ন ধরনের। এটা প্রকৃতির একেবারে মৌলিক এক বিক্ষিপ্ততার বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতির কোয়ান্টাম রূপায়ণের মূলনীতি গুলো এমনই যে সেগুলো শুধু আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই নয়, বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের যে সহজাত ধারণা, তারও বিরুদ্ধ। যারা এইসব মূলনীতিকে বিদঘুটে বা বিশ্বাস করা কষ্ট মনে করবে তাদের জন্য সুখবর হচ্ছে তাদের দলে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক রথী-মহারথীরাও রয়েছেন। যেমন, আইনস্টাইন এবং ফাইনম্যান , তার বর্ণিত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের চিত্রটা আমরা শীঘ্রই দেখবো। ফাইনম্যান তো একবার লিখেছেনই, “আমার মনে হয় এটা বলা বেশ নিরাপদ যে

কোয়ান্টাম মেকানিক্স আসলে কেউই বোঝে না।" কিন্তু কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা আমাদের পর্যবেক্ষণের সাথে হুবহু মিলে যায়। এটা কখনো কোনো পরীক্ষাতেই ফেল করে নি, এবং বিজ্ঞানের অন্য যেকোনো তত্ত্বের চেয়ে এটাকে বহুগুণে বেশি বার পরীক্ষা করা হয়েছে।

১৯৪০ সালের দিকে রিচার্ড ফাইনম্যান কোয়ান্টামজগৎ আর নিউটনিয়ান জগৎ সম্পর্কে এক চমকপ্রদ অন্তর্জ্ঞান লাভ করেন। দ্বিচিড় পরীক্ষায় কীভাবে এই ব্যাতিচারি ছাপ সৃষ্টি হয় সেটা তাকে তখন খুবই চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলো। পাঠকের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে যে দ্বিচিড় পরিক্ষায় দুইটি ছিদ্র খোলা অবস্থায় আমরা যে ছাপটা পেয়েছি সেটা ছিদ্রদুটি একটি একটি করে খুলে পাওয়া আলাদা দুটি ছাপের যোগফলের সমান হয় না। বরং দুইটি চিড় খুলে দেওয়ার পরে আমরা হালকা ও গাঢ় ডোরাকাটা একটা ছাপ দেখি। যার অন্ধকার অংশে কোনো কণিকা পড়ে না। অর্থাৎ শুধু প্রথম চিড়টা খোলা থাকলে কণিকাসমূহ যেসব যায়গায় পৌঁছাতো, অপর চিড়টা খুলে দেওয়ার সাথে সাথে তার বেশকিছু অংশেই আর কোনো কণিকা পৌঁছায় না। ব্যাপারটাকে এভাবেও দেখা যায় যে, দুইটি ছিড় খোলা থাকা অবস্থায় যে সব অন্ধকার অংশে কোনো কণিকা পৌঁছায় না, শুধু মাত্র একটা খোলা থাকলে সেখানে ঠিকই কণিকা গিয়ে পৌঁছাতো। তাহলে যখন দুটি চিড়ই খোলা থাকে তখন কোনো একটা দিয়ে পার হওয়া কণিকা বুঝছে কী করে, অপর চিড়টাও খোলা আছে কিনা, যে সেই অনুযায়ী নিজের গতিপথ সে পালটে নিচ্ছে? দেখে মনে হচ্ছে যেন যাত্রা পথের কোনো অংশে এসে দুইটি চিড় বা ছিদ্র সম্পর্কেই কণিকাগুলো কিছু একটা জেনে যাচ্ছে। এ ধরনের আচরণ আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ আমরা দেখি ছুঁড়ে দেওয়া কোনো বল একটা দরজা দিয়ে পার হওয়ার সময় অপর দরজা খোলা নাকি বন্ধ তা দিয়ে কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না।

নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী প্রতিটি কণিকা উৎস থেকে পর্দায় পৌঁছানো পর্যন্ত একটা সুনির্ধারিত যাত্রা পথ মেনে চলে। ঠিক যেমনটা হয় যখন আমরা একটা ফুটবলকে ছুঁড়ে দিই। এই চিত্রে কোনো কণিকার পক্ষে একটা দরজা দিয়ে যাওয়ার পথে অপর দরজাটাও খোলা আছে কি না, সেটা দেখে আসার কোনো উপায়ই নেই। ওদিকে কোয়ান্টাম রূপায়ণ মতে, কোনো কণিকা তার যাত্রার শুরু থেকে শেষে পৌঁছানোর মাঝে কোনো নির্দিষ্ট পথ মেনে চলে না। ফাইনম্যান বুঝেছিলেন, এর মানে এই না, যে কণিকাটি উৎস থেকে পর্দায় যেতে কোনো পথ দিয়েই যাচ্ছে না। বরং এর একটা অর্থ হতে পারে কণিকাটি ঐ দুটি বিন্দুর সংযোগকারী সম্ভাব্য সবগুলো পথ দিয়েই যাচ্ছে। ফাইনম্যানের মতে, এটাই কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের সাথে নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের মূল পার্থক্য। দুইটি চিড়ের অবস্থাই এখানে হিসাবে আসছে কারণ কণিকাটি যাওয়ার সময় কোনো একটি চিড় দিয়ে যাওয়ার বদলে উভয় চিড় দিয়েই একসাথে পার হচ্ছে। ব্যাপারটা শুনতে কল্পবিজ্ঞানের মত, কিন্তু এটাই সত্যি। এই সবগুলো সম্ভাব্য পথের সমষ্টিকে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করার একটা উপায় ফাইনম্যান বের করতে সক্ষম হন, যেটার সাহায্যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সকল নিয়মই পাওয়া সম্ভব। ফাইনম্যানের তত্ত্বের গাণিতিক এবং ভৌত রূপ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মূল রূপায়ণের থেকে ভিন্ন, কিন্তু দুটো থেকে পাওয়া হিসাব ও অনুমানসমূহ একে অপরের সাথে হুবহু মিলে যায়।

ফাইনম্যানের বিবরণ অনুযায়ী, আমাদের ঐ দ্বিচিড় পরীক্ষায় কোনো কণিকা একই সঙ্গে বিভিন্ন রকম পথ দিয়ে যায়। যার কোনোটা শুধু একটা ছিদ্র দিয়েই পার হচ্ছে, কোনোটা

পার হচ্ছে অপর ছিদ্র দিয়ে; কোনোটা হয়তো প্রথম ছিদ্র দিয়ে পার হয়ে ফিরে গিয়ে দ্বিতীয়টার মধ্যে দিয়ে ঘুরে আবারো প্রথমটা দিয়ে পার হচ্ছে; কোনোটা হয়তো মোড়ের চিংড়ি রেস্তোরা থেকে ঘুরে এসে নিজের যাত্রা পথের শেষে পৌঁছাচ্ছে, আবার কোনোটা হয়তো বাড়ি ফেরার পথে বৃহস্পতি গ্রহকেও দুপাক ঘুরে আসছে; এমনকি এমন পথ দিয়েও কণিকা যাচ্ছে যেটা পুরো মহাবিশ্বকেই কয়েক পাক ঘুরে আসে। ফাইনম্যানের মতে এভাবেই কণিকারা জানতে পারে কোন ছিদ্রটি খোলা আছে। কারণ কোনো একটা ছিদ্র খোলা থাকলে অবশ্যই সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়েও কণিকার কিছু পথ যাবে। তাই যখন উভয় ছিদ্রই খোলা থাকে তখন একটা দিয়ে পার হওয়া পথ অন্যটা দিয়ে পার হওয়া পথের সাথে উপরিপাতিত হয়ে ব্যাতিচার-এর সৃষ্টি হয়। এসব শুনে পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে, কিন্তু এখনকার মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানের চর্চায় –এবং এই বইয়ের আলোচনার জন্য- ফাইনম্যানে করা সূত্রায়ণই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আদিরূপের চেয়ে বেশি কার্যকর।
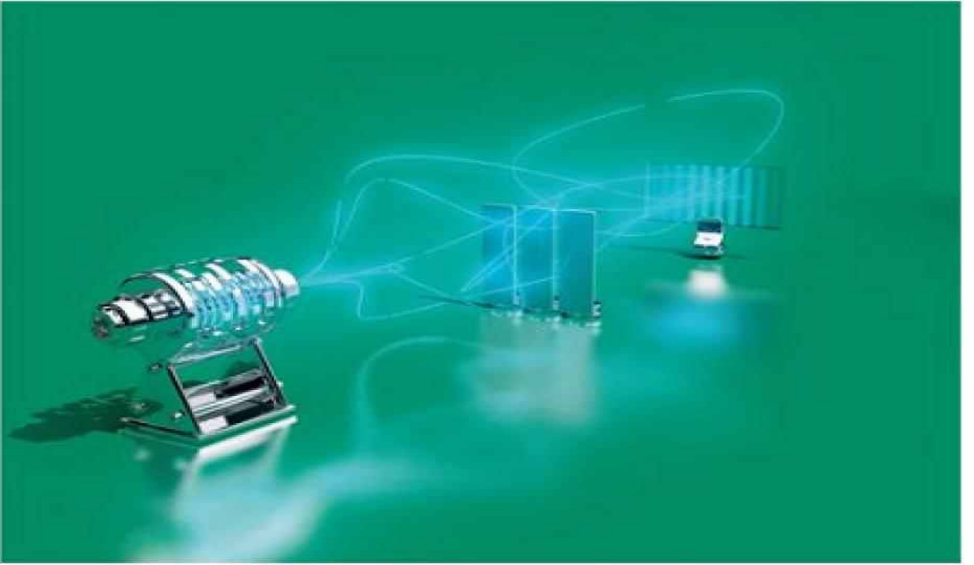
Particle Paths Feynman's formulation of quantum theory provides a picture of why particles such as buckyballs and electrons form interference patterns when they are shot through slits in a screen.

একটু পরেই আমরা যে তত্ত্বসমূহ উপস্থাপন করব সেগুলো বোঝার জন্য কোয়ান্টাম বাস্তবতার ফাইনম্যানীয় রূপায়ণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই রূপায়ণটা কেমন সেটা আমরা এখন আরেকটু বিশদে দেখবো। একটা খুব সহজ-সরল ব্যবস্থা কল্পনা করুন যেখানে সকল কণিকা A বিন্দু থেকে শুরু করে মুক্তভাবে চলতে থাকে। নিউটনীয় রূপায়নে কণিকাগুলো সরল পথে চলবে। তাই একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে আমরা সেই সরল রেখা বরাবর কোনো B বিন্দুতে কণিকাটিকে খুঁজে পাবো। ফাইনম্যানীয় রূপায়নে একটা কণিকা কোনো পথ দিয়ে A থেকে B তে যাওয়ার সময় ঐ পথের জন্য একটা ফেজ বা দশা লাভ করে। যে দশার নির্দিষ্ট সাংখ্যিক মান রয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি এই রূপায়নে একটা কণিকা সম্ভাব্য সবগুলো পথ দিয়েই যায়। তাই সম্ভাব্য সবগুলো পথের জন্যই কণিকাটি একটি করে দশা লাভ করে। এই দশা থেকে বোঝা যায় কণিকাটি তার তরঙ্গ চক্রের কোন অবস্থায় আছে, অর্থাৎ কণিকাটি কি তরঙ্গশীর্ষে, নাকি

তরঙ্গপাদে, নাকি এর এদের মাঝামাঝি কোনো অবস্থায়? এই দশা গণনা করার ফাইনম্যানীয় পদ্ধতিতে দেখা যায় আপনি যখন সম্ভাব্য সবগুলো পথের জন্য প্রাপ্ত দশাসমূহকে যোগ করবেন তখন কণিকাটি A থেকে শুরু করে B তে পৌঁছানোর “সম্ভাব্যতার বিস্তার” পাবেন। এই সম্ভাব্যতার বিস্তারের বর্গই হচ্ছে কোনো কণিকা A থেকে B তে পৌঁছানোর সঠিক সম্ভাব্যতা।

প্রতিটি ভিন্ন পথের জন্যই, (মানে A থেকে B তে যাওয়ার সম্ভাব্য প্রতিটি পথের জন্য) ফাইনম্যানের এই যোগফলে আনুষঙ্গিক দশা যোগ হয়। ব্যাপারটাকে এভাবে দেখুন, ধরুন আপনার কাছে একক দৈর্ঘ্যের দুইট তীর আছে যারা ভিন্ন দুটি দশা সূচিত করে। দশার মান অনুযায়ী তীরগুলো যেকোনো দিকে নির্দেশ করতে পারে। এদেরকে যোগ করতে দিক পরিবর্তন না করে একটি তীরের শেষে অপর তীটির শুরু স্থাপন করুন। এবার প্রথম তীরের শুরু থেকে দ্বিতীয় তীরের শেষ পর্যন্ত আরেকটি তীর দিয়ে সংযুক্ত করুন। তাহলে এই নতুন তীরটিই হচ্ছে আগের দুইটি দশার যোগফল সূচক তীর। এ যোগফলের সাথে নতুন আরো কিছু দশা যোগ করতে চাইলে এভাবে একটা একটা করে দশা সূচক তীরকে প্রতিবারে প্রাপ্ত যোগ ফলের সাথে যোগ করতে থাকুন। খেয়াল করুন দশাগুলো যদি একই রেখা বরাবর একই দিকে হয় তাহলে তাদের যোগফল বেশ দীর্ঘ হয়ে যায়। কিন্তু তারা যদি একেকটা একেক দিকে নির্দেশ করে তাহলে একটির প্রভাবে অন্যটির অনেক খানি কাটাকাটি পড়ে এবং প্রাপ্ত যোগফল বেশ ছোটো হয়। ব্যাপারটাকে নিচে ব্যাপারটাকে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।

ফাইনম্যানীয় পদ্ধতিতে যদি A থেকে শুরু করে কোনো কণিকার B তে পৌঁছানোর সম্ভাব্যতার বিস্তার নির্ণয় করতে হয় তাহলে প্রতিটি সম্ভাব্য পথের জন্য প্রাপ্ত দশাকে, বা দশাসুচক তীরকে, একসাথে যোগ করতে হবে। যেহেতু এরকম অসীম সংখ্যক পথ সম্ভব সেহেতু এই হিসাবের গাণিতিক রূপটা একটু জটিলই হয়ে যায়, কিন্তু এতে ফলাফল মেলে। এমন কিছু পথ নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো।
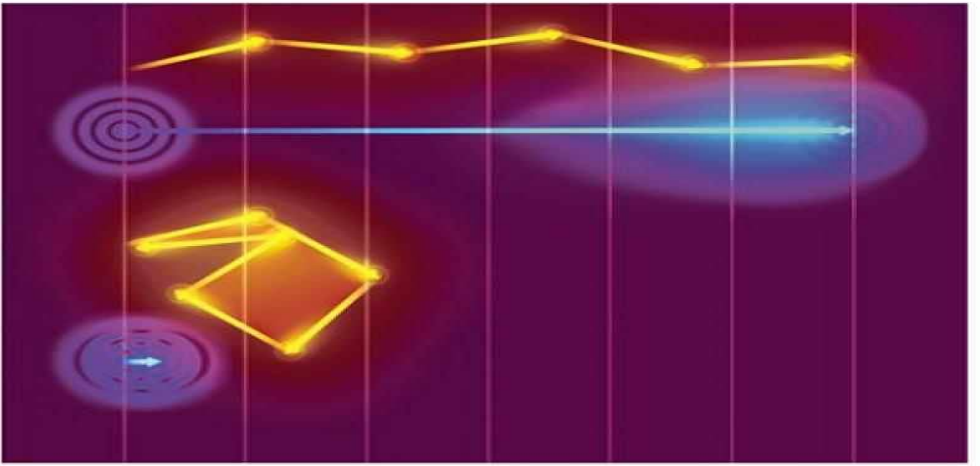
Adding Feynman Paths The effects due to different Feynman paths can enhance or diminish each other just as waves do. The yellow arrows represent the phases to be added. The blue lines represent their sum, a line from the tail of the first arrow to the point of the last one. In the lower image the arrows point in different directions and so their sum, the blue line, is very short.

যদিও কোয়ান্টাম তত্ব এবং নিউটনীয় তত্ব দেখে পরস্পর একেবারেই আলাদা মনে হয়, আমরা দেখি ফাইনম্যানীয় তত্ব খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে কীভাবে কোয়ান্টাম তত্ব থেকেই নিউটনীয় বিশ্বচিত্রের উদ্ভব ঘটে। ফাইনম্যানীয় তত্ব মতে প্রতিটি সম্ভাব্য পথের জন্য প্রাপ্ত দশার মান প্লাঙ্কধ্রুবকের উপর নির্ভর করে। প্লাঙ্কধ্রুবক অতীব ক্ষুদ্র হবার কারণে যদিও কণিকার দুইটি সম্ভাব্যপথ খুবই কাছাকাছি তবুও তাদের মধ্যে ব্যাপক দশা পার্থ্যক থাকে। ফলে উপরের চিত্রানুযায়ী এ ধরনের দশাসমূহের যোগফল শূন্যের কাছাকাছি হয়ে যায়। কিন্তু এ তত্ব থেকে এটাও দেখা যায় যে এমন কিছু পথও আছে যাদের দশাগুলো মোটামুটি একটা সরল রেখা বরাবর পড়ে যায়, ফলে সেগুলো বরাবর সম্ভাব্যতার বিস্তার হয় অনেক বেশি; অর্থাৎ, কণিকাটির যে আরচণ আমরা পর্যবেক্ষণ করি সেটা মূলত এই পথগুলোর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং আমরা আরো দেখি বড় বস্তসমূহের জন্য নিউটনীয় তত্ব যে গতিপথ হিসাব করে সেগুলোর কাছাকাছি ফাইনম্যানীয় পথের দশাগুলো অনেকটা একই রকম হয়। ফলে শুধু তাদের যোগফলই সম্ভাব্যতা বিস্তারের অনেক বড় মান দেয়। যেখানে বাকিসব পথের জন্য এই বিস্তারের মান হয় প্রায় শূন্য। যেহেতু এক্ষেত্রে নিউটনীয় গতিপথের জন্য প্রাপ্ত সম্ভাব্যতা একদম একের কাছাকাছি হয় সেহেতু, আমরা সেই বড় বস্তুদেরকে নিউটনীয় তত্ব মেনে চলতেই দেখি।
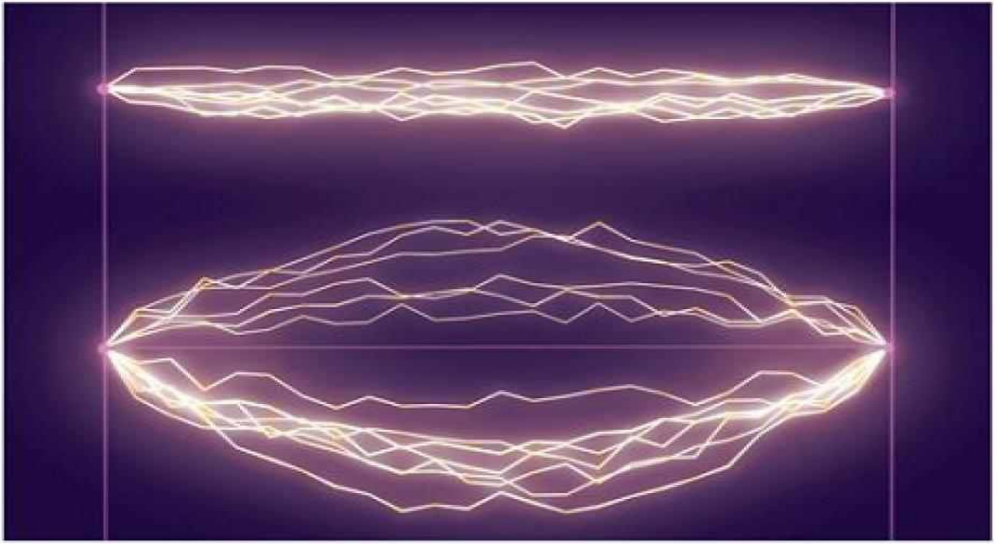
The Paths from A to B The "classical" path between two points is a straight line. The phases of paths that are near to the classical path tend to enhance each other, while the phases of paths farther from it tend to cancel out.

এখনো পর্যন্ত আমরা দ্বিচিড় পরীক্ষার আলোকেই ফাইনম্যানীয় ধারণাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পরীক্ষায় একটা চিড়ওয়ালা দেয়ালের দিকে কিছু কণিকা ছুঁড়ে দেওয়া হয় এবং দেয়ালের পিছনে পিছনে একটা পর্দার কোন অবস্থানে সেই কণিকাগুলো পৌঁছাচ্ছে সেটা পরিমাপ করা হয়। ব্যাপারটাকে আরো সাধারণীকরণ করে ভাবলে, ফাইনম্যানীয় তত্ত্বের সাহায্যে শুধু একটা কণিকাই না, বরং পুরো একটি 'ভৌত ব্যবস্থা' যেখানে অনেক কণিকা আছে, এমনকি পুরো মহাবিশ্বেরই পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আমরা অনুমান করতে পারি। একতা ভৌত ব্যবস্থা আদি অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের পরিমাপকৃত নতুন

অবস্থায় পৌঁছানোর পথে যেসব ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয় তাকে বিজ্ঞানীরা বলেন ব্যবস্থাটির 'ইতিহাস'। দ্বিচিড় পরীক্ষাটিতে একটা কণিকার ইতিহাস হচ্ছে তার অতিক্রম করা পথ। এই পরীক্ষায় পর্দার কোন অবস্থানে একটা কণিকা পৌঁছানোর সম্ভাব্যতা ঐ স্থানে পৌঁছানোর সম্ভাব্য সকল পথের উপর নির্ভর করে। তেমনি ভাবে, যে কোনো ভৌত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কোনো একটা নির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়ার সম্ভাব্যতা, সম্ভাব্য যে সব ইতিহাস ঐ পর্যবেক্ষণ দিতে পারে তাদের সবগুলোর উপরই নির্ভর করে। এ কারণেই তার এই পদ্ধতিকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার 'সামষ্টিক ইতিহাস' বা 'বিকল্প ইতিহাস' সূত্রায়ণ বলা হয়।

এতক্ষণে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ফাইনম্যানীয় রূপায়ণ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল। এখন আমরা কোয়ান্টামতত্ত্বের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি দেখবো যেটা বলে: শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করার ফলেও একটা ভৌত ব্যবস্থার ঘটনা প্রবাহে পরিবর্তন ঘটে। অফিসের বড়কর্তার থুতনিতে সস লেগে থাকলে আমরা কি ব্যাপারটাতে কোনো রকম হস্তক্ষেপ না করে শুধুই চুপচাপ দেখে যেতে পারি না? না। কারণ কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা মতে আপনি কোনো কিছুকেই "শুধুই" দেখে যেতে পারেন না। অর্থাৎ, কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে সেটার সাথে কোনো না কোনো ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে হবে। যেমন, সাধারণত কোনো কিছু দেখার জন্য আমরা তার উপর আলো ফেলি। একটা মিষ্টিকুমড়ার উপর আলো ফেললে হয়তো তাতে তেমন কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু কোনো কোনো কোয়ান্টাম কণিকার উপর এমনকি খুব হালকা আলো ফেললেও –মানে ফোটন ছুঁড়ে দিলে- সেই কণিকাটি ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয়। পরীক্ষা থেকে দেখা যায় এতে কণিকাটির অবস্থার পরিবর্তন ঠিক সেভাবেই হয় যেভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বর্ণনা করে।

ধরা যাক, আগের মতই, আমরা দ্বিচিড় পরীক্ষাটির দেয়ালের দিকে কণিকা ছুঁড়ে দিলাম এবং প্রথম যে এক মিলিয়ন কণিকা দেয়াল পার হলো তাদের পর্দায় পৌঁছানোর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলাম। এখন যদি পর্দার বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানো সব কণিকাকে আমরা এক সাথে লেখচিত্রে বসাই তাহলে একটা ব্যতিচারী ছাপ দেখতে পাবো। এরপর আমরা যদি কোনো কণিকা A থেকে শুরু করে B তে পৌঁছানোর সম্ভাব্য সকল পথের ফেজ বা দশা যোগ করি এবং এ পদ্ধতিতে পর্দার বিভিন্ন বিন্দুর জন্য কণিকাটির সেখানে পৌঁছানোর সম্ভাব্যতার লেখচিত্র তৈরি করি তাহলে দেখতে পাবো সেটা আমাদের আগে পাওয়া ব্যতিচারী লেখচিত্রের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

এখন মনে করুন মাঝামাঝি একটা C অবস্থানে আমরা একটা বাতি জ্বালালাম। যেন দেখতে পারি কণিকাটি A থেকে B তে যাওয়ার সময় ১-নং চিড় নাকি ২-নং চিড় দিয়ে গেছে। এই যে পথের দিশা, যেটা আমরা নির্দিষ্ট করে জানলাম এটাকে বলে "কোন-পথ" তথ্য। যে তথ্য থেকে কোনো কণিকা A থেকে চিড় ১ হয়ে B তে, নাকি A থেকে চিড় ২ হয়ে B তে গেছে সেটা নির্দিষ্ট করে জানা যায়। এ তথ্য থেকে যেহেতু আমরা নির্দিষ্ট করে জানতে পারি যে প্রতিটি কণিকা ঠিক কোন পথ দিয়ে গেছে সেহেতু আমাদের সম্ভাব্যতার বিস্তারের যোগ ফলে এখন আর অন্যান্য পথগুলোর দশা যোগ হবে না। অর্থাৎ ১-নং চিড় দিয়ে যে কণিকা পার হলো তার সম্ভাব্যতার বিস্তার নির্ণিত হবে শুধু মাত্র সেই ১-নং পথের আলোকেই। তাই তখন আগে হিসাবে আসা সম্ভাব্য অন্য পথগুলোর দশা আর

বিবেচ্য হবে না। ফাইনম্যান বলেছিলেন, ব্যতিচারী ছাপটা তৈরি হয় কোনো কণিকার সম্ভাব্য একটি পথ সম্ভাব্য অপর পথের সাথে ব্যতিচার ঘটার ফলে। এখন যেহেতু বাতি জ্বালিয়ে আমরা জেনে যাচ্ছি কণিকাটি ঠিক কোন চিড় দিয়ে পার হয়েছে। তাই এখন আর অপর কোনো পথ দিয়ে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এবং এ কারণেই সম্ভাব্য পথসমূহের হিসাবে এখন অপর পথটা আর আসবে না। ফলে হবে না কোনো ব্যতিচার। এবং আমরা পিছনের পর্দায় কোনো ব্যতিচারী ছাপও দেখবো না। এবং সত্যিই যখন গবেষণাগারে এই পরীক্ষাটা করা হয় তখন বাতি নেভানো অবস্থায় যে ব্যতিচারী ছাপ পাওয়া যায়, বাতি জ্বালালে সেটা হারিয়ে যায়! আবার, আমরা এই পরীক্ষাকে অন্যভাবেও করতে পারি, যেমন আমরা যদি খুবই ক্ষীণ আলো ব্যবহার করি তাহলে সবগুলো কণিকা আর আলোর সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে না। তখন আমরা সবগুলো কণিকার বদলে শুধু মাত্র তাদের একটা উপসেটের কোন-পথ তথ্য পাবো। এখন আমরা যদি নির্ণায়ক পর্দায় পৌঁছানো কণিকাসমূহের ছাপকে দুই ভাগে ভাগ করি যেখানে এক ভাগের জন্য আমরা কোন-পথ তথ্য জানি না এবং অন্য ভাগের জন্য জানি। তাহলে দেখতে পাবো যাদের কোন-পথ তথ্য জানা নেই তারা ঠিকই ব্যতিচারী ছাপ তৈরি করছে। কিন্তু অন্যরা করছে না।

এ ধরনের ঘটনাবলির ফলে 'অতীত' সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা সেটা আমূল পালটে গেছে। নিউটনীয় তত্ত্বে অতীতকে দেখা হয় ঘটে যাওয়া সুনির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ হিসাবে। আপনি যদি দেখেন যে ফুলদানিটা ইটালি থেকে গত বছর কিনেছিলেন সেটা মেঝেতে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে আছে আর আপনার পিচ্চিটা তার পাশে অপরাধীর মত মুখ করে দাঁড়িয়ে তাহলে সেখান থেকেই আপনি এই দুর্ঘটনার পিছনের ঘটনাপ্রবাহ অনুমান করতে পারবেন। অর্থাৎ, ছোটো ছোটো কিছু আঙুল হঠাৎ ছুটে গেল, তারপর ফুলদানিটা ঠাস করে পড়ল মেঝেতে, তারপর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছিটকে গেল চারদিকে... এসব। এমনকি, বর্তমান সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য থাকলে নিউটনের সূত্রগুলোর সাহায্যে সম্পূর্ণ অতীতই হিসাব করে বের করা সম্ভব। এটা আমাদের সহজাত বোধের সাথে মেলে, যে সুখকর হোক বা দুখকর, বিশ্বের একটা সুনির্ধারিত অতীত আছে। কেউ যদি নাও দেখে থাকে তবুও যেটা ঘটেছে সেটা নিশ্চিত ঘটেছেই। পুরো ঘটনাই যেন টানা ভিডিও করা আছে। কিন্তু কোয়ান্টাম বাকিবলের বেলায় সেটা যে কোনো নির্ধারিত পথে পর্দায় গিয়ে পৌঁছেছে, তা বলা যায় না। আমরা কোনো নির্দিষ্ট অবস্থানে সেটাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি ঠিকই, কিন্তু এমন দুইটি পর্যবেক্ষণের মধ্যবর্তী সময়ে সেটা সম্ভাব্য সকল পথদিয়েই যায়। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা আমাদের বলছে, বর্তমানকে যত সূক্ষ্ম ভাবেই আমরা পর্যবেক্ষণ করি না কেন, অদেখা অতীত, ঠিক ভবিষ্যতের মতই অনিশ্চিত, এবং এদের অস্তিত্ব শুধুমাত্র সম্ভাব্যতার একটা বিস্তৃত বর্ণালীতেই।

বাস্তবিকপক্ষে, অতীতের কোনো নির্ধারিত আকার নেই, এই কথাটার অর্থ হচ্ছে কোনো একটা ভৌত ব্যবস্থার উপর বর্তমানে করা কোনো পর্যবেক্ষণ সেই ব্যবস্থার অতীতকে পালটে দিতে পারে। এই ধারণা নাটকীয়ভাবে জোর লাভ করে পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলারের ভেবে বের করা এক ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে। এধরনের পরীক্ষাকে বলে 'বিলম্বিত-বাছাই' পরীক্ষা। সঙ্কল্পনামূলকভাবে বললে, একটা বিলম্বিত-বাছাই পরীক্ষা অনেকটা আমাদের আলোচিত দ্বিচিড় পরীক্ষার মতই, যেখানে কণিকাটি ঠিক কোন পথ দিয়ে গেছে সেটা নির্ণয় করার উপায় আছে। পার্থক্য হচ্ছে, এই নির্ণয় বেশ পরে করা সম্ভব, মানে কণিকাটি পর্দায় আঘাত করার আগে দিয়ে।

আমরা চিড়ের কাছে বাতি জ্বেলে পরীক্ষা করার সময় দেখেছিলাম যে, যখন আমরা ঠিক কোন চিড়টি দিয়ে কণিকা পার হচ্ছে, সেটা নিশ্চিত হই তখন আর কণিকাগুলো ব্যতিচারী ছাপ তৈরি করে না। এই বিলম্বিত-বাছাই পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদিও চিড় পার হয়ে আসার অনেক পরে আমরা নির্ণয় করছি কোন চিড় দিয়ে সেটা পার হলো, তবুও আমরা যখন পর্যবেক্ষণ করি তখন আর ব্যতিচারী ছাপ তৈরি হয় না। কিন্তু পর্যবেক্ষণ না করলেই ব্যতিচারী ছাপ পাওয়া যায়। তার মনে অনেক বিলম্বে আমাদের নেওয়া সিদ্ধান্ত –পর্যবেক্ষণ করবো কি করবো না- কণিকাটির অতীতকে নিয়ন্ত্রন করছে। অর্থাৎ শুধু একটা চিড় দিয়ে তাকে পার হতে হবে, যেখানে ব্যতিচার হয় না; নাকি উভয় চিড় দিয়েই পার হতে হবে, যেখানে ব্যতিচার হয়, সেটা "নির্ধারণ" হচ্ছে চিড় পার হয়ে আসারও অনেক পরে আমরা পর্যবেক্ষণ করবো কী করবো না তার উপরে।

হুইলার এই পরীক্ষার একটা মহাজাগতিক ভার্শনও বিবেচনা করেছেন, যেখানে কণিকাগুলো হচ্ছে বিলিয়ন-বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের শক্তিশালী কোয়েজার থেকে ছুটে আসা ফোটন। এ ধরনের আলোকরশ্মিকে দুইটি পথে ভাগ করা যায় যেগুলো অন্তরবর্তী কোনো গ্যালাক্সির ফলে সৃষ্ট গ্রাভিটেশনাল লেন্সের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফোকাস হয়। যদিও এ পরীক্ষা বর্তমান প্রযুক্তির নাগালের বাইরে, কিন্তু আমরা যদি এই উৎস থেকে আসা যথেষ্ট পরিমাণ ফোটন সংগ্রহ করতে সক্ষম হই, তাহলে তারা অবশ্যই ব্যতিচারী ছাপ তৈরি করবে। এবং এ ক্ষেত্রেও যদি আমরা ফোটন ডিটেকটরে কণিকা পৌঁছানোর ঠিক আগে তার "কোন-পথ" তথ্য নির্ণয় করি তাহলেই আবার সেই ব্যতিচারী ছাপ হারিয়ে যাবে। ফোটনটি মধ্যবর্তী গ্যালাক্সি পার হবার সময় দুটি পথের কোনটি দিয়ে পার হয়েছে সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে বিলিয়ন বছর আগে, পৃথিবী, এমনকি হয়তো সূর্যেরও সৃষ্টির আগে। তবুও বর্তমানে আমাদের কোনো গবেষণাগারে করা পর্যবেক্ষণ সেই অতীতকে প্রভাবিত করবে।

এ অধ্যায়ে আমরা দ্বিচিড় পরীক্ষার সাহায্যে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের একটা চিত্র তুলে ধরেছি। এ বইয়ের বাকি অংশে আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এই ফাইনম্যানীয় সূত্রায়ণই পুরো মহাবিশ্বের উপর প্রয়োগ করবো। আমরা দেখবো যে, একটা কণিকার মতো, এই মহাবিশ্বেরও কোনো একক ইতিহাস নেই, বরং সম্ভাব্য সকল ইতিহাসই রয়েছে, যে ইতিহাসগুলোর প্রতিটির নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা আছে। এবং মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থার উপর আমাদের করা পর্যবেক্ষণ, তার অতীতকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে, এই ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসকে নির্ধারণ করে। ঠিক যেমনটা ঘটে দ্বিচিড় পরীক্ষাতে যেখানে বর্তমানের পর্যবেক্ষণ কণিকাটির অতীকেও প্রভাবিত করে। আর এসব বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা দেখতে পাবো বিগব্যাং-এর মাধ্যমে কীভাবে প্রকৃতির সূত্রগুলোর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই নিয়মগুলোর উদ্ভব হলো, সেটা দেখার আগে আমরা একটু দেখে নেব, এই নিয়মগুলো আসলে কী, এবং এরা কী ধরনের রহস্যের উদ্রেগ করছে।
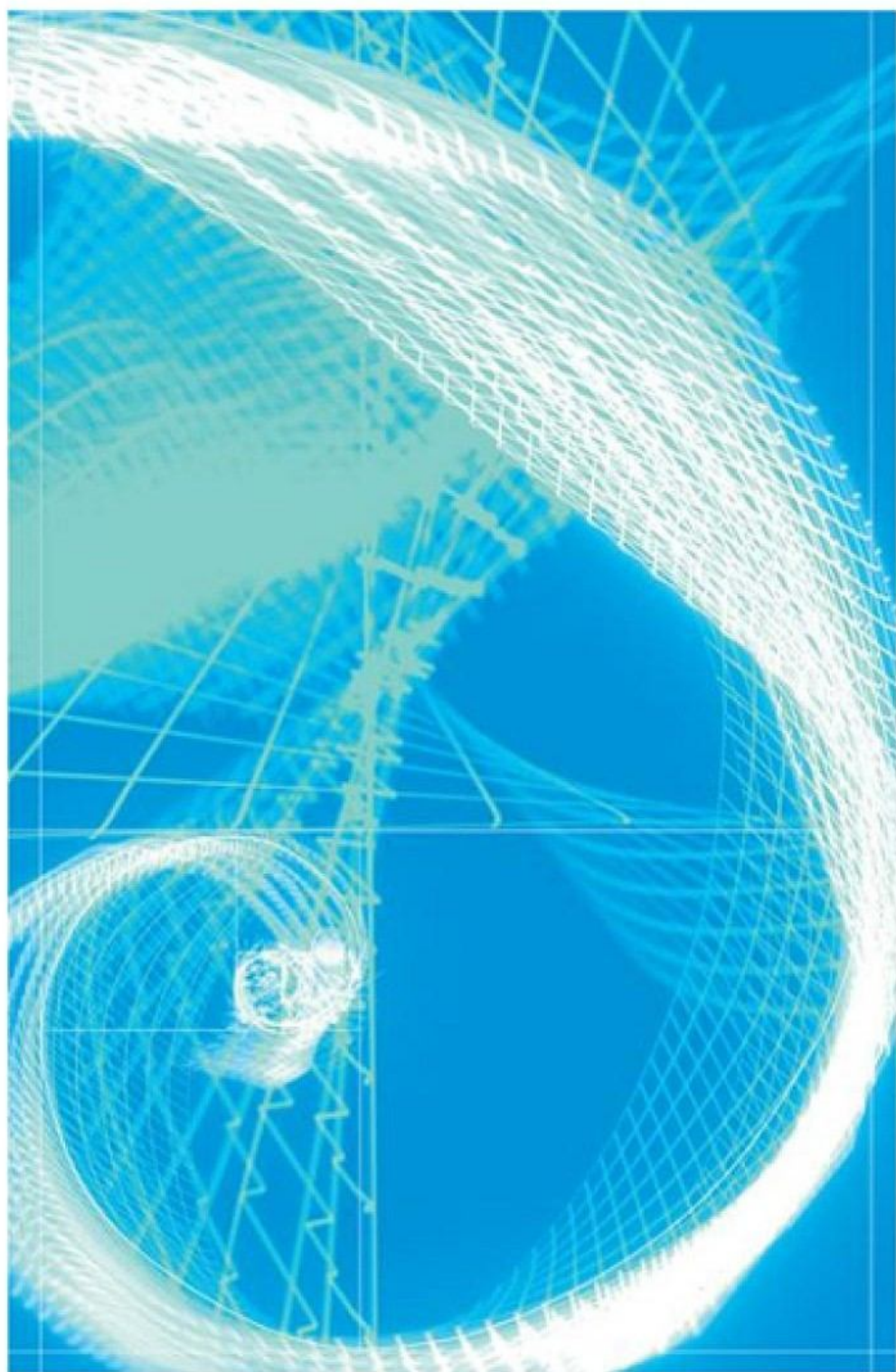
৫

সবকিছুর তত্ত্ব

“মহাবিশ্বের সবচেয়ে দুর্বোধ্য ব্যাপার হচ্ছে, এটাকে বোঝা সম্ভব।“

- আলবার্ট আইনস্টাইন

মহাবিশ্বকে বোঝা যায় কারণ এটা বৈজ্ঞানিক নিয়মে চালিত হয়; অর্থাৎ এর আচরণের গাণিতিক রূপায়ণ সম্ভব। কিন্তু সেই রূপায়ণ বা নিয়মাবলি কী? সর্বপ্রথম যে বলকে গাণিতিক ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছিলো সেটা হল মহাকর্ষ। ১৬৮৭ সালে নিউটন যে মহাকর্ষের সূত্র প্রকাশ করেন সে সূত্র মতে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই অপর প্রতিটি বস্তুকে নিজের ভরের সমানুপাতিক হারে আকর্ষণ করে। সে সময়কার বৌদ্ধিক চিন্তাচেতনায় এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিলো। কারণ, এই সূত্রই প্রথম দেখায় যে এই মহাবিশ্বের অন্তত একটা বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা সম্ভব এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক কৌশলও এ সূত্র থেকে পাওয়া যায়। প্রকৃতির যে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, এ ধারণা আবারও সেইসব পুরাতন বিতর্ককে পুনরুজ্জীবিত করে, যে কারণে এর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে গ্যালিলিওকে বিপথগামিতার অভিযোগে দায়ী করা হয়েছিলো। যেমন বাইবেলে এমন ঘটনা দেখা যায়, যেখানে জশুয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা করছে যেন চন্দ্র-সূর্য স্থির হয়ে যায়, যাতে সেই বাড়তি দিনের আলোয় সে কানানের আমোরাইটসদের সাথে লড়াই শেষ করতে পারে। বাইবেলের জশুয়াখণ্ড অনুযায়ী সেই প্রার্থনার ফলে সূর্য পুরো একটা দিন স্থির হয়ে ছিলো। আমরা এখন জানি এর অর্থ হলো পৃথিবীর ঘূর্ণন থেমে গিয়েছিলো। যদি পৃথিবী থেমে গিয়ে থাকে তাহলে নিউটনের সূত্র অনুযায়ী যা কিছু পৃথিবীপৃষ্ঠের সাথে যুক্ত নয় তার সবই নিজের আদিবেগেই (বিষুবীয় অঞ্চলে ঘন্টায় ১,১০০ মাইল) ছুটতে থাকার কথা, এর ফলে যে তুলকালাম ঘটবে তার সাথে তুলোনা করলে পৃথিবী থামানো অনেক বেশি ব্যয়বহুল হয়ে যায়। অবশ্য এসব নিয়ে নিউটন নিজে মোটেই বিচলিত হননি, কারণ যেমনটা আমরা আগেই জেনেছি, তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর চাইলে মহাবিশ্বের সকল কর্মকান্ডই পরিবর্তন করতে পারেন, এবং দরকার হলে তা করেনও।

এর পরে মহাবিশ্বের যে বিষয়গুলোর নিয়ম বা গাণিতিক সূত্র নির্ণয় করা সম্ভব হয় সেগুলো হলো তড়িৎ ও চৌম্বক বল। এদের আচরণ মহাকর্ষের মতই, তবে পার্থক্য হচ্ছে দুইটি একই রকম আধান বা একইরকম চুম্বক একে অপরকে বিকর্ষণ করে এবং ভিন্নরকমরা আকর্ষণ করে। তড়িৎ এবং চৌম্বক বল মহাকর্ষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হলেও আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেটা উপলব্ধি করি না কারণ সাধারণত সকল বস্তুতেই সমান সংখ্যক ধনাত্বক ও ঋণাত্বক আধান থাকে। এর অর্থ হচ্ছে মহাকর্ষ বলের মত যোগ হয়ে যাবার বদলে দুইটি বৃহদায়তন বস্তুর মধ্যকার পারস্পরিক তড়িৎ ও চৌম্বক বল একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।

তড়িৎ ও চৌম্বকক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণাসমূহের উদ্ভব হয়েছিলো মধ্য-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির মধ্যে। এসময় পদার্থবিজ্ঞানীরা অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এসব বলের স্বরূপ উদঘাটন করেন। এসময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিলো, তড়িৎ ও চৌম্বক বল পরষ্পর সম্পর্কিত: একটি চলমান তড়িৎ আধান একটি চুম্বকের উপর বল প্রয়োগ করে এবং একটি চলমান চুম্বক একটি তড়িত আধানের উপর বল প্রয়োগ করে। প্রথম যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক অনুধাবন করেন তিনি হলেন ডেনিশ বিজ্ঞানী হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওয়েরস্টেড। ১৮২০ সালের দিকে

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতার প্রস্তুতিকালে তিনি লক্ষ্য করেন যে তাঁর ব্যবহৃত ব্যাটারিটা থেকে প্রবাহিত বিদ্যুত পাশেই একটি কম্পাসের চুম্বককে বিচ্যুত করছে। শিঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে চলমান বৈদ্যুতিক আধান চৌম্বক বল সৃষ্টি করে এবং এ থেকে তিনি 'তড়িৎচৌম্বকক্রিয়া' শব্দটা চালু করেন। এর ক'বছর পরে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে যেটা অনুধাবন করেন সেটাকে এখনকার ভাষায় বললে দাঁড়ায়- যদি বিদ্যুত প্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, তাহলে চৌম্বক ক্ষেত্রের ফলেও বিদ্যুত প্রবাহ সৃষ্টি হওয়া উচিত। ১৮৩১ সালে তিনি এই ক্রিয়া প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। এর চৌদ্দ বছর পরে তিনি তড়িৎচৌম্বকক্রিয়ার সাথে আলোর সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। যেখানে তিনি দেখান যে সমবর্তিত আলোর উপর তীব্র চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব রয়েছে।

ফ্যারাডের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলো খুবই সীমিত। তিনি জন্মেছিলেন লন্ডনের অদূরেই এক গরীব কামার পরিবারে। তের বছর বয়সে তিনি স্কুল ছেড়ে পাশের এক বইয়ের দোকানে বাধাইকারক ও ছুটা কাজের ছেলে হিসাবে চাকরি শুরু করেন। যেসব বইয়ের দেখভাল করা তার দায়িত্ব ছিলো সেগুলো থেকে এবং অবসর সময়ে হাতের কাছের জিনিসপত্র দিয়ে টুক-টাক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি বিজ্ঞান শেখেন। পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত রসায়নবিদ স্যার হাম্ফ্রে ডেভির গবেষণাগারে সহকারীর চাকরি পান। সেখানেই তিনি জীবনের পয়তাল্লিশটা বছর কাটান, এবং ডেভির মৃত্যুর পর সেই গবেষণাগারের উত্তরসূরি হন। ফ্যারাডে গণিতে কাঁচা ছিলেন, তাই তার আবিষ্কার করা তড়িৎচৌম্বক ক্রিয়ার তাত্ত্বিক রুপায়ণ দেওয়া তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য শেষমেষ তিনি ঠিকই সেটা করতে সমর্থ হন।

ফ্যারাডের অন্যতম বৌদ্ধিক অবদান হচ্ছে বলক্ষেত্রের ধারণা। আজকাল এলিয়েন আর মহাকাশজানওয়ালা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ও সিনেমার কল্যাণে মোটামুটি সবাই বলক্ষেত্র বা ফোর্সফিল্ডের ধারণার সাথে এতটাই বেশি পরিচিত যেন অনেক সময় মনে হয় এ নির্মাতাদের উচিত ফ্যারাডেকে রয়্যালটি দেওয়া। ফ্যারাডে আর নিউটনের মধ্যকার এই কয়েকশ বছর পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় রহস্য ছিলো কীভাবে শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে এসব বল দূরবর্তী বস্তুসমূহের উপর ক্রিয়া করে। ফ্যারাডেও এই ধারণা পছন্দ করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন কোনো বস্তুকে নড়াচড়া করতে হলে অবশ্যই তার সংস্পর্শে অপর কোনোকিছুকে আসতে হবে। ফলে তিনি কল্পনা করেন যে তড়িৎ আধান আর চুম্বকের মধ্যকার শূন্য স্থান একধরনের অদৃশ্য সূক্ষ্ম নল দ্বারা পূর্ণ, যেগুলোর টানাটানিতেই এরা একে অপরকে প্রভাবিত করে। ফ্যারাডে এই নলসমষ্টিকে নাম দিয়েছিলেন বলক্ষেত্র। এই বলক্ষেত্রকে দেখার একটা ভালো উপায় হল যদি একটি কাঁচের উপর কিছু লোহাড় গুড়া রেখে কাচটিকে একটি দন্ডচুম্বকের উপর রাখা হয়। এরপর ঘর্ষণকে কাটিয়ে ওঠার জন্য কাঁচটিতে দুয়েকটা টোকা দিলেই দেখা যাবে কোনো এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে লোহার গুড়াগুলো চুম্বকটির একটি মেরু থেকে অপর মেরুতে বক্রাকার রেখায় সজ্জিত হয়ে গেছে। এই ছাপচিত্রটাই হচ্ছে শূন্যে বিরাজমান অদৃশ্য চৌম্বকক্ষেত্রের একটি মানচিত্র। আজকাল আমরা বিশ্বাস করি সকল বলই এ ধরনের বলক্ষেত্রের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। তাই এটা বিজ্ঞানে, এমনকি কল্পবিজ্ঞানেও, একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।
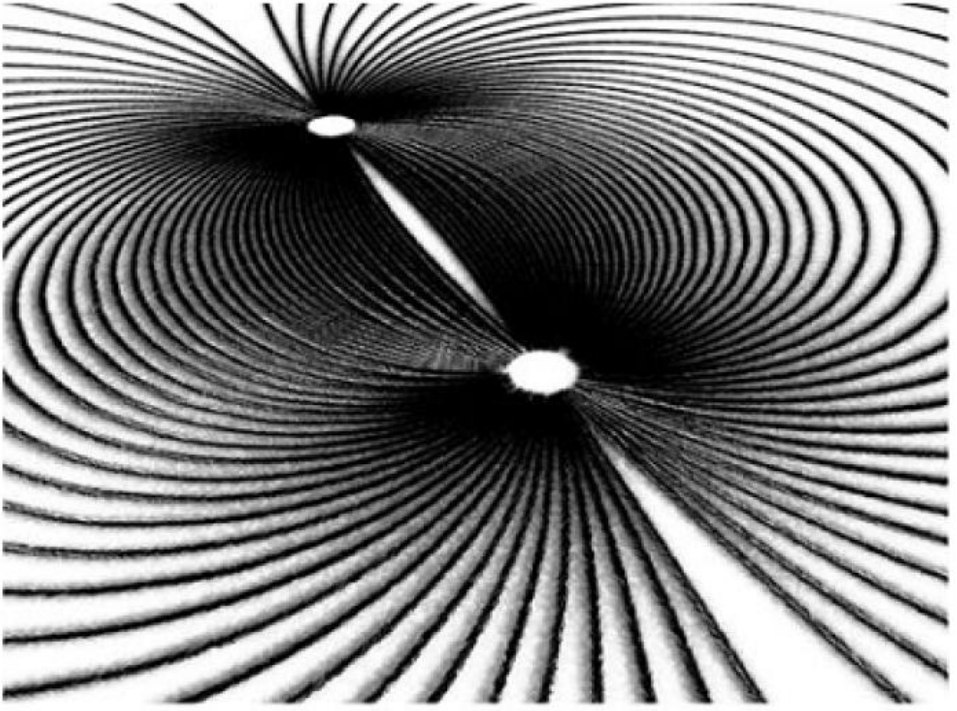
Force Fields The force field of a bar magnet, as illustrated by the reaction of iron filings.

এরপর কয়েক দশক তড়িৎচৌম্বক সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান স্থির ছিলো। এ সময় এ বিষয়ে অল্পকিছু প্রয়োগিক সূত্র ছাড়া তেমন আর কিছু জানা যায়নি। সব মিলিয়ে তখন যা যা জানা গিয়েছিলো তা হলো: তড়িৎক্রিয়া ও চৌম্বক ক্রিয়া কোনো রহস্যময় কারণে পরস্পর নিকট সম্পর্কযুক্ত; এবং আলোর সাথেও তাদের কোনো ধরনের সম্পর্ক রয়েছে; আর বলক্ষেত্রের অল্পকিছু কিছু অপূর্ণ ধারণা। তখন তড়িৎ চৌম্বকের অন্তত এগারোটা তত্ত্ব প্রচলিত ছিলো যাদের প্রতিটিই ছিলো ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা। এর পর ১৮৬০ সালে স্কটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ফ্যারাডের চিন্তাকে একটি গাণতিকিক কাঠামোর উপর দাঁড়া করান যার সাহায্যে তড়িৎক্রিয়া, চৌম্বকত্ব ও আলোর মধ্যকার গভীর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। এর ফলে আমরা কিছু গাণিতিক সমীকরণ পাই যেগুলো তড়িৎ ও চৌম্বক বলকে তড়িৎচৌম্বকক্ষেত্রের কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ম্যাক্সয়েল তড়িৎক্রিয়া ও চৌম্বকত্বকে একটি একক বলে একীভূত করতে সক্ষম হন। তিনি এও দেখান যে তড়িৎচৌম্বকক্ষেত্র মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ আকারে প্রবাহিত হতে পারে। এই তরঙ্গের গতি তার সমীকরণগুলোতে ব্যবহৃত একটি ধ্রুবক দ্বরা নিধারিত হয়। এ ধ্রুবক তিনি পেয়েছিলেন কয়েক বছর ধরে পাওয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল থেকে হিসাব করে। তার জন্য এটা খুবই অবাক ব্যাপার ছিলো যখন তিনি দেখেন এই ধ্রুবকটি আলোর গতির সমান। সেসময় আলোর গতি ১ শতাংশ সূক্ষ্মতায় জানা ছিলো। এভাবেই তিনি আবিষ্কার করেন যে আলো নিজেই একটি তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ।

তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের বর্ণনাকারী এইসব সমীকরণকে আজকাল ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ বলা হয়। খুব কম মানুষই এগুলোর কথা জানে কিন্তু সম্ভবত এগুলোই আমাদের জানা বানিজ্যিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের অনেক কিছু থেকে শুরু করে কম্পিউটারের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রন করা ছাড়াও, এটা দৃশ্যমান আলো সহ অন্য অনেক রকম তরঙ্গকেই বর্ণনা করে। যেমন, মাইক্রোওয়েভ, বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত আলো এবং এক্স-রে। দৃশ্যমান আলো থেকে অন্যসব তরঙ্গের পর্থক্য শুধু মাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। যেখানে বেতার তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েক মিটারের মত, সেখানে দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক মিটারের এক কোটি ভাগের এক ভাগের কাছাকাছি। সূর্য প্রায় সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তরঙ্গই বিকিরণ করে, কিন্তু দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছে তার বিকিরণের হার সবচেয়ে তীব্র। সম্ভবত আমাদের চোখ দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য উপোযগী হয়ে বিবর্তিত হয়েছে কারণ এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণই সবচেয়ে সহজপ্রাপ্য ছিলো। আমরা যদি ভিন্ন কোনো গ্রহের কোনো সত্বার সম্মুখিন হই তাহলে দেখবো তাদের চোখ তাদের সূর্যের যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি সেটা দেখতেই সবচেয়ে পারঙ্গম। অবশ্য তাদের বায়ুমণ্ডলের গ্যাসসমূহ ও ভাসমান ধুলোবালি আলোকে কীভাবে বাধা দিচ্ছে তার উপরও এই বিবর্তন সেটা নির্ভর করবে। তাই কোনো ভিনগ্রহবাসী যদি এক্স-রে সীমায় দেখতে সক্ষম হিসাবে বিবর্তিত হয়, তাহলে বিমানবন্দরের নিরাপত্তাকর্মী হিসাবে তার চাকরি পাকা।
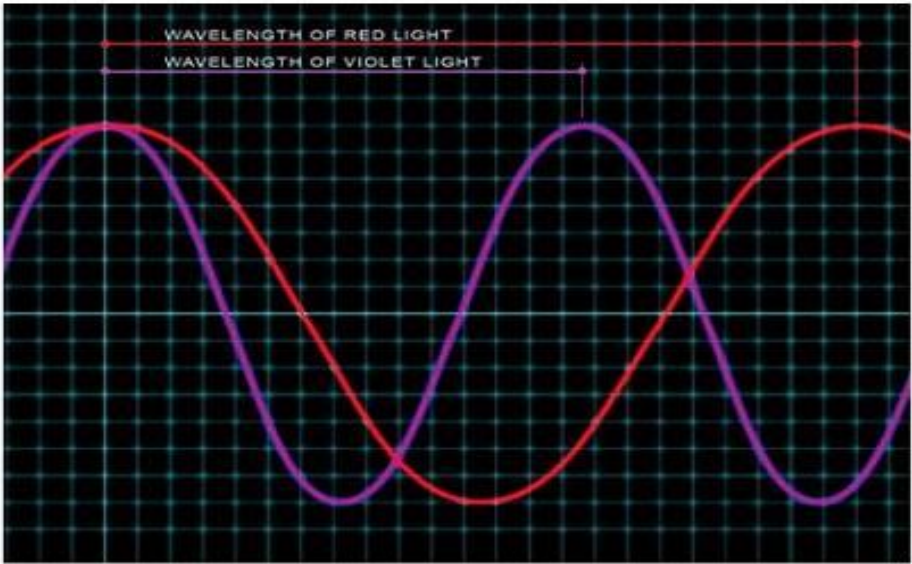
Wavelength Microwaves, radio waves, infrared light, X-rays—and different colors of light—differ only in their wavelengths.

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলো অনুযায়ী তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০০,০০০ কিলোমিটার বা প্রায় ৬৭০ মিলিয়ন মাইল অতিক্রম করে। কিন্তু আমরা জানি কোন নির্দেশ কাঠামোর সাপেক্ষে গতি পরিমাপ করা হচ্ছে সেটা না বলে শুধু গতির মান বললে তার কোনো অর্থই হয় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই নির্দেশ কাঠামো নিয়ে সাধারণত তেমন মাথা ঘামাতে হয় না, কারণ রাস্তার পাশে যখন গতিসীমা ঘন্টায় ৬০

মাইল বলা থাকে তখন আমরা বুঝে নিই যে এই গতি রাস্তার সাপেক্ষে বলা হয়েছে, সৌরজগতের কেন্দ্রের কোনো ব্লাকহোলের সাপেক্ষে নয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনেও এমন ঘটনার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব যেখানে নির্দেশ কাঠামোকে হিসাবে ধরতে হবে। যেমন আপনি যদি একটা জেটপ্লেনের সিটসারির মাঝ দিয়ে এক কাপ চা হাতে এগিয়ে যেতে থাকেন তখন আপনি হয়তো দেখছেন আপনার গতি ঘন্টায় ২ মাইল। কিন্তু ভূমিতে দাঁড়িয়ে কেউ হয়তো বলবে আপনার গতি ঘন্টায় ৫৭২ মাইল। এদের দুজনের মধ্যে কে বেশি সত্য সে ধরনের চিন্তা যদি মাথায় আসে তাহলে খেয়াল করুন যেহেতু পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, সূর্যপৃষ্ঠ থেকে যে আপনাকে দেখবে সে আপনাদের কারো বলা গতিই মেনে নেবে না। তার কাছে আপনার গতি সেকেন্ডে ১৮ মাইলের কাছাকাছি। অবশ্য গরমে তার অবস্থা কাহিল হয়ে যাওয়ার কথা। তো, এই যে একই বস্তুর গতি নিয়ে এত ভিন্ন মত, সে আলোকে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত আলোর গতি দেখে প্রশ্ন আসতেই পারে এই গতি মাপা হচ্ছে কিসের সাপেক্ষে। ম্যাক্সওয়েল সমীকরণে যে গতির মান নির্ণয় করা হচ্ছে সেটা যে পৃথিবীর সাপেক্ষে মাপা হচ্ছে তেমন ভাবার কোনো কারণ নেই। কারণ তার সমীকরণ মহাবিশ্বের যেকোনো অংশেই প্রযোজ্য। কিছুদিন যাবত এ প্রশ্নের যে উত্তরটা ভাবা হতো সেটা হচ্ছে আলোর এই গতি মাপা হচ্ছে ইথারের সাপেক্ষে। ইথারের পুরো নাম লুমিনিফেরাস ইথার। আরিস্টোটল সর্বপ্রথম এই পরিভাষা ব্যবহার করেন। তার মতে ভূ-গোলকের বাইরে পুরো মহাবিশ্ব এই ইথারে পরিপূর্ণ। ভাবা হতো এই তাত্ত্বিক মাধ্যম দিয়েই আলো সঞ্চালিত হয় ঠিক যেভাবে শব্দ সঞ্চালিত হয় বাতাসের মধ্য দিয়ে। ইথারের যদি অস্তিত্ব থাকতো তাহলে স্থিতির একটা পরম আদর্শ থাকতো (মানে ইথারের সাপেক্ষে স্থির) এবং এর ফলে আমরা পরম গতি হিসাব করতে পারতাম। তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের গতির ব্যাখ্যায় ইথারের অস্থিত্ব প্রস্তাব করার ফলে অনেক বিজ্ঞানী ইথারের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে উদ্যত হলেন, কেউ-কেউ উদ্যত হলেন ইথারের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলকভাবে নিশ্চিত করতে। এই গবেষকদের একজন ছিলেন ম্যাক্সওয়েল নিজে।

আপনি যদি বাতাসের মধ্য দিয়ে কোনো একটি শব্দ তরঙ্গের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকেন তাহলে তরঙ্গটি আপনার দিকে আরো দ্রুত ছুটে আসছে মনে হবে। এবং আপনি যদি তরঙ্গ থেকে ছুটে সরে যেতে থাকেন তাহলে মনে হবে শব্দ বুঝি ধীরে আসছে আপনার দিকে। একই ভাবে আপনার দেখা আলোর গতিও কম-বেশি হবে ইথারের সাপেক্ষে আপনার নিজের গতি অনুযায়ী। আলোর তরঙ্গ যদি শব্দ তরঙ্গের মত হতো তাহলে ঠিক যেভাবে সুপারসনিক গতিতে চলমান জেটবিমানের যাত্রী বিমানের পিছন থেকে আগত কোনো শব্দ শুনতে পায় না তেমনি যথেষ্ট গতি অর্জন করতে পারলে আলোকেও দৌড়ে হারিয়ে দেওয়া সম্ভব হতো। এসব চিন্তা করে ম্যাক্সওয়েল একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করেন। এমন কোনো ইথার যদি থেকেই থাকে তাহলে পৃথিবী নিশ্চই সেই ইথারের মধ্য দিয়েই ছুটে চলেছে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরার সময়। এবং কক্ষপথে পৃথিবীর গতি দেখলে বোঝা যায় যে জানুয়ারীতে পৃথিবী যে দিকে ছুটছে এপ্রিল বা জুলাইতে ছুটছে তার বিপরীত দিকে। তাই এই দুই সময়ে আলোর গতি পর্যবেক্ষণ করলে পার্থক্য দেখা যাবে- নিচের চিত্রটি দ্রষ্টব্য।
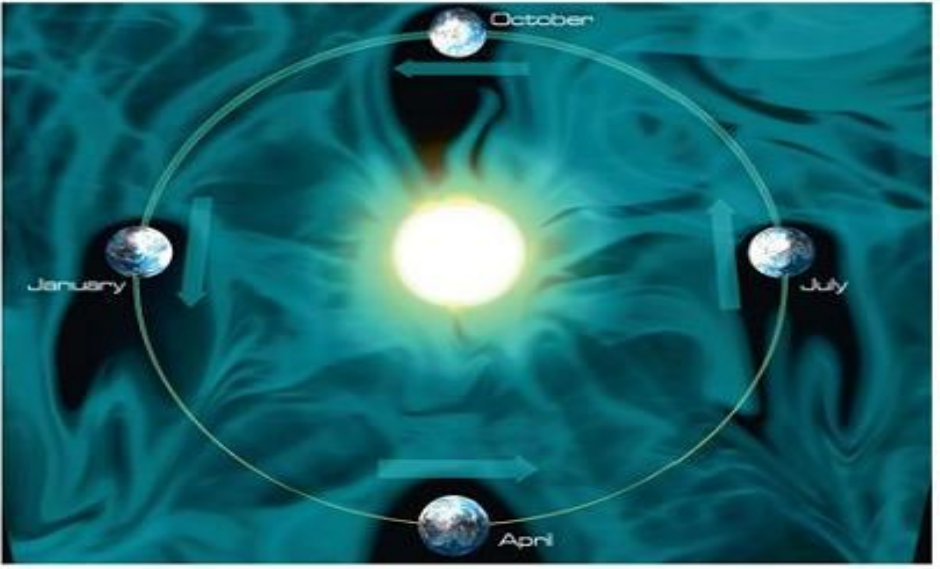
Moving Through the Ether If we were moving through the ether, we ought to be able to detect that motion by observing seasonal differences in the speed of light.

সে সময়কার 'প্রসিডিংস অফ রয়াল সোসাইটির' সম্পাদক ম্যাক্সওয়েলকে তার এই পরিকল্পনা সেই জার্নালে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন কারণ তার মনে হয়েছিলো এ পরীক্ষা কাজ করবে না। কিন্তু ১৮৭৯ সালের দিকে, পাকস্থলীর ক্যানসারে তার মৃত্যুর কিছু দিন আগে, ম্যাক্সওয়েল তার এক বন্ধুকে এ বিষয়ে একটি চিঠি লেখেন। তার মৃত্যুর পরে সেই চিঠি নেচার জার্নালে ছাপা হয়। সেখান থেকে আলবার্ট মাইকেলসন নামক এক আমেরিকান পদার্থবিদ সেটি পড়েন। ম্যাক্সওয়েলের এই অনুমান থেকে উৎসাহিত হয়ে ১৮৮৭ সালে মাইকেলসন এবং এডওয়ার্ড মর্লি একটি অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষার নকশা করেন যেটার সাহায্যে ইথারের সাপেক্ষে পৃথিবীর গতি নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পরীক্ষাটার মূল পরিকল্পনা ছিলো পরস্পর সমকোণে অবস্থিত দুইটি আলোকরশ্মির গতি নির্ণয় করা হবে। আলোর গতি যদি ইথারের সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যা হয় তাহলে, পৃথিবী যেহেতু ইথারের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট দিকে ছুটছে সেহেতু, এই আলোকরশ্মির দিকের উপর নির্ভর করে আলোর গতির একেক দিকে একেক রকম মান পাওয়া যাবে। কিন্তু মাইকেলসন এবং মর্লি তেমন কোনো বিচ্যুতি পেলেন না।

মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষার ফলাফল তড়িৎচৌম্বকিয় তরঙ্গের ইথার রূপায়ণের সরাসরি বিরুদ্ধে যায়, এবং ইথার মডেল পরিত্যাগ করার জন্য এই পরীক্ষাই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু মাইকেলসন এই পরীক্ষাটা করেছিলেন ইথারের মধ্যে পৃথিবীর গতি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা তার উদ্দেশ্য ছিলো না ফলে সে ধরনের উপসংহারে তিনি পৌছাতে পারেন নি। অন্য কেউও সেই উপসংহার টানেন নি। এমনকি ১৮৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম থমাস (লর্ড কেলভিন) তো বলেইছিলেন যে, "ইথারই হচ্ছে একমাত্র উপাদান, গতিবিদ্যায় যার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। যে জিনিসটার অস্তিত্ব এবং বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই সেটা হচ্ছে লুমিনিফেরাস ইথার।"

মাইকেলসন-মর্লির এই পরীক্ষার ফলাফলের পরেও কীভাবে ইথারে বিশ্বাস করা সম্ভব? কিন্তু যথারীতি ইথার তত্ত্বকে বহাল তবিয়তে রাখার জন্য অনেকেই বিভিন্ন রকম জোড়াতালির প্রস্তাব করতে লাগলো। কেউ প্রস্তাব করে পৃথিবী নিজের সাথে সাথে ইথারকেও টেনে নিয়ে চলে তাই আমরা আসলে ইথারের মধ্য দিয়ে ছুটছি না। ডাচ পদার্থবিদ হেন্ড্রিক আন্তুন লরেন্টজ এবং আইরিশ পদার্থবিদ জর্জ ফ্রান্সিস ফ্রিটজেরাল্ড প্রস্তাব করেন যে কোনো অজানা প্রক্রিয়ায় ইথারের মধ্য দিয়ে ছুটে চলা কোনো নির্দেশ কাঠামোতে দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয় এবং সময় ধীরে বহে ফলে সেই নির্দেশ কাঠামোতেও আলোর একই গতি পর্যবেক্ষিত হয়। প্রায় বিশ বছর এ ধরনের প্রচেষ্টা চলতেই থাকে যতদিন না বার্নের এক পেটেন্ট অফিসের এক অখ্যাত ক্লার্ক, যুবক আইনস্টাইন তার যুগান্তকারী গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেন।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের বয়স ছিলো ছাব্বিশ যখন তিনি "Zur Elektrodynamik bewegter Körper" ("গতিশীল বস্তুসমূহের তড়িৎগতিবিদ্যা") নামক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেন। এতে তিনি একটি সাধারণ ব্যাপার ধরে নেন যে, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ, এবং বিশেষ করে আলোর গতি, সকল সমগতিতে চলমান জড়তার কাঠামোর সাপেক্ষে একই। কেন এমনটা হবে, সেটা বোঝার জন্য একটা জেটবিমানের উপরে একই অবস্থানে কিন্তু ভিন্ন সময়ে ঘটিত দুইটি ঘটনা কল্পনা করুন। জেট বিমান অবস্থিত কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে ঘটনা দুটি ঘটছে একই স্থানে। কিন্তু ভূমি থেকে কোনো পর্যবেক্ষক দেখবে ঘটনা দুটি ঘটেছে দুটি ভিন্ন স্থানে এবং দুটি ঘটনার স্থানের দূরত্ব ঘটনা দুটি ঘটার মধ্যবর্তী সময়ে জেট বিমানটি যতদূর সরে যায় তার সমান। এ থেকে দেখা যায় দুইজন পর্যবেক্ষক যারা পরষ্পরের সাপেক্ষে সরছে তারা এই দুটি ঘটনার মধ্যকার দূরত্বের ব্যাপারে একমত হবে না।

এখন চিন্তা করুন দুইজন পর্যবেক্ষকই বিমানটির লেজের অংশ থেকে মাথার অংশে ছুটে যাওয়া একটি আলোকরশ্মির গতি মাপছেন। উপরের উদাহরণের মত এবারও তারা আলো কর্তৃক অতিক্রম করা মোট দূরত্ব নিয়ে দ্বিমত হবেন। আবার, গতি যেহেতু অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং অতিক্রমের সময় এর অনুপাত, সেহেতু পর্যবেক্ষকদ্বয় যদি আলোর গতি সম্পর্কে একমত হন তাহলে নিশ্চই আলো বিমানের লেজ থেকে প্রক্ষেপ করে মাথার কাছে গ্রহণ করার মধ্যকার সময় ব্যবধান তাদের দুজনের পরিমাপে ভিন্ন ভিন্ন হবে।

Airborne Jet If you bounce a ball on a jet, an observer aboard the plane may determine that it hits the same spot each bounce, while an observer on the ground will measure a large difference in the bounce points.

এই ঘটনাটা অদ্ভুত মনে হয় এই কারণে যে, যদিও দুইজন পর্যবেক্ষক ভিন্ন ভিন্ন সময় ব্যবধান পরিমাপ করছে কিন্তু তারা একই ভৌত ঘটনাকেই পর্যবেক্ষণ করেছে। আইনস্টাইন এই ঘটনার কোনো কৃত্রিম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। তিনি এই যৌক্তিক উপসংহারে –যেটা একটু আজব শোনাতে পারে- পৌছান যে দূরত্বের মত সময়ের পরিমাপও পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভরশীল। এই ধারণাই আইনস্টাইনের ১৯০৫ সালের পেপারটির চাবিকাঠি যেটা বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ব নামে পরিচিত।

সময়মাপক যন্ত্রের উপর এই বিশ্লেষণ কীভাবে খাটে সেটা আমরা বুঝতে পারবো যদি একটি ঘড়িকে পর্যবেক্ষণকারী দুইজন পর্যবেক্ষক কল্পনা করি। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ব মতে যে পর্যবেক্ষক ঘড়ির সাপেক্ষে স্থির আছে তার সাপেক্ষে ঘড়ি সবচেয়ে দ্রুত চলবে। এবং যে পর্যবেক্ষক ঘড়ির সাপেক্ষে স্থির নেই তার সাপেক্ষে ঘড়ি চলবে ধীরে। এখন আমরা যদি এমন একটা ঘড়ি কল্পনা করি যেখানে বিমানের লেজ থেকে ছুড়ে দেওয়া একটি আলোকস্পন্দন বিমানের নাকে পৌছালে ঘড়ির 'একটিক' হয়। তাহলে ভূমিতে অবস্থিত পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে বিমানের ঘড়িটা ধীরে চলছে। কারণ তার নির্দেশকাঠামো থেকে সে দেখছে আলোকরশ্মি লেজ থেকে মাথায় পৌছাতে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করছে। কিন্তু এই ঘটনা ঘড়ির গঠনের উপর নির্ভরশীল নয়; সব ধরনের ঘড়ির জন্যই এটা প্রযোজ্য, এমনকি আমাদের দেহঘড়ির জন্যও।
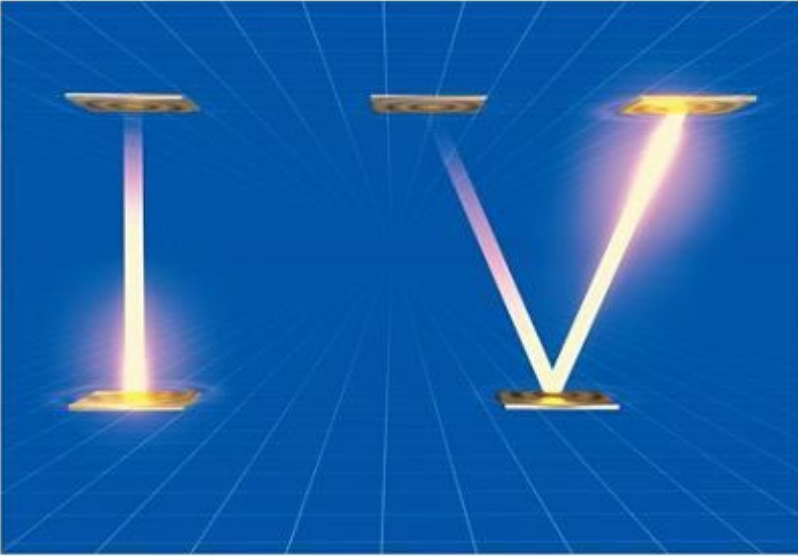
Time Dilation Moving clocks seem to run slow. Because this also applies to biological clocks, moving people will seem to age more slowly, but don't get your hopes up—at everyday speeds, no normal clock could measure the difference.

আইনস্টাইন দেখালেন যে পরমস্থিতির মত পরমসময়, যেমনটা নিউটন ভাবতেন, বলে কিছু নেই। অন্যভাবে বললে, প্রতিটি ঘটনার এমন কোনো ঘটনকাল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, যার সাথে সকল পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণ মিলবে। অর্থাৎ, প্রতি পর্যবেক্ষকেরই নিজস্ব সময়ের পরিমাপ থাকবে, এবং পরস্পরের সাপেক্ষে গতিশীল দুইজন পর্যবেক্ষকের মাপা সময় মিলবে

না। আইনস্টাইনের ধারণা আমাদের দৈনন্দিন অন্তর্জ্ঞানের বিরুদ্ধে যায়, কারণ দৈনন্দিন ঘটনাবলীর যে গতি তাতে বিশেষ আপেক্ষিকতার প্রভাবসমূহ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এদেরকে বারংবার নিশ্চিত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরুপ তিনটা ঘড়ি কল্পনা করুন যার একটা পৃথিবীর কেন্দ্রে, একটা ভূ-তলে এবং আরেকটা একটি উড়ন্ত বিমানে, বিমানটি হয় পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকে বা, বিপরীত দিকে ছুটছে। এখন বিমানটা যদি পূর্বদিকে -মানে পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকে- ছুটতে থাকে তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত ঘড়িটার সাপেক্ষে বিমানে অবস্থিত ঘড়িটা ভূতলে অবস্থিত ঘড়িটার চেয়ে দ্রুত ছুটছে। তাই বিমানের ঘড়িটা ধীরে চলা উচিত। আবার বিমানটা যদি পশ্চিম দিকে ছোটে তখন কেন্দ্রের ঘড়িটার সাপেক্ষে বিমানের গতি ভূতলের ঘড়িটার গতির চেয়ে ধীর। তাই তখন নিশ্চই বিমানের ঘড়িটা ভূমির ঘড়িটার চেয়ে দ্রত চলবে? এবং ঠিক এই ঘটনাই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলো ১৯৭১ সালে যখন একটি অতিসূক্ষ্ম আনবিক ঘড়িকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়ে আনা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে, আপনি আপনার আয়ু দীর্ঘায়িত করতে চাইলে পূর্বগামী প্লেনে চড়েই জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। অবশ্য বিমানে টিভি দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এর প্রভাব খুবই কম,এক চক্কর দিয়ে এলে সেকেন্ডের ১৮০ বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময় দীর্ঘ হয় (যেটা কিনা আবার মধ্যাকর্ষণের ভিন্নতার কারণে আরো কমে যায়, অবশ্য সে আলোচনায় আমরা এখন যাবো না)।

আইনস্টাইনের এই কাজ থেকে পদার্থবিদরা বুঝতে পারেন যে আলোর গতিকে সকল নির্দেশ কাঠামোতে একই ধরে নিলে, ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ ও চৌম্বকত্বের তত্ত্ব মতে সময়কে আর স্থানের তিনটি মাত্রার থেকে আলাদা কিছু আর ভাবার উপায় থাকে না। বরং স্থান এবং কাল পরষ্পর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়। ব্যাপারটা ডাইনে/বাইয়ে, সামনে/পিছে, উপরে/নিচের সাথে ভবিষ্যতে/অতীতের মত আরেকটা 'দিক' যুক্ত করার মত। সময় ও স্থানের এই মেলাবন্ধনকে পদার্থবিদরা বলেন 'স্থান-কাল'। এবং যেহেতু 'স্থান-কালে' চতুর্থ আরেকটা দিক রয়েছে সেহেতু বলা হয় স্থানকাল 'চতুর্মাত্রিক'। স্থান-কাল-এ সময়কে আর স্থানের তিনটি মাত্রার চেয়ে আলাদা কিছু ভাবা হয় না। কোনটা ডানে-বামে, উপরে-নিচে বা সামনে-পিছে সেটা যেমন পর্যবেক্ষক কোন দিকে ফিরে রয়েছে তার উপর নির্ভর করে তেমনি, সময়ও নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের গতির উপরে। ভিন্ন গতিতে চলমান দুইজন পর্যবেক্ষক তাদের স্থান-কালের মধ্যে তাদের 'সময়ের দিক' ও ভিন্ন দেখবে। তাই আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিকতার বিশেষতত্ত্ব এমন একটি নতুন রূপায়ণ যেটি পরমসময় এবং পরমস্থিতির (নির্দিষ্ট ইথারের সাপেক্ষে স্থিতি) ধারণা থেকে মুক্ত।

আইনস্টাইন শিঘ্রই বুঝলেন যে মহাকর্ষকে আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সাথে মেলানোর জন্য আরো একটা পরিবর্তন প্রয়োজন। নিউটনের তত্ত্ব মতে কোনো সময়ে দুইটি বস্তুর মধ্যকার মহাকর্ষীয় বল 'ঐ মূহুর্তে' তাদের মধ্যকার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আপেক্ষিকতার তত্ত্ব যেহেতু পরম সময়ের ধারণাকে বাতিল করেছে সেহেতু ঠিক কোন 'মুহূর্তের' দূরত্বকে হিসাবে নেওয়া হবে সেটা নির্ধারণ করার কোনো উপায় নেই। তাই নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সাথে মিলছিলো না, অতএব এটাকে (নিউটনের তত্ত্ব) পালটানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। উপর থেকে এই বিরোধ দেখে স্রেফ কোনো 'কারিগরি সমস্যা' মনে হতে পারে। অর্থাৎ মনে হতে পারে, মূল তত্ত্বে বেশি পরিবর্তন না করেও হয়তো এই বিরোধ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু পরে দেখা গেছে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

পরবর্তী ১১ বছর ধরে আইনস্টাইন মহাকর্ষের আরেকটি তত্ত্ব গঠন করেন, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। সাধারণ আপেক্ষিকতার মহাকর্ষের ধারণা নিউটনীয় ধারণার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বরং এটা একটি বৈপ্লবিক প্রস্তাবের উপর গঠিত যে প্রস্তাব মতে স্থান-কাল 'সমতল' নয় বরং এতে ধারণ করা শক্তি ও ভরের কারণে বেঁকে-চুরে থাকে।

ব্যাপারটা বোঝার জন্য পৃথিবীপৃষ্ঠের কথা ভাবা যেতে পারে। যদিও পৃথিবীপৃষ্ঠ দ্বিমাত্রিক (কারণ এতে দিক মাত্র দুটি, উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ও পূর্ব-পশ্চিম বরাবর), আমরা উদাহরণ হিসাবে এটাকেই ব্যবহার করবো, কারণ চতুর্মাত্রিক জগতের বক্রতার চেয়ে দ্বিমাত্রিক জগতের বক্রতা কল্পনা করা সহজ। পৃথিবী পৃষ্ঠের মত বক্রতলের জ্যামিতি আমাদের পরিচিত ইউক্লিডীয় জ্যামিতি থেকে ভিন্ন। যেমন ইউক্লিডিয় জ্যামিতিতে দুইটি বিন্দুর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম পথটি থাকে তাদের সংযোগকারী সরল রেখা বরাবর। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে দুইটি বিন্দুর মধ্যকার সংক্ষিপ্ততম পথটি থাকে তাদের সংযোগ কারী মহাবৃত্ত বরাবর। (মহাবৃত্ত হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে অঙ্কিত এমন বৃত্ত যার কেন্দ্র এবং পৃথিবীর কেন্দ্র একই। বিষুবরেখা হচ্ছে এ ধরনের একটা মহাবৃত্ত, বিষুবরেখাকে তার বিভিন্ন ব্যাসের সাপেক্ষে ঘুরিয়ে যে সব বৃত্ত পাওয়া যাবে সেগুলোও মহাবৃত্ত।)

মনে করুন আপনি নিউইয়র্ক থেকে মাদ্রিদে যেতে চান। শহরদুটি প্রায় একই অক্ষাংশে অবস্থিত। পৃথিবী যদি সমতল হতো তাহলে যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম উপায়টা হতো সোজা পূর্বদিকে হাটতে শুরু করা। আপনি যদি সেটা করেন তাহলে ৩,৭০৩ মাইল পাড়ি দিয়ে আপনি মাদ্রিদে গিয়ে পৌছাতে পারবেন। কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠতল বক্র, এই বক্রতার কারণে এমন একটা পথ পাওয়া যায় যেটা একটা সমতল ম্যাপে দেখতে বক্রাকার, তাই বড়, মনে হলেও আসলে সেটা আরো ছোটো। এটাই হচ্ছে মহাবৃত্ত বরাবর পথ। আপনি যদি মহাবৃত্ত পথে চলেন তাহলে মাত্র ৩,৬০৫ মাইল পাড়ি দিয়েই পৌছে যাবেন মাদ্রিদে। এই মহাবৃত্ত বরাবর পথটা নিউইয়র্ক থেকে প্রথমে উত্তর-পূর্ব বরাবর শুরু হয়ে ধীরে ধীরে পূর্ব মূখী হয়ে যায় এর পর আবার ধীরে ধীরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঘুরে পৌছে যায় লক্ষ্যে। পথভেদে এই দূরত্বের পার্থক্যটা ঘটে পৃথিবীপৃষ্ঠের বক্রতার কারণে, যেটা অইউক্লিডীয় জ্যামিতির একটি বৈশিষ্ট্য। এয়ারলাইন কোম্পানিগুলো এটা জানে। তাই তারা এমন ব্যবস্থা করে যেন সুযোগ পেলেই পাইলটরা মহাবৃত্ত পথে চলে।

নিউটনের গতিসূত্রমতে কামানের গোলা, গ্রহ, এমনকি ছুড়ে দেওয়া সিঙ্গাড়াও সরল পথে চলতে থাকবে যদি বাইরে থেকে এর উপর কোনো বল, যেমন মহাকর্ষ, প্রয়োগ করা না হয়। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বে গ্রাভিটি অন্যান্য বলের মত নয়; বরং ভরের কারণে সৃষ্ট স্থান-কালের বক্রতা থেকেই এর সৃষ্টি। এ তত্ত্ব মতে, মুক্তভাবে চলন্ত বস্তু সমূহ জিওডেসিক পথে চলে। জিওডেসিক হচ্ছে অনেকটা বক্র জগতের সরল রেখা। ঠিক যেমন সমতল জগতে জিওডেসিক হচ্ছে সরলরেখা আর পৃথিবীপৃষ্ঠে জিওডেসিক হচ্ছে মহাবৃত্ত। কোনো পদার্থের অনুপস্থিতিতে চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের জিওডেসিক ত্রিমাত্রিক জগতের সরল রেখার সমতুল। কিন্তু যখন পদার্থ উপস্থিত থাকে, ফলে স্থান-কাল বেঁকে যায়, তখন বস্তুসমূহের গতিপথও বেঁকে যায়। এই বেঁকে যাওয়া কে নিউটনীয় তত্ত্বে মহাকর্ষের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছিলো। স্থান-কাল যখন বেঁকে যায় তখন এর মধ্যকার বস্তুসমূহের গতিপথও বেঁকে যায়, যেটা দেখে মনে হয় যে এদের উপর কোনো বল কাজ করছে।

Geodesics The shortest distance between two points on the earth's surface appears curved when drawn on a flat map—something to keep in mind if ever given a sobriety test.

মহাকর্ষকে হিসাবে না ধরলে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে আপেক্ষিকতার বিশেষতত্ত্ব পাওয়া যায়। এবং এটা দুর্বল মহাকর্ষীয় পরিবেশে প্রায় নিউটনীয় তত্ত্বের মত একই অনুমান করে- অবশ্য পুরোপুরি একই না। কারণ বিশেষ আপেক্ষিকতাকে হিসাবে ধরা না হলে আমাদের জিপিএস নেভিগেশন সিস্টেমের হিসাবগুলো প্রতিদিন প্রায় দশ কিলোমিটার হারে বিচ্যুত হতো! অবশ্য এই নতুন তত্ত্বের চমৎকারিত্ব শুধু আপনাকে নতুন রেস্টুরেন্টের পথ দেখানোতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটা মহাবিশ্বেরই একটা নতুন রূপায়ণ, যা নতুন নতুন ঘটনা, যেমন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদির উপস্থিতি অনুমান করে। আর এভাবেই সাধারণ আপেক্ষিকতা পদার্থবিজ্ঞানকে পরিণত করেছে স্থান-কালের জ্যামিতি তে। অতিসূক্ষ্ম আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে সাধারণ আপেক্ষিকতাকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্মুখীন করার। কিন্তু এ তত্ত্ব সব পরীক্ষাই ভালো ভাবে উৎরে গেছে।

যদিও ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচৌম্বকীয় তত্ত্ব, এবং আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব দুটি যুগান্তকারী, তারপরও এরাও নিউটনের তত্ত্বের মতই ক্লাসিক্যাল পদার্থ বিজ্ঞানের অংশ। অর্থাৎ এরা হচ্ছে এমন রূপায়ণ যেখানে মহাবিশ্বের শুধু একটাই সম্ভাব্য ইতিহাস রয়েছে। আগের অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছি, পারমাণবিক এবং অতিপারমাণবিক জগতে এই তত্ত্বসমূহ পর্যবেক্ষণের সাথে মেলে না। বরং, তখন আমাদের ব্যবহার করতে হয় কোয়ান্টাম তত্ত্ব যেখানে মহাবিশ্বের যেকোনো সম্ভাব্য ইতিহাস থাকতে পারে, যার প্রতিটি ইতিহাসেরই নিজস্ব 'তীব্রতা' বা ঘটার সম্ভাব্যতার বিস্তার রয়েছে। দৈনন্দিন জগতের ব্যবহারিক হিসাবসমূহের জন্য আমরা ক্লাসিক্যাল তত্ত্বগুলোই ব্যবহার করে যেতে পারি। কিন্তু আমরা যদি, অণু-পরমাণুদের আচরণ বুঝতে চাই তাহলে আমাদের ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের কোয়ান্টাম ভার্সনের দ্বারস্থ হতে হয়। আর আমরা যদি আদি মহাবিশ্বে অবস্থা বুঝতে চাই, যখন সব পদার্থ ও শক্তি একটা ক্ষুদ্র আয়তনে চিপে আটকানো ছিলো, তখন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের কোয়ান্টাম ভার্সন আবশ্যক হয়ে যায়। এ ধরনের তত্ত্বগুলো আমাদের দরকার

কারণ প্রকৃতির কিছু ঘটনার জন্য শুধু কোয়ান্টাম তত্ব আর কিছু ঘটনার জন্য শুধু ক্লাসিক্যাল তত্ব থাকলে ব্যাপারটা পরস্পর সংগতিপূর্ণ হয় না। তাই আমাদের প্রকৃতির সকল ঘটনার জন্যই কোয়ান্টাম তত্ব থাকা চাই। এ ধরনের তত্বসমূহকে বলে কোয়ান্টামক্ষেত্র তত্ব।

প্রকৃতির জানা বলসমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়:
১. মহাকর্ষ বল: চারটি বলের মধ্যে দুর্বলতম বল হচ্ছে মহাকর্ষ। কিন্তু এর আকর্ষণ বল বহু দূর থেকেও পরিলক্ষিত হয়। তাই বৃহৎ বস্তুর সকল অংশের মহাকর্ষবল যুক্ত হয়ে বাকি তিনটি বলের উপর ছড়ি ঘোরানোর মত শক্তিশালী হয়ে যেতে পারে।
২. তড়িৎচৌম্বক বল: এই বলও দীর্ঘদূরত্ব থেকে কাজ করতে পারে কিন্তু এই বল কাজ করে শুধু মাত্র চার্জধারী কণিকার উপর। একই রকম চার্জ পরষ্পরকে বিকর্ষণ করে অপর দিকে বিপরীত ধর্মী চার্জ পরষ্পরকে আকর্ষণ করে। ফলে বৃহৎ বস্তুর ধ্বনাত্বক চার্জ এবং ঋণাত্বক চার্জের প্রভাব পরষ্পরকে কাটাকাটি করে ফেলতে পারে কিন্তু অণু-পরমাণু স্তরে এ বলের প্রভাব পরিলক্ষীত হয়।
৩. দুর্বল নিউক্লীয় বল: এই বলই তেজস্ক্রীয়তার কারণ। এবং আদি মহাবিশ্বে মৌলিক পদার্থসমূহের সৃষ্টিতে এর অপরিহার্য অবদান রয়েছে।
৪. শক্তিশালী নিউক্লিয় বল: এই বল পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন সমূহকে ধরে রাখে। এমন কি প্রোটন নিউট্রনের নিজেদেরও ধরে রাখতে এই বল কাজ করে। কারণ প্রোটন-নিউট্রনরাও আরো ক্ষুদ্র অতিপারমাণবিক কণিকা দ্বারা গঠিত। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা যে কোয়ার্কসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি এরাই হলো সেই গাঠনিক কণিকা। এই শক্তিশালী বলই সূর্যের শক্তির উৎস, এমনকি নিউক্লীয় শক্তিও এই বলের থেকেই পাওয়া যায়, যদিও দুর্বল বলের মত এই বলের সাথেও আমাদের সরাসরি কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

প্রথম যে বলের কোয়ান্টাম তত্ব তৈরি করা সম্ভব হয় সেটা হচ্ছে তড়িৎচৌম্বক বল। এই তত্বকে বলে কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যা (QED)। ১৯৪০ সালে রিচার্ড ফাইনম্যান সহ কয়েকজন এই তত্ব গঠন করেন। পরবর্তিতে অন্যসব কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্তের জন্য এই রূপায়ণ একটা ছাচ হিসাবে কাজ করেছে। যেমনটা আমরা আগেই বলেছি ক্লাসিক্যাল তত্ব মতে বল সঞ্চারিত হয় ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্বে বলক্ষেত্রসমূহ বিভিন্ন ধরনের মৌলিক কণিকা দ্বারা গঠিত ভাবা হয়, যারা বোসন নামে পরিচিত। বোসন হচ্ছে এক ধরনের বলবাহী কণিকা যারা বিভিন্ন পদার্থকণিকার মধ্যে ছোটাছুটি করে বল সঞ্চারিত করে। পদার্থকণিকাসমূহকে বলে ফার্মিওন। ইলেকট্রন, কোয়ার্ক এরা হচ্ছে ফার্মিওন। আর বোসনের উদাহরণ হচ্ছে আলোর কণিকা ফোটন। এই বোসনই তড়িতচৌম্বকীয় বল সঞ্চারিত করে। যা ঘটে তা হচ্ছে, কোনো পদার্থ কণিকা যেমন ইলেকট্রন একটা বোসন বা বলকণিকা নিক্ষেপ করে, এবং এর ফলে পিছনের দিকে একটা ধাক্কা খায়, ঠিক যেমন গোলা ছোড়ার সময় কামান পিছনের দিকে ধাক্কা দেয়। এই বলকণিকা পরে দ্বিতীয় কোনো পদার্থকণিকার সাথে ধাক্কা খেয়ে একীভূত হয়ে যায়, ফলে এই দ্বিতীয় কণিকাটির গতিপথও বদলে যায়। QED তত্বে চার্জযুক্ত কণিকাদের সকল পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই ফোটনের আদান প্রদান হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

পরীক্ষাগারে যাচাই করে দেখা হয়েছে যে QEDর অনুমানসমূহ পর্যবেক্ষণের সাথে অতিসূক্ষ্মভাবে মিলে যায়। অবশ্য QED তত্ত্বে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক হিসাবগুলো অনেক সময়ই বেশ কষ্টসাধ্য। আমরা নিচে দেখবো যে, এই কণিকাবিনিময় ধারণার সাথে যখন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সকল বিকল্প ইতিহাস হিসাবে আনার শর্ত যোগ করা হয়, তখন এর গাণিতিক রূপায়ণ বেশ জটিল হয়ে ওঠে। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ফাইনম্যান শুধু কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই বিকল্প ইতিহাস রূপায়ণই-আগের চ্যাপ্টারে যেটার কথা বলা হয়েছে- প্রস্তাব করেন নি; তিনি একটি চমৎকার সচিত্র পদ্ধতিও গঠন করেছেন এইসব বিবিধ ইতিহাসকে হিসাবে আনার। তার এই পদ্ধতি এখন শুধু QED তেই নয় বরং সকল ধরনের কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্বেই ব্যবহৃত হয়।

ফাইনম্যানের সচিত্র পদ্ধতির সাহায্যে সকল বিকল্প ইতিহাসের যোগফলকে চিত্রে প্রকাশ করা সম্ভব। এসব চিত্র, যাদেরকে বলে ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। নিচের চিত্রে তড়িৎ চৌম্বক বলের সাহায্যে দুইটি ইলেকট্রন কীভাবে একে অপরকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে তা প্রকাশকারী কিছু ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। QED তত্ত্বে এ ধরনের ফাইনম্যান ডায়াগ্রামসমূহের যোগফল আকারে সম্ভাব্য সকল ইতিহাসের যোগফল হিসাব করা হয়। এই চিত্রে পুরু রেখাগুলো ইলেকট্রন এবং ঢেউখেলানো রেখাগুলো ফোটন নির্দেশ করছে। সময়ের প্রবাহ প্রকাশ করা হয় নিচ থেকে উপরের দিকে, আর যেসব অংশে কয়েকটি দাগ এসে মিলেছে সেসব অংশে একটি ফোটন নির্গত বা গৃহীত হয়েছে বোঝায়। চিত্র (A) তে দেখা যাচ্ছে দুইটি ইলেকট্রন একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, একসময় তারা একটি ফোটন বিনিময় করে এবং এর পরে আবার নিজ পথে চলে যেতে থাকে। দুইটি ইলেকট্রনের তড়িৎচৌম্বকীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এটা হচ্ছে সবচেয়ে সরল রূপ। কিন্তু আমাদের অবশ্যই সম্ভাব্য সব উপায়ই হিসাবে আনতে হবে। তাই আমাদের এর মত ডায়াগ্রামও হিসাবে নিতে হবে। এই ডায়াগ্রামে দেখা যাচ্ছে দুইটি দাগ এগিয়ে আসছে- অর্থাৎ, দুটি ইলেকট্রন একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং শেষে দাগদুটি আবার বাইরের দিকে সরে যাচ্ছে- অর্থাৎ, ইলেকট্রন দুটি একে অপরকে বিক্ষিপ্ত করেছে। এবং এই দুই ঘটনার মাঝে দুইটি ফোটন আদান প্রদান হয়েছে। নিচের চিত্রে মাত্র অল্প কয়েকটা সম্ভাব্য ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে; আসলে এরকম অসীম সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ডায়াগ্রাম সম্ভব গাণিতিক ভাবে যাদেরকে হিসাবে আনতে হয়।
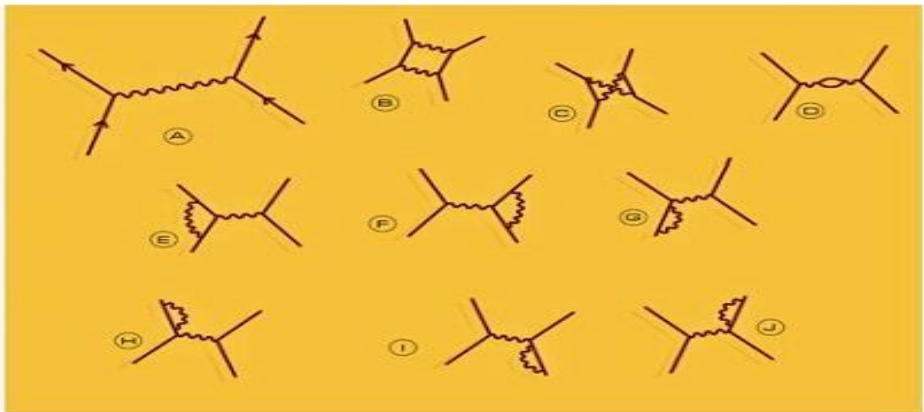
Feynman Diagrams These diagrams pertain to a process in which two electrons scatter off each other.

ফাইনম্যান ডায়াগ্রামগুলো স্রেফ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলোকে চিত্রিত বা শ্রেণীবিভক্ত করার একটা চমৎকার উপায় নয়। এসব ডায়াগ্রাম গঠিত হয় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, যার ফলে একটা ডায়াগ্রাম দেখেই সরাসরি তার প্রকাশকারী গাণিতিক সূত্রটা পড়ে ফেলা সম্ভব। এভাবে একটা জানা আদি ভরবেগ সম্পন্ন ইলেকট্রন বিক্ষেপনের পরে কত শেষ ভরবেগ নিয়ে ছুটে যাবে সেটা হিসাব করা সম্ভব প্রতিটা ফাইনম্যান ডায়াগ্রামের সূত্র থেকে পাওয়া মানসমূহ যোগ করে। হিসাবটা কষ্টসাধ্য হতে পারে কারণ আমরা জানি, এরকম ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম হয় অসীম সংখ্যক। তার উপর যদিও আগমনী ও বহির্গামী ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট শক্তি ও ভরবেগ আছে, তবুও চিত্রের মধ্যে বিভিন্ন দাগে সৃষ্ট আবদ্ধচক্রের মধ্যকার কণিকাসমূহের যেকোনো শক্তি ও ভরবেগ থাকতে পারে। এটা খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফাইনম্যান যোগফল হিসাবের সময় শুধু এই সকল চিত্রই নয় এমন কি প্রতিটি চিত্রের মধ্যকার সকল সম্ভাব্য শক্তি ও ভরবেগেরও যোগফল হিসাব করতে হবে।

ফাইনম্যান ডায়াগ্রামসমূহ QED তত্ত্বে বর্ণীত সকল সম্ভাব্যতা ও প্রক্রিয়াসমূহের হিসাব ও চিত্রায়নে পদার্থবিদদের দারুণ কাজে আসে। কিন্তু এর যাহায্যে এই তত্ত্বের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা দূর হয় না। সেটা হচ্ছে আপনি যখন অসীম সংখ্যক ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ যোগ করবেন আপনি একটা অসীম ফলাফল পাবেন। (যখন একটা অসীম ধারার ক্রমাগত পদসমূহের মান যথেষ্ট দ্রুত হ্রাস পায়, তখন এমনকি অসীম সংখ্যক পদের যোগফলও সসীম হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা ঘটে না।) বিশেষ করে ফাইনম্যান ডায়াগ্রামগুলোকে যখন যোগ করা হয় তখন ফলাফল দেখে মনে হয় ইলেকট্রনের ভর এবং আধান অসীম। ব্যাপারটা উদ্ভট কারণ আমরা পরীক্ষাগারে মেপে দেখতে পারি যে ইলেক্ট্রনের ভর ও আধান সসীম। এই অসীমগুলো দূর করার জন্য একটা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যাকে বলে পুনরাদর্শীকরণ।

এই পুনরাদর্শীকরণ প্রক্রিয়ায় ঋণাত্বক অসীম সংখ্যাগুলোকে এমন ভাবে বিয়োগ করা হয় যেন তত্ব থেকে প্রাপ্ত ঋণাত্বক অসীম ও ধনাত্বক অসীম সংখ্যাসমূহ প্রায় কাটাকাটি যায়। ফলে একটা ছোট মান অবশিষ্ট থাকে। এই অবশিষ্টই হচ্ছে আমাদের পর্যবেক্ষীত ভর ও আধানের সসীম মান। এসব হিসাবের কথা শুনে মনে হতে পারে, 'আরেহ! এসব করে করেই তো স্কুলে ম্যাথে গোল্লা পেতাম'। গাণিতিকভাবে দেখলে এই পুনারদর্শীকরণ প্রক্রিয়া আসলেই সন্দেহজনক। ইলেকট্রনের ভর ও আধানের যেকোনো সসীম মানই এ প্রক্রিয়ায় পাওয়া যম্ভব। তবে এর সুবিধা হলো পদার্থবিদরা তাদের ঋণাত্বক অসীম সংখ্যাগুলো এমন ভাবে নিতে পারেন যেন ইলেকট্রনের ভর ও আধান ঠিক মত পাওয়া যায়, কিন্তু এর অসুবিধা হলো শুধু এই তত্ব থেকে ইলেক্ট্রনের ভর ও আধান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা একবার এভাবে ইলেক্ট্রনের ভর ও আধান নির্দিষ্ট করে নিলে QED প্রয়োগ করে অনেক রকম ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি যারা সবাই পর্যবেক্ষণের সাথে খুবই নিবিড় ভাবে মিলে যায়। তাই পুনরাদর্শীকরণ হচ্ছে QEDর একটি অপরিহার্য উপাদান। উদাহরণ স্বরুপ QED তত্বের প্রথম দিককার একটা সাফল্য হচ্ছে ল্যাম্ব অপবর্তনের সঠিক ভবিষ্যতবাণী। ১৯৪৭ সালে আবিষ্কৃত এই ঘটনায় হাইড্রোজেনের একটি অবস্থার শক্তিতে অল্প পরিবর্তন লক্ষীত হয়।

Feynman Diagrams Richard Feynman drove a famous van with Feynman diagrams painted on it. This artist's depiction was made to show the diagrams discussed above. Though Feynman died in 1988, the van is still around—in storage near Caltech in Southern California.

তড়িৎচৌম্বক বলের উপর QED তত্ত্বের সাফল্যে অন্যান্য বলসমূহের জন্যও এ ধরনের কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব খোঁজার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রকৃতির বলসমূহকে চারভাগে ভাগ করার ব্যাপারটা সম্ভাবত কৃত্রিম। যেটা ঘটেছে আমাদের জানা-বোঝার সীমাবদ্ধতার কারণে। মানুষ তাই সবকিছুর এমন একটা তত্ত্বের খোঁজ করে চলেছে যেটা কোয়ান্টাম তত্ত্ব মেনে এই চারটি ভাগকেই একটি একক সূত্রে বেঁধে ফেলবে। এটাই তখন হবে পদার্থবিজ্ঞানের হোলি গ্রেইল।

একত্রীকরণের প্রচেষ্টাটা যে সঠিক প্রচেষ্টা তার একটা নির্দেশ পাওয়া যায় দুর্বল বলের তত্ত্ব থেকে। দুর্বল বলের বর্ণনাকারী ক্ষেত্রতত্ত্বকে নিজে নিজে পুনরাদর্শীকরণ করা যায় না; অর্থাৎ, এতে কিছু অসীম থেকেই যায় যেটাকে সসীম সংখ্যক রাশির-যেমন ভর বা আধান- বিয়োগে দূর করা যায় না৷ অবশেষে ১৯৬৭ সালে আবদুস সালাম এবং স্টিভেন ওয়াইনবার্গ পৃথক ভাবে একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেন যেখানে দুর্বল বলের তত্ত্বের সাথে তড়িৎচৌম্বক বলের তত্তকে একীভুত করা হয়। এর ফলে এই অসীমের সমস্যাটি সমাধান হয়। এই একীভুত বলকে বলে, তড়িৎদুর্বল বল। এর তত্তকে পুনরাদর্শীকরণ করা সম্ভব, এবং এটি W^+, W^- ও Z^0 নামক তিনটি নতুন কণিকার অস্তিত্বের ভবিষ্যতবাণী করে। ১৯৭৩ সালে জেনেভার সার্ন (CERN) গবেষণাগারে Z^0 কণিকার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। সালাম এবং ওয়াইনবার্গ ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরষ্কার পান, যদিও ১৯৮৩ সালের আগে এই W ও Z কণিকাগুলোকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।

শক্তিশালী নিউক্লিয় বলকে অন্য তত্ত্বের সাহায্য ছাড়াই পুনরাদর্শীকরণ করা যায় যে তত্ত্বে, তাকে বলে কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স বা QCD। এই তত্ত্ব মতে প্রোটন নিউট্রন, এবং অন্য অনেক মৌলিক কণিকাই কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। এসকল কোয়ার্কের একটা উল্লেখজনক

বৈশিষ্ট্য আছে যেটাকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'রঙ' বা 'বর্ণ' (এখান থেকেই 'ক্রোমোডাইনামিক্স' বা 'বর্ণগতিবিদ্যা' শব্দটা এসেছে, যদিও কোয়ার্কের কোনো দৃশ্যমান রঙ নেই, এগুলো স্রেফ বৈশিষ্ট্য নির্দেশক নাম)। কোয়ার্ক হয় তিনটি তথাকথিত রঙ-এর লাল, সবুজ ও নীল। এছাড়াও প্রতিটি কোয়ার্কেরই প্রতি-কোয়ার্ক আছে। তাদের নাম যথাক্রমে প্রতি-লাল, প্রতি-সবুজ ও প্রতি-নীল। ধারণাটা হচ্ছে শুধু মাত্র সেইসব সন্নিবেশ যাদের রঙএর সমষ্টি শূন্য তারাই মুক্ত কণিকা আকারে অস্তিত্বশীল হয়। এধরনের কোয়ার্ক সন্নিবেশ দুই ভাবে পাওয়া যেতে পারে। একটি রঙ ও তার প্রতি-রঙ কাটাকাটি যায়, তাই একটি কোয়ার্ক আর তার প্রতি-কোয়ার্ক মিলে একটি বর্ণহীন জুটি তৈরি করে, ফলে এ ধরনের সন্নিবেশ সম্ভব। এভাবে আমরা যে ক্ষণস্থায়ী কণিকাটি পাই তাকে বলে মেসন। এছাড়াও তিনটি রঙকে (বা তিনটি প্রতি-রংকে) মেলানো হলেও তাদের সন্নিবেশে কোনো বর্ণ থাকে না। এভাবে তিনটি কোয়ার্কের (প্রতি রঙ এর একটি করে) মিলনে আমরা ব্যারিওন নাম স্থিতিশীল কণিকা পাই যেমন প্রোটন এবং নিউট্রিনো (এছাড়া তিনটি প্রতি-কোয়ার্ক মিলে ব্যারিয়নের প্রতিকণিকা সৃষ্টি করে)। প্রোটন এবং নিউট্রনই হচ্ছে সেই ব্যারিয়ন যারা পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং এদের দ্বারাই মহাবিশ্বের সকল স্বাভাবিক বস্তুসমূহ গঠিত।

QCDর আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে যার নাম অসীমতটীয় স্বাধীনতা। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা এর কথা বলেছি, যদিও তখন আমরা এই নাম ব্যবহার করিনি। অসীমতটীয় স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে- কোয়ার্কদের মধ্যকার শক্তিশালী বল পরিমানে কম হয় যখন তারা কাছাকাছি থাকে এবং তাদের দূরত্বের বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে, ঠিক যেন রাবার ব্যান্ড দিয়ে যুক্ত। এই অসীমতটীয় স্বাধীনতার কারণেই আমরা প্রকৃতিতে মুক্ত কোয়ার্ক দেখিনা বা ল্যাবরেটরিতেও তৈরি করতে সক্ষম হইনি। এদেরকে আমরা দেখতে না পেলেও এই কোয়ার্ক রূপায়ণ আমরা মেনে নিই, কারণ এই তত্ত্ব প্রোটন, নিউট্রন ও অন্যান্য পদার্থকণিকার আচরণ খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে।

দুর্বল বল ও তড়িৎচৌম্বকীয় বলকে একীভুত করার পরে সত্তুরের দশকে পদার্থবিজ্ঞানীরা শক্তিশালী বলকেও এই তত্ত্বে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। বেশ কিছু গ্রান্ড ইউনিফায়েড তত্ত্ব (GUT) বা সার্বিক তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়েছে যেগুলো শক্তিশালী বলকেও দুর্বল বল ও তড়িৎচৌম্বকীয় বলের সাথে একীভুত করে। কিন্তু তারা কমবেশি অনুমান করে যে আমাদের গঠনকারী উপাদান প্রোটনের ক্ষয় আছে এবং এদের গড় আয়ু $১০^{৩২}$ বছর। এটা অবশ্য অনেক বড় সময় যদি মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স (প্রায়) $১০^{১০}$ এর সাথে তুলনা করা হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে যখন আমরা বলি কোনো কণিকার গড় আয়ু $১০^{৩২}$ এর মানে এই না যে সবাই গড়ে প্রায় $১০^{৩২}$ বছর বাঁচে, আর তার মধ্যে কেউ হয়তো কিছু কম বা বেশি বাঁচে। বরং কোয়ান্টাম তত্ত্বে বয়স $১০^{৩২}$ বছর অর্থ হলো প্রতি বছর কণিকাটির ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা $১০^{৩২}$ ভাগে ১ ভাগ। ফলে আপনি যদি $১০^{৩২}$ প্রোটন ধারণকারী একটি পাত্রকে কয়েক বছর পর্যবেক্ষণ করেন তাহলেই বেশকিছু প্রোটনকে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখবেন। এরকম একটি পাত্র তৈরি করা তেমন কঠিন নয় কারণ মোটামুটি একহাজার টন পানিতেই $১০^{৩২}$ টি প্রোটন থাক। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে এই প্রোটন ক্ষয় চিহ্নিত করা এবং সেটাকে অন্যান্য মহাজাগতিক রশ্মিঘটিত ঘটনা থেকে আলাদা করা সহজ কথা নয়। এসব বাহ্যিক ঘটনা সৃষ্ট বিচ্যুতির প্রভাব কমানোর জন্য বিজ্ঞানীরা মাটির অনেক গভীরেও পরীক্ষা চালিয়েছেন ২০০৯-এ। তেমন দুটি যায়গা হচ্ছে কামিওকা মাইনিং এবং জাপানের একটি পর্বতের নিচে

স্মেল্টিং কোম্পানির খনি যেটি ভূমির ৩,২৮১ ফুট নিচে এবং মহাজাগতিক রশ্মিথেকে প্রায় মুক্ত। এসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে বিজ্ঞানীরা উপসংহারে পৌছেছেন যে প্রোটন যদি ক্ষয় হয়েও থাকে তাহলেও এর আয়ু $১০^{৩৪}$বছরের চেয়ে বেশি।
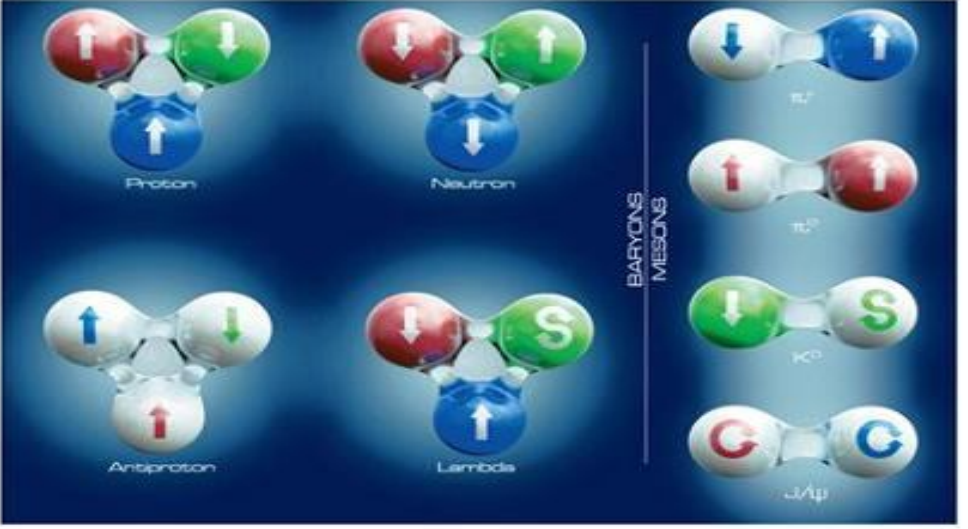
Baryons and Mesons Baryons and mesons are said to be made of quarks bound together by the strong force. When such particles collide, they can exchange quarks, but individual quarks cannot be observed.

শুরু থেকেই যেহেতু পর্যবেক্ষনলব্ধ তথ্য GUTতত্বগুলোর সাথে মেলে না সেহেতু পদার্থবিজ্ঞানীরা কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য যে তত্বটি ব্যবহার করেন সেটার নাম স্টান্ডার্ড মডেল বা আদর্শরূপায়ণ। যেটা তড়িৎদুর্বল বলের তত্ব ও শক্তিশালী বলের উপর প্রযোজ্য QCD তত্বের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু স্টান্ডার্ড মডেলে তড়িৎদুর্বল বল এবং শক্তিশালী বল আলাদা আলদা ভাবে কাজ করে তাই এটাকে সত্যিকার অর্থে একীভুত তত্ব বলা যায় না। স্টান্ডার্ড মডেল এখনো পর্যন্ত খুবই সফল এবং বর্তমান সব পর্যবেক্ষণের সাথে দারুণ ভাবে মেলে, অবশ্য তড়িৎদুর্বল বল ও শক্তিশালী বলকে একীভুত করতে পারার ব্যর্থতা ছাড়াও এ তত্ব নিয়ে আরেকটা অসন্তোষ আছে সেটা হলো স্টান্ডার্ড মডেলে মহাকর্ষ অনুপস্থিত।

এটা প্রমাণিত যে শক্তিশালী বলের সাথে তড়িৎচৌম্বক বল বা দুর্বল বলকে একীভুত করা সহজ কাজ নয়, কিন্তু সেসব সমস্যা কোনো সমস্যাই না যখন মহাকর্ষ বলকে অন্য কোনো বলের সাথে একীভুত করার চেষ্টা করা হয়, বা শুধুমাত্র মহাকর্ষের জন্যই একটি কোয়ান্টাম তত্ব দাঁড়া করানোর চেষ্টা করা হয়। মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ব সৃষ্টি করা এত কঠিন হওয়ার কারণ আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণীত হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি। ব্যাপারটা অতটা পরিষ্কার নয় তবে অনিশ্চয়তার নীতির আলোকে দেখা যায় একটা ক্ষেত্রের মান এবং এর পরিবর্তনের হার কোনো কণিকার অবস্থান এবং গতি হিসাবে কাজ করে। তার মানে যত সূক্ষ্ম ভাবে একটাকে নির্ণয় করা হবে অন্যটাকে ততটাই কম সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হচ্ছে শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। কারণ শূন্যস্থান এর অর্থ হচ্ছে ঐ স্থানে কোনো ক্ষেত্রের মান এবং তার পরিবর্তনের হার

উভয়েই শূন্য। (ক্ষেত্রের পরিবর্তনের হার শূন্য না হলে ঐ স্থানটি ফাঁকা থাকবে না।) যেহেতু অনিশ্চয়তার নীতি কখনোই কোনো ক্ষেত্রের মান এবং তার পরিবর্তনের হারকে সুনির্দিষ্ট হতে দেবে না সেহেতু উভয়েই একই সঙ্গে শূন্য হতে পারে না। তাই শূন্যস্থান আসলে কখনই শূন্য নয়। এটা একটা সর্বনিম্ন শক্তির অবস্থায় থাকতে পারে, যেটাকে আমরা বলব বস্তুশূন্য অবস্থা। কিন্তু এটা বিভিন্ন রকম কোয়ান্টাম বিক্ষেপের মধ্যে থাকে, যাকে বলে 'বস্তুশূন্য অস্থিতি'- এ অবস্থায় কণিকা এবং ক্ষেত্র সস্তস্ফুর্ত ভাবে অস্তিত্বশীল হয় এবং মিলিয়ে যেতে থাকে।
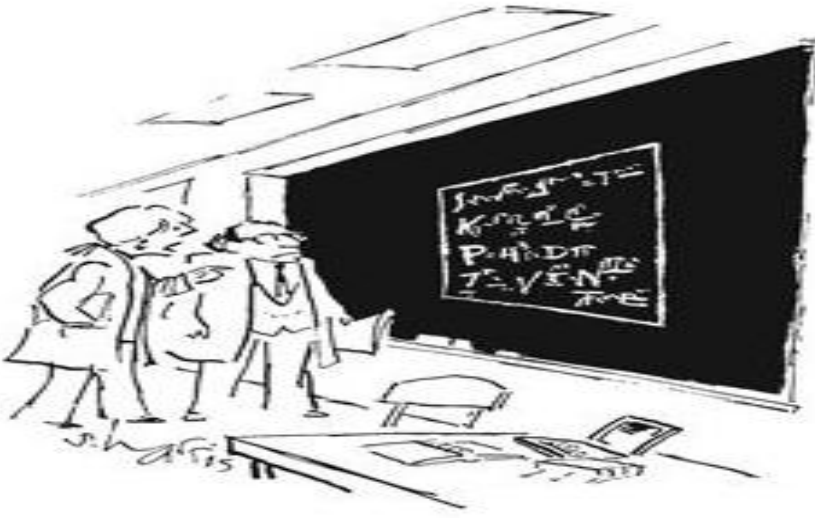
"Putting a box around it, I'm afraid, does *not* make it a unified theory."

বস্তুশূন্য অস্থিতিকে এভাবে ভাবা যেতে পারে যে, এ অবস্থায় কোনো সময়ে স্বতস্ফুর্ত ভাবে এক জোড়া কণিকার সৃষ্টি হচ্ছে, তারপর তারা একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আবার কাছে এসে মিলে মিশে একাকার হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। ফাইনম্যানের ডায়াগ্রাম আকারে ভাবলে তারা হচ্ছে এসব ডায়াগ্রামের বদ্ধচক্রের মত। এ ধরনের কণিকাদের বলে অসদ কনিকা। বাস্তব কণিকার মত এসব অসদ কণিকাকে কণিকাবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য তাদের পরোক্ষ প্রভাব, যেমন ইলেকট্রনের কক্ষপথে সামান্য বিচ্যুতি, পরিমাপ করা সম্ভব, এবং তাত্ত্বীক অনুমানের সাথে সেটা দারুণভাবে মিলে যায়। সমস্যা হচ্ছে এসব অসদ কণিকার শক্তি আছে, এবং যেহেতু অসদ কণিকার সংখ্যা অসীম সেহেতু তাদের সম্মিলিত শক্তির পরিমানও অসীম। সাধারণ আপেক্ষীকতার তত্ব অনুযায়ী এই অসীম শক্তি মহাবিশ্বের স্থান-কালকে বাকিয়ে একেবারে অসীম ক্ষুদ্রতার একটা আকারে পরিণত করবে। যেটা, আমরা দেখছি, যে ঘটে না!

এই অসীমের ঝামেলাটাও আমাদের ঐ শক্তিশালী, দুর্বল ও তড়িৎচৌম্বক বলের কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্বে উদ্ভুত অসীমের সমস্যার মত, কিন্তু সেসব তত্বে পুনরাদর্শীকরণের মাধ্যমে এসব অসীমকে দূর করা হয়। কিন্তু মহাকর্ষীয়-ফাইনম্যান ডায়াগ্রামের আবদ্ধচক্র থেকে পাওয়া অসীমকে পুনরাদর্শীকরণ করে দূর করা যায় না। কারণ এখানে অন্যান্য তত্ত্বের আধান

বা ভরের মত পরিবর্তন যোগ্য যথেষ্ট চলক নেই। তাই আমাদের হাতে আছে এমন একটা মহাকর্ষের তত্ব যেটার মতে কিছু রাশি যেমন স্থান-কালের বক্রতা অসীম। যা কোনো ক্রমেই একটা বাসযোগ্য মহাবিশ্বের অবস্থা হতে পারে না। তার মানে একটা যুক্তিগ্রাহ্য তত্ব পাওয়া সম্ভব শুধুমাত্র তখনই যখন পুনরাদর্শীকরণের দ্বারস্থ না হয়েই এসব অসীম দূর করা যাবে।

১৯৭৬ সালে এই সমস্যার একটা সম্ভাব্য সমাধান পাওয়া যায়। যার নাম মহামহাকর্ষ। নামের আগে আরেকটা 'মহা' জুড়ে দেওয়ার কারণ এটা নয় যে পদার্থবিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন যে তাঁরা কোয়ান্টাম মহাকর্ষের 'মহান' কোনো তত্ব পেয়ে গেছেন। বরং এই 'মহা' এসেছে এই তত্বের এক ধরনের প্রতিসাম্য থেকে, যার নাম মহাপ্রতিসাম্য।

পদার্থবিজ্ঞানে কোনো একটা ব্যবস্থা প্রতিসম বলতে বোঝায় কোনো অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরানো হলে বা প্রতিবিম্ব নেওয়া হলেও ব্যবস্থাটির বিভিন্ন ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে। যেমন আপনি যদি একটা ডোনাটকে উলটে ধরেন তাহলেও সেটা দেখতে একই রকম লাগে (অবশ্য যদি উপরদিকে চকলেটের আবরণ না থাকে, সে ক্ষেত্রে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে খেয়ে ফেলাটাই উত্তম)। মহাপ্রতিসাম্য হচ্ছে এক ধরনের সূক্ষ্ম প্রতিসাম্য যেটাকে ঠিক কোনো স্থানিক অক্ষের সাপেক্ষে রূপান্তরের সাথে মেলানো যাবে না। এই মহাপ্রতিসাম্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হচ্ছে বলকণিকা ও বস্তুকণিকা অর্থাৎ, বল এবং বস্তু, আসলে একই জিনিসের দুটি গুণ। উদাহরণ দিয়ে বললে, এর অর্থ প্রতিটি বস্তুকণিকা যেমন কোয়ার্কের আনুসঙ্গীক বলকণিকা থাকবে, আবার প্রতিটি বলকণিকা যেমন ফোটনেরও আনুসাঙ্গীক বস্তুকণিকা থাকবে। এর ফলে অসীমের সমস্যা সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ দেখা যায় বলকণিকার বদ্ধচক্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে ধনাত্বক অসীম এবং বস্তুকণিকার বদ্ধচক্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে ঋণাত্বক অসীম এবং এর ফলে এরা কাটা কাটি যাওয়ার সুযোগ থাকে। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, মহামহাকর্ষ তত্বে শেষ পর্যন্ত সবগুলো অসীম কাটাকুটি যায় কি না, সেটার গাণিতিক হিসাব এত দীর্ঘ্য এবং জটিল, ফলে ভুল হবার সম্ভাবনা এত বেশি, যে কেউ সে কাজের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলো না। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে এই মহামহাকর্ষতত্বই সম্ভবত মহাকর্ষের সাথে অন্যান্য বলসমূহের একীভুত করার সমস্যার সঠিক উত্তর।

আপনি হয়তো ভাবছেন মহাপ্রতিসামের বৈধতা যাচাই তেমন কঠিন কিছু না- স্রেফ যেসব কণিকা আছে তাদের গুণাবলী পরীক্ষা করে দেখলেই হয় যে তারা জোড়ায় জোড়ায় আছে কি না। কিন্তু না, সে ধরনের কোনো অণুসঙ্গী কণিকা পর্যবেক্ষীত হয় নি। বিভিন্ন গণনা থেকে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে আমাদের পর্যবেক্ষীত কণিকাদের তেমন কোনো অণুসঙ্গী কণিকা থাকলেও তাদের ওজন হবে প্রোটনের ওজনের চেয়ে হাজারগুণ বেশি। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা কণিকাদের তুলনায় এটা খুব বেশি ভারী। তবে আশা করা হচ্ছে জেনেভায় অবস্থিত লার্জ হেড্রন কলাইডারে এমন কণিকা তৈরি করা সম্ভব হবে।

মহাপ্রতিসাম্যের ধারণাই ছিলো মহামহাকর্ষের তত্বের মূল চাবিকাঠি। কিন্তু এই ধারণার সূচনা হয়েছিলো আরো অনেক আগেই, স্ট্রিং তত্ব নামক নবীন এক তত্বের হাত ধরে। স্ট্রিং তত্ব মতে কণিকারা ঠিক বিন্দু নয় বরং কম্পনের একটা পাটার্ণ যার শুধু দৈর্ঘ্য আছে,

কিন্তু প্রস্থ ও উচ্চতা নেই – ঠিক যেন অসীম সূক্ষ্মতার তার। স্ট্রিং তত্ত্বগুলোতেও অসীমের সমস্যা আছে, কিন্তু ধারণা করা হয় এ তত্ত্বের সঠিক ভার্সনে এসব অসীম সব কাটা যাবে। এতত্ত্বের আরেকটা ব্যতিক্রমি ব্যাপার হলো এটা স্থিতিশীল হয় শুধুমাত্র যদি স্থান-কালের মাত্রা হয় দশ। দশমাত্রার জগত শুনতে বেশ আগ্রোহদ্দীপক মনে হতে পারে, কিন্তু এ জগতে আপনি যদি নিজের গাড়ি কোথায় পার্ক করেছেন সেটা ভুলে যান তাহলে ভালোই বিপদে পড়বেন। তো এই এতগুলো মাত্রা যদি থেকেই থাকে, তাহলে আমরা বাড়তি মাত্রা দেখি না কেন? স্ট্রিং তত্ত্ব মতে এসব মাত্রা বেঁকেচুরে খুবই ক্ষুদ্র আকারে থাকে। ব্যাপারটা বুঝতে একটা দ্বিমাত্রিক তল কল্পনা করুন। কোনো তলকে আমরা দ্বিমাত্রিক বলি তখন যখন সেই তলের উপর কোনো বিন্দুর অবস্থান প্রকাশ করতে দুইটি সংখ্যা লাগে (আনুভুমিক ও উলম্ব স্থানাঙ্ক)। এমন আরেকটা দ্বিমাত্রিক তল হতে পারে কোনো নলের বহির্তল। এর উপর কোনো বিন্দুকে চিহ্নিত করতে আপনাকে জানতে হবে নলের দৈর্ঘ্য বরাবর কত দূর যেতে হবে, এরপর সেই দূরত্বে পৌছে নলের বক্রতল বরাবর বৃত্তাকারে কত দূর যেতে হবে। এখন এই নলের ব্যাসার্ধ যদি অতিক্ষুদ্র হয় তাহলে এই বহির্তলীয় বৃত্তাকার পথের ব্যপারটা উপেক্ষা করেও, শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য বরাবর কতদূর যেতে হবে, সেটার সাহায্যেই কোনো বিন্দুর বেশ ভালো একটা আনুমানিক অবস্থান পাওয়া সম্ভব। আর এই নলের ব্যাসার্ধ যদি এক ইঞ্চির মিলিয়ন-মিলিয়ন-মিলিয়ন-মিলিয়ন-মিলিয়ন ভাগের একভাগ হয় তাহলে তো আপনি সেই বৃত্তাকার মাত্রা খেয়ালই করবেন না। বাড়তি মাত্রা বিষয়ে স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের ধারণা এমনই, অর্থাৎ এরা প্রচন্ড বাঁকানো এবং জড়িয়ে-পেচিয়ে এত ক্ষুদ্র স্থানে থাকে যে আমরা আর তা দেখি না। স্ট্রিং তত্ত্বে এই বাড়তি মাত্রাগুলো অন্তর্বর্তী জগৎ নামক স্থানে বেঁকিয়ে থাকে। এই অন্তর্বর্তী জগৎ হচ্ছে আমাদের অনুভুতিগ্রাহ্য ত্রিমাত্রিক জগতের বাইরের জগত। আমরা পরে দেখবো যে এই বাড়তি মাত্রাগুলো স্রেফ লুকিয়ে থাকা কিছু ব্যাপারই নয়- বরং এদের গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবদান রয়েছে।

এই অতিরিক্ত মাত্রা ছাড়াও স্ট্রিং তত্ত্বের আরো কিছু বেঢপ ব্যাপার রয়েছে: দেখা গেছে এরকম স্ট্রিং তত্ত্ব আছে পাঁচটি এবং প্রতি তত্ত্বেই অতিরিক্ত মাত্রাগুলো মিলিয়নটা ভিন্ন উপায়ে জড়িয়ে-পেচিয়ে থাকতে পারে, ব্যাপারটা স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের জন্য -যারা এই তত্ত্বকেই সবকিছুর একক তত্ত্ব বলে ধারণা করছিলেন- ছিলো বেশ অস্বস্তিকর। পরে ১৯৯৪ সালের দিকে মানুষ বিভিন্ন রকম দ্বিত্ব আবিষ্কার করতে শুরু করে। এর ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন স্ট্রিং তত্ত্ব এবং অতিরিক্ত মাত্রাসমূহের এই প্যাঁচ আসলে চতুর্মাত্রিক জগতের কিছু ঘটনাকেই বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করার উপায় মাত্র। তার উপর, এ থেকে দেখা যায় মহামহাকর্ষও অন্যান্য তত্ত্বের সাথে এ ধরনের দ্বিত্বের মাধ্যমেই সম্পর্কিত। স্ট্রিং তাত্ত্বিকরা এখন নিশ্চিত যে এই পাঁচটি স্ট্রিং তত্ত্বই আসলে আরো মৌলিক একটা তত্ত্বের বিভিন্ন অনুমান, যাদের একেকটি একেক অবস্থায় প্রযোজ্য।

এই মৌলিকতর তত্ত্বকে বলা হয় এম-তত্ত্ব, যার কথা আমরা আগেই বলেছি। এই তত্ত্বের নামে 'এম' আসলো কোথা থেকে সেটা মনে হয় কেউই ঠিক করে জানে না। হয়তো ইংরেজী "মাস্টার", "মিরাকল" বা "মিস্ট্রি" থেকে এসেছে। তবে মনে হয় এই তিনটা থেকেই এই নামের উৎপত্তি। মানুষ এখনো এম-তত্ত্বের খুটিনাটির অর্থোদ্ধার করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটা হয়তো সম্ভব হবে না। বরং, এমন হতে পারে পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রথাগত আশা যে প্রকৃতির একক সার্বিক তত্ত্ব, সেটা হয়তো পাওয়া অসম্ভব এবং হয়তো এ তত্ত্বের কোনো একক রূপায়ণ নেই। এমনটা হতে পারে যে মহাবিশ্বকে বর্ণনা করতে আমাদের একেক

অবস্থায় একেক তত্ব প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি তত্ত্বেরই বাস্তবতার নিজস্ব রুপায়ণ থাকতে পারে। কিন্তু রুপায়ণনির্ভর বাস্তবতা মতে এতে কোনো সমস্যা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এক তত্ত্বের প্রয়োগের সীমা যেখানে অন্যটার উপর এসে পড়ে সেই উপরিপাতিত স্থানে উভয়ের অনুমানই একে অপরের সাথে মিলে যায়। অর্থাৎ একই ঘটনার উপর উভয় তত্ব প্রয়োগ করা সম্ভব হলে উভয়ের অনুমানই মিলতে হবে।

এম-তত্ত্বের কোনো একক গাণিতিক রুপায়ণ আছে, না কি এটা বিভিন্ন তত্ত্বের একটা জালিকার মতো, সেটা আমরা এখনো জানি না। তবে এর কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানি। প্রথমত, এম-তত্ত্বে স্থানকালের মাত্রা দশ নয় বরং এগারো। স্ট্রিং তাত্ত্বিকরা অনেকদিন থেকেই ধারণা করছিলেন যে দশ মাত্রার হিসাবটা হয়তো কিছুটা পরিবর্তন করা লাগবে। এবং সমসাময়িক কিছু কাজ থেকে দেখা যায় আসলেই একটি মাত্রাকে এতদিন উপেক্ষা করা হয়েছে। তার উপর এম-তত্ত্বে শুধু কম্পমান স্ট্রিং-ই নয় অন্যান্য আরো কিছু জিনিস থাকতে পারে, যেমন বিন্দু কণিকা, দ্বিমাত্রি মেম্ব্রেন, ত্রিমাত্রিক-ব্লব, এবং অন্যান্য বহুমাত্রিকবস্তু যাদের মাত্রা সংখ্যা নয় পর্যন্ত হতে পারে। ফলে এসব বস্তু কল্পনা করা দুষ্কর। এদেরকে সাধারণভাবে বলে p-ব্রেন (যেখানে p এর মান শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত হতে পারে)।

Straws and Lines A straw is two-dimensional, but if its diameter is small enough—or if it is viewed from a distance—it appears to be one-dimensional, like a line.

আর এই যে জড়িয়ে-পেচিয়ে থাকা অতিক্ষুদ্র বাড়তি মাত্রাগুলো এদের সম্পর্কে এম-তত্ব কী বলছে? এ তত্ব মতে এসব বাড়তি মাত্রা চাইলেই ইচ্ছামত বেঁকে-পেচিয়ে থাকতে পারে না। বরং এ তত্ত্বে অন্তর্বর্তী জগতের এসব মাত্রাসমূহের প্যাচ নিয়ন্ত্রিত হয় কিছু গাণিতিক সূত্র মেনে। অন্তর্বর্তী জগতের আকার-আকৃতিই বিভিন্ন ভৌত ধ্রুবক, যেমন ইলেক্ট্রনের চার্জ ও মৌলিক কণিকা সমূহের মিথস্ক্রিয়া, ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যভাবে বললে এটাই প্রকৃতির প্রকাশ্য নিয়মগুলো নিয়ন্ত্রন করে। এখানে “প্রকাশ্য নিয়ম” বলতে চারটি মৌলিক বল এবং প্রকৃতির অন্যান্য চলক, যেমন কোনো মৌলিক কণিকার ভর, আধান ইত্যাদির নিয়মগুলো বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু আরো মৌলিকতর নিয়ম হচ্ছে এম-তত্ত্বের নিজস্ব নিয়মগুলো, যাদের থেকে প্রকাশ্য নিয়মসমূহের উদ্ভব।

এম-তত্ত্বের নিয়মসমূহ থেকে তাই বিভিন্ন ধরনের ‘প্রকাশ্য নিয়ম’ সম্বলিত বিভিন্ন মহাবিশ্বের উদ্ভব হওয়ার সুযোগ থাকে। স্রেফ প্রতিটার নিজস্ব অন্তর্বর্তী জগত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পেচিয়ে থাকবে। এম-তত্ত্বের এমন সব সমাধান আছে যেখানে অন্তর্বর্তী জগতের প্যাচ বহু উপায়ে (আনুমানিক $১০^{৫০০}$) হতে পারে। অর্থাৎ এ তত্ত্ব মতে $১০^{৫০০}$ সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন মহাবিশ্ব সম্ভব যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব নিয়মাবলী আছে। এই সংখ্যাটা কত বড়, সে ধারণা পেতে এমন কোনো সত্ত্বা কল্পনা করুন যারা প্রতি এক মিলিসেকেন্ডে এম তত্ত্ব থেকে প্রাপ্ত একটি মহাবিশ্বের আইনসমূহ বিশ্লেষণ করে পারে। এই স্বত্তা যদি বিগ-ব্যাং এর সময় থেকে হিসাব শুরু করে তাহলে এত দিনে মাত্র $১০^{২০}$টি মহাবিশ্বকে বিশ্লেষণ করতে পারবে। তাও কোনো ধরনের কফি ব্রেক না নিয়ে।

বহু শতাব্দী আগে নিউটন দেখিয়েছিলেন গাণিতিক সূত্রাবলি কী চমৎকার সূক্ষ্মতায় পৃথিবী ও মহাকাশের বস্তুসমূহের গতিবিধি বর্ণনা করতে পারে। বিজ্ঞানীরা সেই থেকে ভাবতেন, সমগ্র মহাবিশ্বের ভবিষ্যতই হিসাব করে ফেলা যাবে, শুধু যদি আমাদের সঠিক তত্ত্বটা জানা থাকে আর থাকে যথেষ্ট হিসাব করার ক্ষমতা। এরপর এলো কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা, বক্র জগৎ, কোয়ার্ক, স্ট্রিং এবং অতিরিক্ত মাত্রাসমূহ, আর এসব মিলে দেখা গেল সম্ভাব্য মহাবিশ্বের সংখ্যা হতে পারে প্রায় $১০^{৫০০}$ টি, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব প্রাকৃতিক নিয়মাবলী রয়েছে। এবং এসকল মহাবিশ্বের একটি হচ্ছে আমাদের এই জানা মহাবিশ্ব। পদার্থবিজ্ঞানীদের শুরুর সেই আশা, যে অল্প কিছু সহজ ব্যাপার ধরে নিয়ে একটা একক তত্ত্ব গঠন করা যাবে, যেটা মহাবিশ্বের সবকিছু ব্যাখ্যা করবে, সেটা হয়তো ছাড়তে হবে। তাহলে এ থেকে আমরা কোথায় পৌছাচ্ছি? এম-তত্ত্ব যদি $১০^{৫০০}$ সেট প্রকাশ্য নিয়ম এর জন্ম দেয় তার মধ্যে থেকে ঠিক এই সেট নিয়ে এই মহাবিশ্বে আমরা কীভাবে হাজির হলাম? এবং অন্য যেসব মহাবিশ্ব সম্ভব তাদেরই বা কী হল?

৬

আমাদের এই মহাবিশ্ব নির্বাচন

মধ্য আফ্রিকার বোসোঙ্গো জাতির লোকদের মতে, একদম আদিতে ছিলো শুধুই অন্ধকার, পানি এবং মহান ঈশ্বর বুমবা। একদিন বুমবা প্রচণ্ড পেটের ব্যাথা সইতে না পেরে বমি করে দিলেন, সৃষ্টি হলো সূর্যের। এরপর সূর্যের তাপে আস্তে আস্তে পানি শুকাতে লাগলো, দেখা গেলো ভূমি। কিন্তু বুমবার পেটব্যাথা তখনো সারেনি। তিনি আবারো বমি করতে লাগলেন, আর এভাবেই একে একে সৃষ্টি হলো, চাঁদ, তারকারাজি, পশু-পাখি: চিতা, কুমির, কচ্ছপ এবং সব শেষে মানুষ। সৃষ্টির আদি সম্পর্কে মেক্সিকো আর মধ্য আমেরিকার মায়াদের বিশ্বাসও একই রকম। তাদের মতে সৃষ্টির শুরুতে ছিলো শুধু সাগর, আকাশ আর মহান সৃষ্টিকর্তা। মায়ান কিংবদন্তি মতে, কেউ তার প্রসংশা করার নেই দেখে নাখোশ হয়ে সৃষ্টিকর্তা পৃথিবী, পাহাড়, গাছপালা আর বেশিরভাগ পশু-পাখি তৈরি করলেন। কিন্তু এসব পশুপাখি কথা বলতে পারতো না, তাই তিনি সৃষ্টি করলেন মানুষ। শুরুতে তিনি মানুষ বানালেন মাটি-কাদা দিয়ে। কিন্তু তারা উল্টা পাল্টা বলতে লাগলো। তিনি তাদের গলিয়ে ফেললেন এবং নতুন করে বানালেন, এবার কাঠ দিয়ে। কিন্তু এবারে এরা হলো কেমন যেন সাদামাটা। তিনি তাদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু তারা পালিয়ে গেল বনের মধ্যে। বনের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে গিয়ে তাদের যেসব শারীরিক ক্ষতি হলো তার ফলে তারা একটু বদলে বানরে পরিণত হলো। এইসব ঝক্কিঝামেলা শেষ হবার পরে মহান সৃষ্টিকর্তা এবার এমন এক ফর্মুলা তৈরি করলেন যেটা ঠিকঠাক কাজ করলো। এবার তিনি মানুষ বানালেন সাদা আর হলুদ ভুট্টা থেকে। এযুগে আমরা ভুট্টাদানা থেকে এলকোহল বানাই, কিন্তু এখনো মহান সৃষ্টিকর্তা থেকে পিছিয়ে আছি। কারণ যারা এসব এলকোহল পান করে, ভুট্টা দানা থেকে সেই বান্দাদের আমরা এখনো বানাতে সক্ষম হইনি।

আমরা এই বইয়ে যেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি এসব উপকথাও সেসব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রশ্নগুলো হচ্ছে, মহাবিশ্ব কেন আছে, এবং এটা ঠিক এইরকমই বা কেন? সেই প্রাচীন গ্রীকদের থেকে শুরু করে দিনে দিনে আমাদের এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে গত শতাব্দীতে। আগের কিছু অধ্যায়ের পটভূমিতে ভর করে আমরা এখন এ সব প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য উত্তর দিতে প্রস্তুত।

শুরু থেকেই একটা জিনিশ বেশ স্পষ্ট ছিলো যে, হয় মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে অতি সম্প্রতি অথবা মহাজাগতিক ইতিহাসের তুলনায় মানব জাতির অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে এই মাত্র। কারণ মানবজাতি জ্ঞানে বিজ্ঞানে এত দ্রুত এগিয়েছে যে তারা যদি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে অস্তিত্বশীল হত তাহলে এতদিনে তাদের কর্তৃত্ব আরো বহুদূর বিস্তৃত থাকতো।

আদি বাইবেল অনুযায়ী ঈশ্বর আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন সৃষ্টির ছয়দিনের মাথায়। বিশপ উসার যিনি ১৬২৫ থেকে ১৬৫৬ পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের আর্চবিশপ ছিলেন তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টির দিন–তারিখও বাতলে দিয়েছিলেন। তার মতে সৃষ্টির শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৭শে অক্টোবর। এবিষয়ে আমদের দৃষ্টিভঙ্গি একটু আলাদা। সেটা হচ্ছে- এটা ঠিক যে মানব জাতি তুলনামুলক ভাবে নতুন সৃষ্টি, কিন্তু মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিলো বেশ আগে। এর বয়স প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর।

মহাবিশ্বের যে একটা নির্দিষ্ট সূচনা আছে তার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মেলে ১৯২০ সালের দিকে। এর আগে, যেমনটা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি, বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই মনে করতেন মহাবিশ্ব স্থিতিশীল এবং এটা চিরকাল এরকমই আছে। এর বিপরীতে পরোক্ষ প্রমাণগুলো এসেছিলো, এডউইন হাবলের পর্যবেক্ষণ থেকে। তিনি একটি ১০০ ইঞ্চি টেলিস্কোপ ব্যবহার করে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডোনার পাহাড় চূড়া থেকে কিছু পর্যবেক্ষন করেন। সে সময় বিভিন্ন গ্যালাক্সি থেকে বিকিরিত আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে হাবল সিদ্ধান্তে পৌছান যে এরা সবাই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি আরো লক্ষ্য করেন, যে গ্যালাক্সি যত দূর, সেটির দূরে সরে যাওয়ার গতিও তত বেশি। ১৯২৯ সালে তিনি একটি সূত্র প্রকাশ করেন, যে সূত্রে গ্যালাক্সির দূরত্বের সাথে সেটির সরে যাওয়ার হারের সম্পর্ক নির্ণিত হয়, এবং উপসংহার টানেন যে মহাবিশ্ব প্রসারণশীল। এখন এটা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চই অতীতে মহাবিশ্ব এখনকার চেয়ে ছোটো ছিলো। তার মানে, আমরা যদি দূর অতীতের কথা কল্পনা করি, তাহলে নিশ্চই তখন মহাবিশ্বের সবকিছু খুবই ক্ষুদ্র একটা জায়গায় অকল্পনীয় ঘণত্ব ও তাপমাত্রা নিয়ে আবদ্ধ ছিলো। এবং এভাবে আমরা যদি যথেষ্ট অতীতের কথা ভাবি তাহলে দেখব এমন একটা সময় নিশ্চই আছে যখন এর সবকিছুর সূচনা হয়েছে। এই সূচনালগ্নকেই বলা হয় বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ।

এই যে ধারণা যে মহাবিশ্ব প্রসারনশীল, এতে কিছু সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যখন নিজের বাড়িকে আকারে বাড়াই তখন হয়তো একটা দেয়াল ভেঙ্গে সেখানে একটা বাথরুম যোগ করি। হয়তো বাথরুম যেখানে হলো সেখানকার উঠানে আগে বড় একটা ওক গাছ ছিলো। বাড়ি প্রসারিত করতে গিয়ে সেই গাছটা পড়লো কাটা। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের সময় তার সীমানা বাড়ার বদলে তার মধ্যকার সবগুলো বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব বাড়ে। এই ধারণা প্রথম প্রস্তাব করা হয় ১৯৩০ সালের দিকে, এবং শুরুতেই একে প্রচুর বিতর্কের মুখে পড়তে হয়। ব্যাপারটাকে কল্পনা করতে ১৯৩১ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন চমৎকার একটা রূপকের প্রস্তাব করেন। এডিংটন পুরো মহাবিশ্বকে তুলোনা করেন একটি প্রসারনশীল বেলুনপৃষ্ঠের সাথে। এই চিত্র থেকে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় কেন দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলো কাছের গ্যালাক্সিগুলোর থেকে দ্রুত বেগে দূরে সরছে। যেমন এই বেলুনের ব্যাসার্ধ যদি প্রতি ঘন্টায় দ্বিগুণ হয় তাহলে বেলুনপৃষ্ঠের যেকোনো দুটি গ্যালাক্সির মধ্যকার দূরত্বও প্রতি ঘন্টায় দ্বিগুণ হবে। কোনো একটা সময়ে যদি দুইটি গ্যালাক্সির মধ্যকার দূরত্ব ১ ইঞ্চি হয় তাহলে এক ঘন্টা পরে তাদের মধ্যকার দূরত্ব হবে ২ ইঞ্চি। এবং আমরা মনে করব যে গ্যালাক্সি দুটি ঘন্টায় ১ ইঞ্চি হারে দূরে সরে গেছে। কিন্তু শুরুতে যদি গ্যালাক্সি দুটির মধ্যকার দূরত্ব হয় ২ ইঞ্চি তাহলে এক ঘন্টা পরে তাদের দূরত্ব হবে ৪ ইঞ্চি এবং আমাদের মনে হবে গ্যালাক্সি দুটি বুঝি ঘন্টায় ২ ইঞ্চি হারে দূরে সরে গেছে। হাবলও ঠিক এটাই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, যে গ্যালাক্সি যত বেশি দূরে তার দূরে সরে যাওয়ার হারও ততই বেশি।

এটা বোঝা জরুরী মহাবিশ্বের এই প্রসারণ বস্তু সমূহের আকারকে প্রভাবিত করে না। অর্থাৎ গ্যালাক্সি, তারা, আপেল, পরমাণু বা অন্যান্য যেসব বস্তু কোনো ধরণের পারস্পরিক বলের কারণে নিজ আকৃতিতে আটকে থাকে তাদের আকার অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ আমরা যদি বেলুন পৃষ্ঠের কোনো গ্যালাক্সিপুঞ্জকে একটা বৃত্ত একে আবদ্ধ করি, তাহলে দেখবো এই বৃত্তের আকার বাড়ছে না, যদিও বেলুনটি ফুলছে। যেহেতু গ্যালাক্সিপুঞ্জের গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের সাথে বিভিন্ন মহাকর্ষীয় বল দ্বারা আবদ্ধ সেহেতু বেলুন বাড়তে

থাকলেও এই বৃত্তের মধ্যকার গ্যালাক্সি সমূহের আকার ও বিন্যাস অপরিবর্তিত থাকবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা যে কোনো ধরণের বৃদ্ধি মাপতে পারবো শুধুমাত্র তখনই যদি আমাদের মাপকাঠিগুলো একই আকৃতি ধরে রাখে। সবকিছুই যদি মুক্তভাবে বাড়তো, তাহলে আমরা, আমাদের মাপকাঠি, আমাদের গবেষণাগার, এবং আর সব কিছুই একই হারে বাড়তে থাকতো এবং আমরা কোনো পার্থক্যই বুঝতাম না।
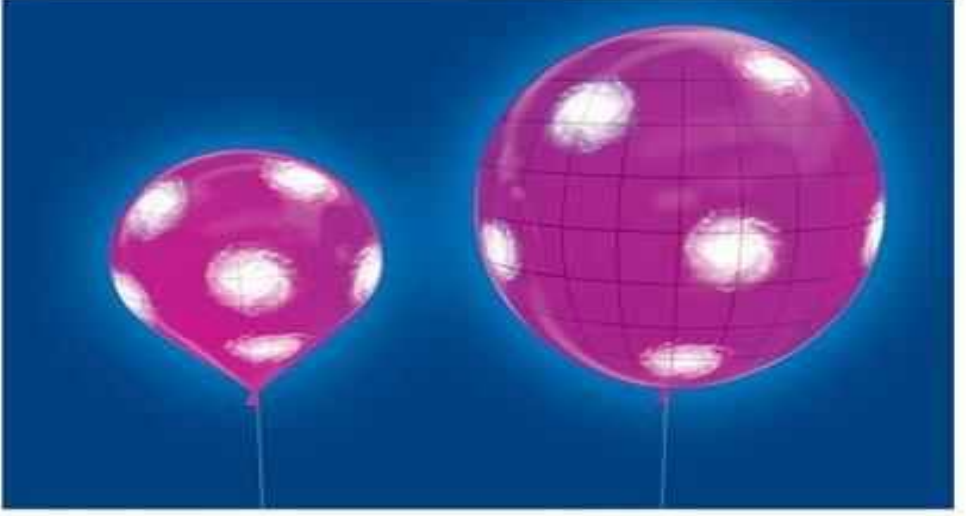
Balloon Universe Distant galaxies recede from us as if the cosmos were all on the surface of a giant balloon.

মহাবিশ্ব যে প্রসারিত হচ্ছে এটা আইনস্টাইনের জন্য ছিলো নতুন খবর। কিন্তু এ ধরণের প্রসারণের সম্ভাবনা তাত্বিক ভাবে এমনকি হাবলের পেপার প্রকাশিত হবারও কবছর আগেই প্রস্তাবিত হয়েছিলো। ১৯২২ সালে রাশিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান গাণিতিক হিসাবগুলোকে অনেকাংশে সহজ করার উদ্দেশে দুইটি অনুমিতি ধরে নিয়ে হিসাব করে দেখেন: কী হবে যদি মহাবিশ্ব সবদিকেই দেখতে একই রকম হয়, এবং যদি এটা সকল পর্যবেক্ষণ বিন্দু থেকেই দেখতে একই রকম হয়? ফ্রিডম্যানের প্রথম অনুমিতিটা যে পুরোপুরি সঠিক নয় সেটা আমরা জানি- কারণ সৌভাগ্যক্রমে মহাবিশ্ব সব দিকে একই রকম নয়! আমরা যদি উপরে এক দিকে তাকাই তাহলে হয়তো সূর্য দেখতে পাবো। অন্যদিকে তাকালে দেখব চাঁদ, আবার অন্য আরেকদিকে তাকালে হয়তো দেখবো একঝাক ভ্যাম্পায়ার বাদুড় উড়েচলেছে নতুন কোনো ঠিকানায়। অবশ্য মহাবিশ্বকে আরো বড় স্কেলে দেখলে সবদিকে প্রায় একই রকম দেখায়। কিন্তু সেই স্কেল হতে হবে গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও তুলনামুলক ভাবে বড়। ব্যাপারটা অনেকটা উপর থেকে বনভূমি দেখার মত। আপনি যদি খুব কাছে থেকে দেখেন তাহলে প্রতিটি পাতাই আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন বা অন্তত প্রতিটা গাছ আর গাছদের মধ্যকার দূরত্ব ঠিকই আলাদা করে বুঝতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি এতটা উচুতে থাকেন যেখান থেকে আপনার বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়েই এক বর্গমাইল বনভুমি ঢেকে ফেলা সম্ভব, তখন পুরো বনকে আপনার কাছে সবুজের একটা সমসত্ব সমারোহ মনে হবে। আমরা বলবো, এই স্কেলে বনভূমিটি সবদিকে অভিন্ন।

এই অনুমিতিগুলোর উপর ভর করে ফ্রিডম্যান আইনস্টাইনের সমীকরণগুলোর একটা সমাধান বের করতে সক্ষম হন যাতে দেখা যায় মহাবিশ্ব ঠিক সেভাবেই প্রসারনশীল, কিছুদিন পরে হাবল যে ধরণের প্রসারনশীলতা আবিষ্কার করবেন। আরো নির্দিষ্ট করে বললে ফ্রিডম্যানের রূপায়নে মহাবিশ্ব শূন্য থেকে শুরু করে বাড়তে থাকে যতক্ষণ না মহাকর্ষের প্রভাবে এর গতি হ্রাস পায়। এবং শেষমেষ এটা মহাকর্ষের ফলে আবারও সঙ্কুচিত হতে হতে নিজের উপরই নিজে মিলে যায়। (দেখা গেছে, আইনস্টাইনের সমীকরগুলোর আরো দুই ধরণের সমাধান সম্ভব যারা ফ্রিডম্যানের অনুমিতিদুটি সিদ্ধ করে। একটা সমাধানে মহাবিশ্ব বিরতিহীন ভাবে প্রসারিত হতেই থাকে, যদিও এর গতি কিছুটা কমে আসে মহাকর্ষের প্রভাবে। অন্য সমাধানে প্রসারণের হার কমতে কমতে শূন্যের দিকে ধাবিত হয় কিন্তু কখনই ঠিক শূন্যকে ছুঁতে পারে না।) ফ্রিডম্যান তার এই সমাধানটি বের করার কিছুদিন পরেই মারা যান। এবং হাবলের আবিষ্কারের আগে ফ্রিডম্যানের এই কাজ প্রায় অজানাই ছিলো। কিন্তু ১৯২৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক জর্জ লেমাইত্রে প্রস্তাব করেন: আপনি যদি মহাবিশ্বের ইতিহাসকে অতীতের দিকে অনুসরণ করতে থাকেন, তাহলে এটা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে যতক্ষণ না আপনি সৃষ্টির সেই মূহুর্তে গিয়ে পৌছাচ্ছেন- যাকে এখন আমরা বলি বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ।

বিগ ব্যাং-এর ধারণাটা সবাই পছন্দ করেননি। কেম্ব্রিজের জ্যোতির্পদার্থবিদ ফ্রেড হয়েল তো ১৯৪৯ সালে এই “বিগ ব্যাং” নামটাই দিয়েছিলেন এই ধারণাকে কিছুটা তাচ্ছিল্য করার জন্য। প্রথম যে সরাসরি পর্যবেক্ষণ এই ধারণাকে দৃড় ভিত্তি দিয়েছিলো সেটা আসে ১৯৬৫ সালে। সে সময় পুরো বিশ্বজুড়ে বিরাজমান ক্ষীণ মাইক্রোওয়েভ পটভূমি আবিষ্কৃত হয়। এই মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমির বিকিরণ বা CMBR আর আমাদের ব্যবহার্য মাইক্রোওয়েভ ওভেনে সৃষ্ট মাইক্রোয়েভ বিকিরণ একই। তবে CMBR বহুগুণে ক্ষীণ। আপনি নিজেও চাইলে এটা দেখতে পারেন, স্রেফ রিমোট টিপে অব্যবহৃত কোনো চ্যানেলে চলে যান, তারপর টিভিপর্দায় যে ঝিরঝির দেখবেন তার কিছু শতাংশ হচ্ছে এই CMBR এর ফলে। বেল ল্যাবের দুই বিজ্ঞানী তাদের মাইক্রোওয়েভ এ্যন্টেনা থেকে এই ঝিরঝির পুরোপুরি বাদ দিতে গিয়ে ঘটনাক্রমে CMBR আবিষ্কার করে ফেলেন। শুরুতে তাঁরা ভেবেছিলেন তাদের এ্যন্টেনায় কবুতরের বাসা বাঁধার করণে বুঝি এটা হচ্ছে। কিন্তু পরে দেখা গেলো এই সমস্যার উৎস আরো গভীর। CMBR রেডিয়েশন হচ্ছে বিগ ব্যাং এর একটু পরেই সেই আদি মহাবিশ্বের অতিউত্তপ্ত আর ঘন অবস্থায় সৃষ্ট বিকিরণের অবশিষ্টাংশ। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে এই বিকিরণ ঠান্ডা হতে হতে এখনকার এই ক্ষীণ অবস্থায় এসেছে। বর্তমানে এই মাইক্রোওয়েভ আপনার খাদ্যকে বড়জোর -২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা পরমশূন্য তাপমাত্রার মাত্র ৩ ডিগ্রি উপরে পর্যন্ত গরম করতে পারবে। বুঝতেই পারছেন, এ তাপে খৈভাঁজার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এটা ছাড়াও অন্যান্য আলামত পেয়েছেন যা সেই মহাবিস্ফোরণের সময়কার উত্তপ্ত আর ক্ষুদ্র আদি মহাবিশ্বের অবস্থাকে নির্দেশ করে। যেমন একদম শুরুর প্রথম মিনিট খানেক মহাবিশ্বের তাপমাত্রা যেকোনো নক্ষত্রের কেন্দ্রের চেয়েও বেশি ছিলো। সেসময় পুরো মহাবিশ্বই একটা নিউক্লিয়ার ফিউসন রিয়াক্টর এর মত কাজ করেছিলো। এ তত্বমতে মহাবিশ্ব পরবর্তীতে আরো প্রসারিত এবং যথেষ্ট পরিমানে ঠান্ডা হলে তখনকার মত এসব ফিউশন বিক্রিয়া থামে ফলে তখনকার মহাবিশ্বের গাঠনিক উপাদাহ হিসাবে

থাকে কেবল হাইড্রোজেন, সঙ্গে প্রায় ২৩ শতাংশ হিলিয়াম এবং কিছু লিথিয়াম (বাকি সব ভারী মৌল তৈরি হয়েছে পরে, তারকারাজির মধ্যে)। আমরা যে পরিমাণ হিলিয়াম, হাইড্রোজেন এবং লিথিয়াম পর্যবেক্ষণ করি তার সাথে তত্ত্বের হিসাব ভালোই মেলে।

হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা এবং CMBR এর উপস্থিতি আদি মহাবিশ্বের বিগ ব্যাং চিত্রের একটা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসাবে সুগৃহীত। অবশ্য বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ চিত্রকে শুরুর সময়ের একটা যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা হিসাবে গ্রহণ করা গেলেও, এটাকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে এমন ভাবা ভুল হবে যে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব মহাবিশ্বের 'উৎপত্তির' ঠিক ঠিক চিত্র আঁকছে। কারণ সাধারণ আপেক্ষিকতা মতে এমন একটা সময় ছিলো যখন তাপমাত্রা, ঘনত্ব, এবং মহাবিশ্বের বক্রতা ছিলো অসীম, গণিতবিদরা যে অবস্থাকে বলেন সিঙ্গুলারিটি বা অদ্বৈতবিন্দু। পদার্থবিদের কাছে এর অর্থ হচ্ছে এই সময় আইনস্টাইনের তত্ত্ব ভেঙ্গে পড়ে ফলে মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে অনুমানে একে ব্যবহার করা যাবে না, শুধু সূচনার পরের ঘটনাবলির উপর এ তত্ত্ব কাজ করে। তাই দেখা যাচ্ছে, যদিও সাধারণ আপেক্ষিকতার সমীকরণগুলো প্রয়োগ করে, এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য থেকে, আমরা মহাবিশ্বের প্রায় শুরুর দিককার ঘটনাবলী অনুমান করতে পারি, তবুও বিগ ব্যাং চিত্র ধরে এভাবে পিছাতে পিছাতে একদম শুরুতে চলে যাওয়া ঠিক হবে না।

আমরা মহাবিশ্বের উৎপত্তির আলোচনায় শিঘ্রই যাবো, তবে তার আগে মহাবিস্ফোরণের পরে যে প্রসারণ ঘটেছিলো তার প্রথম পর্যায় নিয়ে কিছু কথা। পদার্থবিজ্ঞানীরা এ প্রসারণকে বলেন ইনফ্লেশন বা স্ফিতি। আপনি যদি জিম্বাবুয়ের অধিবাসী না হন, যেখানে সাম্প্রতি মূদ্রাস্ফিতি ২০০,০০০,০০০ শতাংশকেও ছাড়িয়ে গেছে, তাহলে হয়তো স্ফিতি শব্দটা তেমন বিস্ফোরক শোনাবে না। কিন্তু একদম রয়েসয়ে করা অনুমান অনুযায়ীও মহাজাগতিক স্ফিতির সময় মহাবিশ্ব ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ গুণে স্ফিত হয়েছিলো মাত্র .০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ সেকেন্ডে। এ যেন একটা ১ সেন্টিমিটার ব্যাসের মূদ্রা হঠাৎ করে ফুলে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির দশ মিলিয়ন গুণ বড় হয়ে গেলো। শুনে মনে হতে পারে এতে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে, কারণ আমরা জানি কোনো কিছুই আলোর গতির চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না, কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ গতির এই সীমা স্থান-কালের নিজস্ব প্রসারণের উপর খাটে না।

এ ধরনের স্ফিতিপর্ব যে ঘটেছিলো সে ধারণা প্রথম প্রস্তাবিত হয় ১৯৮০ সালে। যার ভিত্তি ছিলো আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার সূত্রের চেয়েও গভীরে, কোয়ান্টাম তত্ত্বে। আমাদের হাতে যেহেতু এখনো মহাকর্ষের একটা পূর্ণাঙ্গ কোয়ান্টাম তত্ত্ব নেই, (এ তত্ত্বের খুঁটিনাটি নিয়ে এখনো কাজ চলছে,) তাই এই স্ফিতিপর্বে ঠিক কি ঘটেছিলো তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি নিশ্চিত নন। কিন্তু এ তত্ত্ব মতে জানা যায় সনাতন বিগ ব্যাং চিত্রে যেমন ধারণা করা হয় এই স্ফিতি সব দিকে সমান, আসলে তা নয়। এই ভিন্নতার ফলে বিভিন্ন দিকের CMBR এর তাপমাত্রার মধ্যে ইষৎ পার্থক্য দেখা যাওয়ার কথা। এসব পার্থক্য এতই ক্ষুদ্র যে ১৯৬০ সালের প্রযুক্তিতে সেটা ধরা সম্ভব ছিলো না কিন্তু ১৯৯২ সালে নাসার COBE স্যাটেলাইট এটা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। এবং পরে ২০০১ সালের উৎক্ষিপ্ত WMAP স্যাটেলাইট এটা পরিমাপ করতে সক্ষম হয়। এর ফলে এখন আমরা নিশ্চিত যে স্ফিতি আসলেই ঘটেছিলো।

মজার ব্যাপার হলো, যদিও CMBR এর ইষৎ পার্থক্যই মহাস্ফিতির প্রমাণ, কিন্তু যে কারণে ইনফ্লেশন এর ধারণা গুরত্বপূর্ণ সেটা হলো সব দিকেই CMBR এর তাপমাত্রায় প্রায় সুষমতা। আপনি যদি কোনো বস্তুর কোনো একটা অংশ পরিপার্শের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত করেন তারপর সেটাকে ওভাবে রেখে দিলে, দেখা যাবে ধীরে ধীরে সেই গরম স্থানটা ঠান্ডা হচ্ছে এবং তার পারিপার্শ গরম হচ্ছে যতক্ষণ না পুরো বস্তুর সব অংশের তাপমাত্রা আবার সুষম না হয়। একই ভাবে ভাবা যায় পুরো মহাবিশ্বের সব জায়গাতেও শেষমেষ একটা সুষম তাপমাত্রা থাকবে। কিন্তু এভাবে পরিচলন পদ্ধতিতে সুষম তাপমাত্রায় পৌছাতে সময় লাগে। যদি স্ফিতি না ঘটতো তাহলে এই মহাবিশ্বের এই সুবিশাল আয়তনের সব যায়গায় তাপমাত্রা সমান হবার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যেত না। (অবশ্য যদি ধরে নেওয়া হয় তাপের পরিচলন আলোর গতি দ্বারা সীমাবদ্ধ।) একটি দ্রুত আকস্মিক স্ফিতি (আলোর গতির চেয়েও অনেক দ্রুত) হয়ে থাকলে বোঝা যায় স্ফিতির আগে সেই অতিক্ষুদ্র প্রাগস্ফিতমহাবিশ্বে তাপমাত্রা সুষম বন্টন হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় ছিলো।

এক অর্থে মহাবিস্ফোরণের 'বিস্ফোরণ' কথাটা এসেছেই এই মহাস্ফিতি থেকে। এই স্ফিতি অবশ্য প্রচলিত সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ব থেকে পাওয়া হিসাবের চেয়েও অনেক বেশি তীব্র। সমস্যাটা হলো আমাদের এই তাত্বিক রূপায়ণগুলো প্রয়োগ করতে হলে মহাবিশ্বের আদি অবস্থা একটা বিশেষ ভাবে সাজাতে হয়, যেমনটা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। ফলে প্রচলিত মহাস্ফিতিতত্ব কিছু সমস্যার সমাধান দিলেও আরো কিছু জটিলতার সৃষ্টি করে যার একটা হচ্ছে- একটি বিশেষায়িত আদি অবস্থার প্রয়োজনীয়তা। আমরা মহাবিশ্বের সূচনা নিয়ে যে তত্বটি এখন আলোচনা করব সেটি শুরুর এই শূন্য সময়ের জটিলতা থেকে মুক্ত।

আমরা আগেই দেখেছি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ব সৃষ্টির শুরুর সময়ের উপর প্রয়োগ করা যায় না। তাই আমরা যদি মহাবিশ্বের উতৎপত্তির বর্ণনা করতে চাই তাহলে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্বকে আরো পূর্ণাঙ্গ কোনো তত্ব দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এমনকি সেই আদি অবস্থায়ই সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ব ভেঙ্গে না পড়লেও আরো পূর্ণাঙ্গ তত্বের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। কারণ আপেক্ষিকতার এই তত্ব অতিক্ষুদ্র বস্তুসমূহের উপর কাজ করে না, যার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় কোয়ান্টাম তত্ব। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বলেছিলাম বেশিরভাগ ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই মহাবিশ্বের বৃহৎ বস্তুসমূহের আলোচনায় কোয়ান্টাম তত্ব তেমন কাজে লাগে না। কারণ এটি প্রযুক্ত হয় প্রকৃতির আনুবিক্ষণীক ঘটনাবলীর উপরে। কিন্তু যথেষ্ট অতীতে যখন মহাবিশ্বের আকার ছিলো প্লাঙ্ক দৈর্ঘের সাথ তুলনীয়, যেটা এক সেন্টিমিটারের বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগের সমান, সেই ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্বকে অবশ্যই হিসাবে নিতে হবে। তাই যদিও আমরা এখনো কোয়ান্টাম মহাকর্ষের কোনো পূর্ণাঙ্গ তত্ব পাইনি তারপরও আমরা জানি মহাবিশ্বের সূচনা একটি কোয়ান্টাম ঘটনা। ফলে, আমরা যেভাবে কোয়ান্টাম তত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাকে বিশেষভাবে মিলিয়ে মহাস্ফিতির তত্ব নিরূপণ করেছি, সেভাবে যদি আরো অতীতে যাই এবং মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কেই জানতে চাই, তাহলেও অবশ্যই সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ব সম্পর্কে আমর যা কিছু জানি তার সাথে কোয়ান্টাম তত্বকে মেলাতে হবে।

ঘটনা তাহলে কী দাঁড়ালো সেটা বুঝতে আমাদের জানতে হবে কীভাবে মহাকর্ষ স্থান-কালকে বাঁকিয়ে ফেলে। স্থানের বক্রতা, কালের বক্রতার চেয়ে কল্পনা করা সহজ। মহাবিশ্বকে একটা সমতল বিলিয়ার্ড টেবিল হিসাবে কল্পনা করুন। দ্বিমাত্রিক জগতে এই টেবিলের তল একটি সমতল। আপনি যদি এই টেবিলের উপর একটি বল গড়িয়ে দেন তাহলে সেটা সরল পথে গড়িয়ে যেতে থাকবে। কিন্তু এই টেবিল যদি কোথাও বেঁকে যায় বা চাপে নিচু হয়ে কূপের মত গঠন করে যেমনটা নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে, তাহলে বলের গতিপথও বেঁকে যাবে।

Space Warp Matter and energy warp space, altering the paths of objects.

এই বিলিয়ার্ড টেবিল কিভাবে বেঁকে যাচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পারি কারণ এটি বাঁকাচ্ছে আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য একটি তৃতীয় মাত্রার দিকে। এদিকে, যেহেতু আমরা আমাদের নিজস্ব স্থান-কালের বাইরে যেতে পারি না, তাই এই স্থান-কালের বক্রতা কল্পনা করা আমাদের জন্য একটু কঠিন। কিন্তু এই জগৎ থেকে বের না হয়েও এর বক্রতা নির্ণয় করা সম্ভব। আপনার টেবিলের উপরে একটি আনুবীক্ষণিক পিঁপড়া কল্পনা করুন। যন্ত্র সহকারে বিভিন্ন বিন্দুর দূরত্ব পরিমাপ করে এই টেবিল থেকে বের না হয়েও পিঁপড়াটি পক্ষে টেবিলটার বক্রতা নির্ণয় করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ কোনো সমতলে অবস্থিত কোনো বৃত্তের পরিধি তার ব্যাসের তিনগুণের একটু বেশি হয় (আসলে হয় পাই (π) গুণ)। কিন্তু কোনো পিঁপড়া যদি চিত্রের টেবিলের উপর কূপের চারিদিকে আবদ্ধ একটি বৃত্তের ব্যাস বরাবর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে তাহলে দেখবে যতটা হওয়ার কথা ব্যাস তারচেয়ে বেশি। অর্থাৎ পরিধির একতৃতীয়াংশেরও বেশি। এমনকি, এই কূপ যদি যথেষ্ট গভীর হয় পিঁপড়াটি হয়তো দেখবে এর ব্যাস এর পরিধিরচেয়েও বেশি। একই ঘটনা ঘটে আমাদের মহাবিশ্বের স্থান-কালের বক্রতার ক্ষেত্রেও। ফলে মহাবিশ্বের বিভিন্ন বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব পরিবর্তিত হয়ে যায়, কখনো এটি বেড়ে যায়, আবার কখনো যায় কমে। এর ফলে স্থান-কালের জ্যামিতি, বা আকৃতি এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়, যেটা এই মহাবিশ্বের ভিতর থেকেই নির্ণয় করা

সম্ভব। সময়ের বক্রতাও একইভাবে সময়ের ব্যবধানগুলোকে টেনে লম্বা বা চেপে ছোটো করে ফেলে।
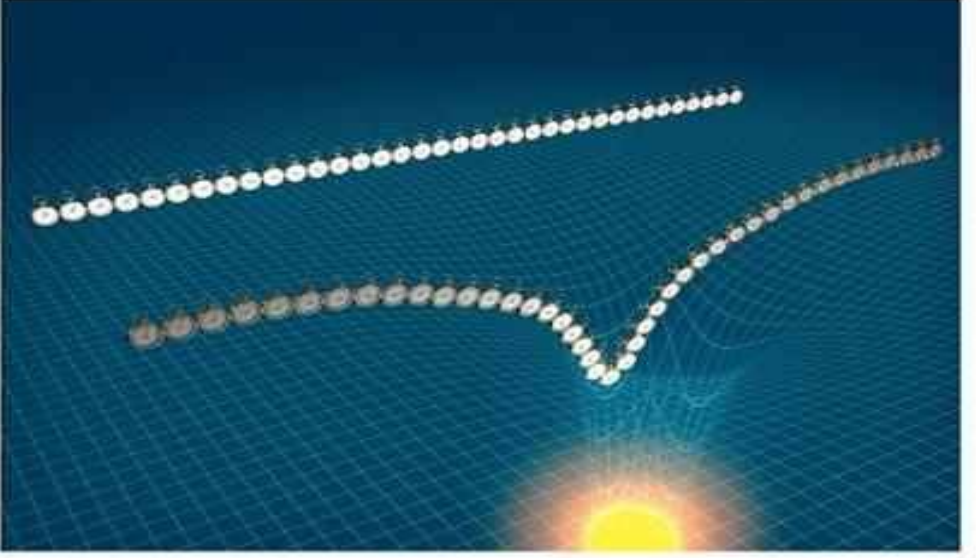
Space-time Warp *Matter and energy warp time and cause the time dimension to "mix" with the space dimensions.*

এসব ধারণাকে সঙ্গী করে চলুন এবার দেখি মহাবিশ্ব শুরু হলো কীভাবে। আমরা স্থান এবং কালকে আলাদাভাবে আলোচনা করতে পারি, যেমনটা একটু আগেই করলাম, যখন বস্তুসমূহের গতি হয় খুবই কম এবং ঐ স্থানের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রও হয় বেশ দূর্বল। সাধারণভাবে স্থান এবং কাল বেশ ভালো মতই জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকতে পারে ফলে তাদের সংকোচন বা প্রসারণও ঘটে মিলেমিশে। এই মিশ্রন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে বোঝার চাবিকাঠি।

সময়ের সূচনা অনেকটা মহাবিশ্বের সীমানার মত একটা ব্যাপার। যখন মানুষ ভাবতো পৃথিবী সমতল তখন অনেকেরই কৌতুহল ছিলো পৃথিবীর সীমানায় সমূদ্রগুলো উপচিয়ে পড়ে কি না। এটাকে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণ করা হয়েছে: কেউ যদি পুরো পৃথিবীই ঘুরে আসে তাহলেও সীমানার কাছে গিয়ে পড়ে যায় না। এই ব্যাপারটা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয় যখন তারা বোঝে যে পৃথিবী আসলে চ্যাপ্টা থালার মত নয়, বরং একটি বক্র তলের মতো। অবশ্য সময়কে ঠিকই একটা সোজা রেল লাইনের মত মনে হতে লাগলো। এর যদি কোনো সূচনা থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চই কেউ একজন (মানে ঈশ্বর) সেই রেলগাড়ি স্টার্ট করে দিয়েছে। যদিও আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সময় এবং স্থানকে মিলিয়ে স্থান-কাল এর ধারণা সৃষ্টি করে তারপরেও, সময়কে স্থানের থেকে আলাদা হিসাবে বিবেচনা করা হতে লাগলো। অর্থাৎ হয় এর একটা নির্দিষ্ট সূচনা ও সমাপ্তি আছে অথবা এটা অনন্ত। অবশ্য আমরা যদি আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সাথে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে মেলাই তাহলে দেখা যায় প্রান্তিক ক্ষেত্রে স্থানকালের বক্রতা এমন ব্যাপক ভাবে হতে পারে যে তখন সময় স্থানের স্রেফ আরেকটা মাত্রা হিসাবেই কাজ করে।

একদম আদি মহাবিশ্বে, যখন মহাবিশ্ব এতটাই ক্ষুদ্র ছিলো যে এর উপর কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উভয়েই কাজ করতো তখন আসলে মহাবিশ্বের চারটি মাত্রাই ছিলো স্থানের মাত্রা এবং কোনো সময়ের মাত্রা ছিলো না। এর অর্থ, আমরা যখন মহাবিশ্বের "সূচনা" সম্পর্কে বলি তখন একটা ব্যাপার এড়িয়ে যাই। সেটা হলো, তখন সময় বলতে আমরা যা বুঝি, তারই কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। এটা জানা থাকা প্রয়োজন যে, স্থান ও কাল নিয়ে আমাদের যে প্রচলিত ধারণা সেটা একদম আদি মহাবিশ্বের উপর খাটে না। অর্থাৎ সেটা আমাদের অভিজ্ঞতার উর্ধে, অবশ্য আমাদের কল্পনা এবং গণিতের উর্ধে নয়। এখন, আদি মহাবিশ্বে চারটি মাত্রাই যদি স্থানের মাত্রা হিসাবে কাজ করে তাহলে সময়ের সূচনা হলো কীভাবে?

এই যে ধারণা, যে সময়ও স্থানের আরেকটি মাত্রা হিসাবে আচরণ করতে পারে। সেখান থেকে আমরা সময়ের সূচনা বিষয়ক সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে পারি। ঠিক যেভাবে আমরা পৃথিবীর শেষ কোথায়' এই প্রশ্নকে কাটিয়ে উঠি। মনে করুন, মহাবিশ্বর সূচনা অনেকটা পৃথিবীর দক্ষিণমেরুর মতো। কেউ যখন সেখান থেকে উত্তর দিকে যেতে থাকে, তখন একই অক্ষাংশের বৃত্তও বড় হতে থাকে, যেটা মহাবিশ্বের আকার এবং স্ফিতি হিসাবে ভাবা যায়। তারমানে মহাবিশ্ব শুরু হয়েছে দক্ষিণমেরু তে, কিন্তু এই দক্ষিণ মেরুবিন্দু পৃথিবীপৃষ্ঠের আর যেকোনো বিন্দুর মতই।

ফলে মহাবিশ্বের সূচনার আগে কী ঘটেছিলো, এই প্রশ্নটাই অর্থ হীন হয়ে পড়ে। কারণ সেটা দক্ষিণ মেরুরও দক্ষিণে কী আছে, এই প্রশ্নের সমতুল। এই চিত্রে মহাবিশ্বের কোনো সীমানা নেই- প্রকৃতির যে আইন দক্ষিণ মেরুতে কাজ করে সেটা অন্য যেকোনো যায়গাতেই কাজ করবে। একই ভাবে, কোয়ান্টাম তত্ত্বে মহাবিশ্বের সূচনার আগে কী ঘটেছিলো, এই প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। ইতিহাসও যে সীমানাহীন একটা বদ্ধ তল হতে পারে এই ধারণাকে বলে সীমাহীনতার শর্ত।

শত শত বছর ধরে, এমনকি এরিস্টটলও বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্ব চিরকাল ঠিক এমনই ছিলো, যাতে কীভাবে এর শুরু হলো সেই প্রশ্ন এড়ানো যায়। অন্যরা বিশ্বাস করতো মহাবিশ্বের একটা সূচনা ছিলো, এবং এই সূচনাকে তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটা বড় নিদর্শন হিসাবে উপস্থাপন করতো। কিন্তু সময়, স্থানের মত আচরণ করতে পারে, এই ধারণা আরেকটি বিকল্প উপস্থাপন করেছে। যেটা মহাবিশ্বের সূচনা আছে কি নেই সেই চিরাচারিত বিতর্কের সমাপ্তি ঘটায়, এবং এটা নির্দেশ করে যে মহাবিশ্বের সূচনাও ঘটেছে বৈজ্ঞানিক সূত্র মেনেই। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সূচনাতে কোনো ঈশ্বরের সবকিছুকে ঠিকঠাক মত শুরু করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি যদি একটি কোয়ান্টাম ঘটনা হয় তাহলে নিশ্চই একে সকল বিকল্প ইতিহাসের ফাইনম্যানীয় যোগফল আকারে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। অবশ্য, পুরো মহাবিশ্বের উপরে কোয়ান্টাম তত্ত্ব খাটাতে গেলে, পর্যবেক্ষক নিজেও সেই পর্যবেক্ষীত ব্যবস্থার অংশ কি না, সেটা বিবেচনায় নেওয়াও গুরত্বপূর্ণ। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, পদার্থকণিকা দুইটি চিড়বিশিষ্ট একটি পর্দার দিকে ছুঁড়ে দিলে তারা পানির তরঙ্গের মত আচরণ করে। ফাইনম্যান দেখিয়েছেন এটা ঘটার কারণ, কণিকাদের কোনো একক ইতিহাস নেই। অর্থাৎ কোনো বিন্দু A থেকে বিন্দু B তে যেতে এরা কোনো নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ

করে না বরং দুইটি বিন্দুর সংযোকারী সম্ভাব্য সকল পথ দিয়েই যায়। এভাবে দেখলে এদের ব্যতিচার কোনো আজব ঘটনা নয়, কারণ এই রূপায়ণে একটি কণিকা একই সঙ্গে দুইটি চিড় দিয়ে পার হয়ে নিজেই নিজের সাথে ব্যতিচার ঘটাতে পারে। কোনো কণিকার কোনো বিন্দু থেকে শুরু করে একটি শেষ বিন্দুতে পৌছানোর সম্ভাব্যতা ফাইনম্যানীয় পদ্ধতিতে হিসাব করতে হলে কণিকাটি সম্ভাব্য যত উপায়ে এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে যেতে পারে তার সবগুলোকেই হিসাবে আনতে হবে। কেউ চাইলে এভাবে মহাবিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার পর্যবেক্ষণের সম্ভাব্যতাও হিসাব করতে পারে। এটা যদি পুরো মহাবিশ্বের উপরই প্রয়োগ করা হয় সে ক্ষেত্রে কোনো আদিবি ু A পাওয়া যায় না। ফলে আমরা সেইসব বিকল্প ইতিহাসকে হিসাবে আনি যারা সীমাহীনতার শর্ত সিদ্ধ করে এবং বর্তমান সময়ে যে মহাবিশ্ব আমরা পর্যবেক্ষণ করি সেখানে এসে শেষ হয়।

এভাবে দেখলে মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে স্বতস্ফূর্ত ভাবে, সম্ভাব্য সকল আদি অবস্থায়। যাদের একেকটা আদি অবস্থার ফলে একেক মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। যদিও এদের কিছু মহাবিশ্ব আমাদের মহাবিশ্বের মতই, কিন্তু বেশিরভাগই আমাদের মহাবিশ্ব থেকে একদমই আলাদা। মানে, এই পার্থক্য ঐসব মহাবিশ্বে এলভিস কম বয়সে মারা গিয়েছিলেন কি না, বা সেখানে শালগম কে সালাদ হিসাবে খাওয়া হয় কিনা, এমন টুকিটাকি বিষয়ে নয়। বরং তাদের প্রকৃতির প্রকাশ্য নিয়মাবলীই ভিন্ন। আসলে, এমন বহু মহাবিশ্ব আছে যাদের ভৌতবিধিসমূহও ভিন্ন ভিন্ন। অনেকে এই ধারণাকে মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্ব তত্ত্ব নাম দিয়ে অনেক রহস্য করে ফেলেন, কিন্তু এরা স্রেফ সকল বিকল্প ইতিহাসের উপর ফাইনম্যানীয় যোগফল ছাড়া কিছুই নয়।

ব্যাপারটাকে কল্পনা করতে এডিংটনের বেলুন চিত্রকে আসুন একটু পরিবর্তন করি। এবং বেলুনের বদলে প্রসারণশীল মহাবিশ্বসমূহকে বুদবুদের তল হিসাবে কল্পনা করি। মহাবিশ্বের স্বতস্ফুর্ত কোয়ান্টাম সৃষ্টিকে অনেকটা ফুটন্ত পানির ভিতরে স্বতস্ফুর্ত ভাবে বাষ্পের বুদবুদ সৃষ্টির সাথে তুলোনা করা চলে। অনেক ক্ষুদ্র বুদবুদ সৃষ্টি হয় আবার মিলিয়েও যায়। যেটাকে ক্ষুদ্র মহাবিশ্বের আনুবীক্ষণিক আকৃতিতে প্রসারিত হয়ে আবার সংকোচনের ফলে বিলুপ্ত হওয়ার সাথে তুলোনা করা চলে। এদেরকে বলে সম্ভাব্য বিকল্প মহাবিশ্ব, কিন্তু তারা খুব বেশি আগ্রহের বিষয় নয় কারণ এদের অস্তিত্ব এতই ক্ষণস্থায়ী যে বুদ্ধিমান সত্তা তো দূরের কথা, কোনো নিহারিকা বা নক্ষত্র সৃষ্টি হবার আগেই এরা শেষ হয়ে যায়। এই ক্ষুদ্র বুদবুদদের মধ্যে অল্প কিছু বুদবুদ যথেষ্ট বড় হয়ে যায় ফলে আর নিজেই সঙ্কুচিত হয়ে বিলুপ্ত হয় না। বরং এরা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে এবং একসময় বেশ বড় আকার ধারণ করে যাদের আমরা বাষ্পের বুদবুদ আকারে দেখি। এরা ওইসব মহাবিশ্বের সমতুল যারা চির-বর্ধনশীল হারে প্রসারিত হতে থাকে- অন্যভাবে বললে এরা হচ্ছে সেই মহাবিশ্ব যারা মহাস্ফিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

Multiverse Quantum fluctuations lead to the creation of tiny universes out of nothing. A few of these reach a critical size, then expand in an inflationary manner, forming galaxies, stars, and, in at least one case, beings like us.

আগেই যেমনটা বলেছি, মহাস্ফিতির ফলে ঘটা প্রসারণ একদম সুসম হবে না। সকল বিকল্প ইতিহাসের যোগের ধারায় শুধু মাত্র একটা সুষম এবং সুবিন্যস্ত ইতিহাস থাকবে যেটার সম্ভাব্যতা হবে সবচেয়ে বেশি, এছাড়াও কিছু ইতিহাস থাকবে যারা অল্পবিস্তর অবিন্যস্ত কিন্তু তাদের সম্ভাব্যতাও সর্বোচ্চের কাছাকাছি। এ থেকে ধরা হয় আদি মহাবিশ্ব পুরোপুরি সুষম ছিলো না, যেটা বোঝা যায় CMBR এর অল্পবিস্তর বিচ্যুতি থেকে। আদিমহাবিশ্বের এই অবিন্যস্ততা আমাদের জন্য ভালো। কেন? কারণ সুবিন্যস্ততা বা সমসত্বতা শুধু তখনই ভালো, যখন আপনি চান আপনার দুধে যেন সর না পড়ে। কিন্তু একটা সুবিন্যস্ত মহাবিশ্ব হয়ে যেতো একদমই একঘেয়ে। আদিমহাবিশ্বের এই অবিন্যস্ততা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে, যে কোনো অংশের ঘনত্ব যখন অন্য অংশের চেয়ে একটুও বেশি হয়ে যায়, তখন মহাকর্ষের ফলে এই বাড়তি ঘনত্ব ওই স্থানের প্রসারণ হার একটু হলেও কমিয়ে দেয়। আর এভাবেই মহাকর্ষ বল ধীরে ধীরে পদার্থকে টেনে নিয়ে চিপে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র এবং সেখান থেকে গ্রহ, এবং অন্তত একটা যায়গায় মানুষ গঠন করেছে। তাই চিত্রের মাইক্রোয়েভ আকাশটাকে খুব খেয়াল করে দেখুন। এটাই মহাবিশ্বের সকল স্থাপনার নীলনকশা। যেখানে আমরা হচ্ছি অতিপ্রাচীন কালে এই মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম বিক্ষিপ্ততার ফল। কেউ যদি ধার্মীক হয়, এসব দেখে সে বলতে পারে ঈশ্বর আসলেই পাশা খেলেন।
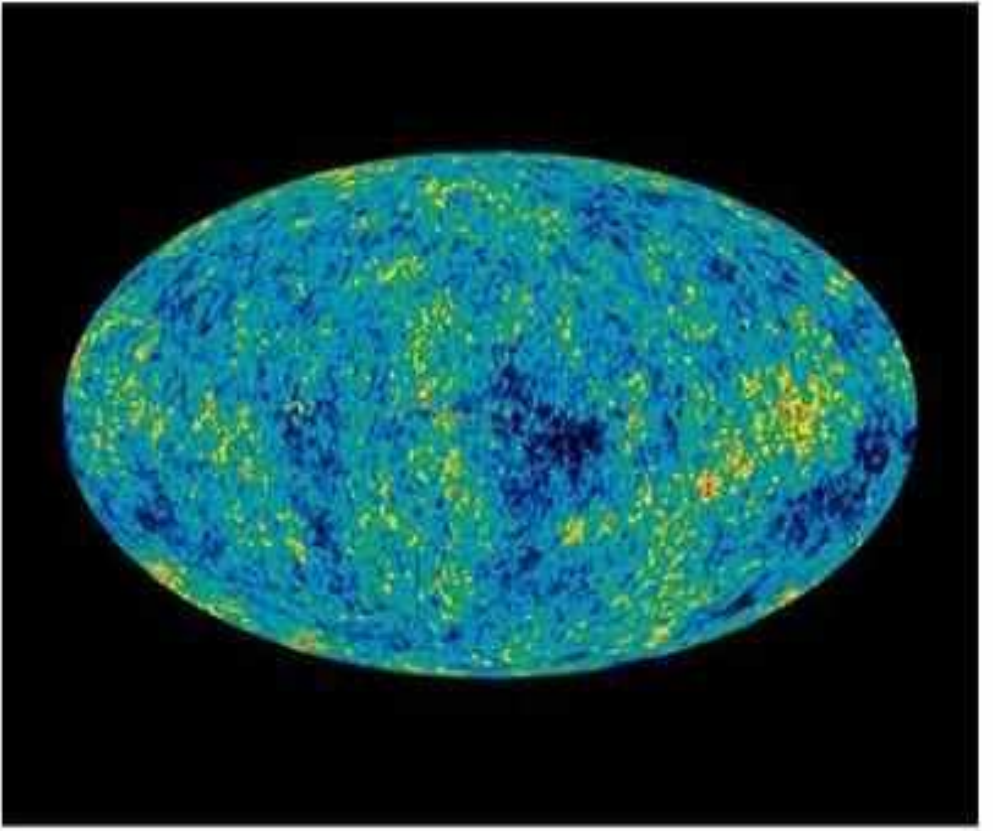
The Microwave Background This picture of the sky was created from seven years of WMAP data released in 2010. It reveals temperature fluctuations—shown as color differences—dating back 13.7 billion years. The fluctuations pictured correspond to temperature differences of less than a thousandth of a degree on the Centigrade scale. Yet they were the seeds that grew to become the galaxies. Credit: NASA/WMAP Science Team.

এ ধারণা মহাবিশ্ব সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করে তার সাথে প্রচলিত ধারণার গভীর পার্থক্য রয়েছে। এ ধারণা আমাদেরকে মহাবিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে। মহাজাগতিক কোনো ঘটনা হিসাবে তাই আমাদের বর্তমান সময়ে পুরো মহাবিশ্বের সবরকম সম্ভাব্য অবস্থার সম্ভাব্যতা গণনা করতে হয়। পদার্থবিজ্ঞানে সাধারণত কেউ একটা শুরুর অবস্থা ধরে নেয়, এর পর সংশ্লিষ্ঠ গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে পুরো সিস্টেমটা বা ব্যবস্থাটি সময়ের সাথে সাথে কীভাবে বিবর্তিত হবে সেটা গণনা করে। যদি দেওয়া থাকে যে এই সময়ে ব্যবস্থাটি এই অবস্থায় আছে, সেখান থেকে পরবর্তী কোনো সময়ে অন্য একটি অবস্থায় ব্যবস্থাটি থাকার সম্ভাব্যতা গণনা করা সম্ভব হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে সচরাচর ধরে নেওয়া হয় মহাবিশ্বের একটা একক নির্দিষ্ট ইতিহাস রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ব্যবহার করে কারো পক্ষে সময়ের সাথে এই ইতিহাস কিভাবে গঠিত হলো সেটা হিসাব করা সম্ভব। আমরা একে বলি জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার “বটম-আপ” প্রক্রিয়া। কিন্তু আমাদের

যেহেতু মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম প্রকৃতিকেও বিবেচনায় আনতে হবে, সেহেতু মহাবিশ্ব এখন একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকার সম্ভাব্যতার বিস্তার হিসাব করতে হলে এমন সকল ইতিহাসকেই হিসাবে নিতে হবে যারা সীমাহীনতার শর্ত পূরণ করে এবং বর্তমান অবস্থায় এসে শেষ হয়। অন্যভাবে বললে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে মহাবিশ্বের ইতিহাসকে বটম-আপ পদ্ধতিতে অনুসরণ করলে চলবে না, কারণ তাতে ধরে নেওয়া হয় মহাবিশ্বের একটি একক ইতিহাস আছে। অর্থাৎ কিনা, একটা সুনির্দিষ্ট শুরুর বিন্দু এবং ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তন রয়েছে। বরং, ইতিহাসকে অনুসরণ করতে হবে "টপ-ডাউন" পদ্ধতিতে, বর্তমান সময় থেকে পিছন দিকে। কিছু ইতিহাস থাকবে যাদের সম্ভাব্যতা অন্যদের চেয়ে বেশি। এবং এমন একটা ইতিহাসও থাকবে যেটির সম্ভাব্যতা ফাইনম্যানীয় যোগের ধারাটির অন্যান্য ইতিহাসকে ছাপিয়ে যায়। এই বিকল্প ইতিহাসটি সৃষ্টির শুরু থেকে আরম্ভ হয়ে যে অবস্থাটি বিবেচনা করা হচ্ছে সেখানে শেষ হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থার জন্য মহাবিশ্বের বিভিন্ন বিকল্প ইতিহাস থাকবে। এসব থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। ফাইনম্যানীয় যোগফলে অংশগ্রহনকারী ইতিহাসগুলোর প্রত্যেকের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, বরং কী পরিমাপ করা হচ্ছে, এরা তার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, আমরাই আমাদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা ইতিহাস তৈরি করি, উল্টোটা নয়।

এই ধারণা, যে মহাবিশ্বের কোনো পর্যবেক্ষক-অনির্ভর ইতিহাস নেই, শুনে মনে হতে পারে এটা আমাদের কিছু জানা সত্যের বিপরীতে যায়। হয়তো এমন একটা বিকল্প ইতিহাস আছে যেখানে চাঁদটা তৈরি হয়েছে রকফোর্ড পনির দিয়ে। কিন্তু ইঁদুরদের জন্য দুঃসংবাদ, যে আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি চাঁদ পনিরের তৈরি নয়। তাই, যে ইতিহাসে চাঁদ পনিরের তৈরি, আমাদের মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থার উপর, তার কোনো প্রভাব নেই, অবশ্য অন্য কোনো মহাবিশ্বে এর কোনো অবদান থাকতেই পারে। এটা শুনে কল্পবিজ্ঞান মনে হলেও আসলে তা নয়।

টপ-ডাউন পদ্ধতির একটা গুরুত্বপূর্ণ নিহিতার্থ হচ্ছে প্রকৃতির প্রকাশ্য নিয়মসমূহ মহাবিশ্বের ইতিহাসের উপর নির্ভর করে। অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন এমন কোনো একক তত্ত্ব আছে যেটা প্রকৃতির এইসব নিয়ম এবং অন্যান্য জানা ধ্রুবকসমূহ যেমন ইলেক্ট্রনের ভর বা স্থান-কালের মাত্রা এসব ব্যাখ্যা করে। কিন্ত টপ ডাউন জ্যোতির্বিদ্যা বলছে প্রকৃতির প্রকাশ্য নিয়মাগুলো একেক বিকল্প ইতিহাসের জন্য একেক রকম।

যেমন মহাবিশ্বের প্রকাশ্য মাত্রার কথাই ধরুন। M-তত্ত্ব মতে স্থান-কালের দশটি স্থানিক মাত্রা এবং একটি কালিক বা সময়ের মাত্রা রয়েছে। ধারণটা হলো, এদের সাতটি স্থানিক মাত্রা এত ক্ষুদ্রভাবে জড়িয়ে পেঁচিয়ে গুটি পাকিয়ে আছে যে আমরা তাদেরকে লক্ষ্য করি না। ফলে আমরা এই বিভ্রান্তিতে পড়ি যে স্থানের মাত্রা শুধুমাত্র আমাদের পরিচিত সেই বৃহৎ তিনটিই। এখনো পর্যন্ত M-তত্ত্বের একটা খোলা প্রশ্ন হচ্ছে, বৃহৎ মাত্রা কেন মাত্র তিনটি আর অন্যমাত্রাগুলোই বা কেন গুটি পাঁকিয়ে গেল? অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবেন, হয়তো এমন কোনো প্রক্রিয়া আছে যার ফলে স্বতস্ফুর্ত ভাবেই স্থানের মাত্রাগুলো গুটি পাঁকিয়ে যায়। আবার অন্যভাবে দেখলে হয়তো শুরুতে সব মাত্রাই গুটি পাকিয়ে ছিলো এবং পরে কোনো বোধগম্য কারণে এদের তিনটি মাত্রা প্যাঁচ খুলে বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। অন্যগুলো করেনি। কিন্তু এটা দেখা যায়, যে এমন কোনো কার্যকর কারণ নেই

যার ফলে মহাবিশ্বকে শুধুমাত্র চতুর্মাত্রিক হতে হবে। বরং, টপ-ডাউন জ্যোতির্বিদ্যা অনুমান করে বৃহৎ স্থানিক মাত্রাসমূহের সংখ্যা পদার্থবিজ্ঞানের কোনো নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বৃহৎ স্থানিক মাত্রা শূন্য থেকে শুরু করে দশের মধ্যে কয়টি হবে তার প্রত্যেকটিরই একটি কোয়ান্টাম সম্ভাব্যতা রয়েছে। ফাইনম্যানীয় যোগফল সম্ভাব্য সকল মহাবিশ্বের জন্যই এদের সবকটিকেই সমর্থন করে, কিন্তু আমরা যেহেতু পর্যবেক্ষণ করে ফেলেছি যে আমাদের মহাবিশ্বের বৃহৎমাত্রা সুধুমাত্র তিনটি। সেহেতু এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প ইতিহাস সমূহের সেই উপসেটটাকেই আমরা বেছে নিয়েছি যাদের ক্ষেত্রে এই পর্যবেক্ষণ খাটে। তাই এই মহাবিশ্বের বৃহৎ স্থানিক মাত্রা তিনের অধিক বা কম হওয়ার কোয়ান্টাম সম্ভাব্যতা থাকলেও সেগুলো এখন অপ্রাসংগিক। কারণ আমরা ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছি মহাবিশ্বের বৃহৎ স্থানিক মাত্রা তিনটি। তাই যতক্ষণ না তিনটি বৃহৎ মাত্রা পাওয়ার সম্ভাব্যতা একদম শূন্য না হচ্ছে, ততক্ষণ এর সাথে তুলনায় অন্য সংখ্যক বৃহৎ মাত্রা পাওয়ার সম্ভাব্যতা কত, তাতে কিছুই আসে যায় না। কারণ অতিক্ষুদ্র সম্ভাব্যতার ঘটনাও ঘটা সম্ভব। ব্যাপারটা, অনেকটা বর্তমান পোপ চৈনিক হবার সম্ভাব্যতা বিস্তার জানতে চাওয়ার মত হবে। আমরা জানি তিনি জার্মান, যদিও তার চৈনিক হওয়ার সম্ভাব্যতা বেশি কারণ পৃথিবীতে জার্মানের চেয়ে চৈনিকদের সংখ্যা বেশি। একইভাবে, আমরা জানি আমাদের মহাবিশ্বের বৃহৎ স্থানিক মাত্রা তিনটি। তাই যদি এই সংখ্যাটি তিন না হয়ে এর বেশি বা কম হওয়ার সম্ভাব্যতার বিস্তার অনেক বেশি হয়, তাহলেও আমরা শুধু মাত্র সেসব বিকল্প ইতিহাসই বিবেচনা করবো সেখানে এই মাত্রা তিন।

তাহলে সেই গুটিপাকানো মাত্রাগুলোর কী হলো? মনে করে দেখুন, M-তত্ত্বে বাকি গুটিপাকানো মাত্রাগুলো অন্তর্বর্তী জগতে ঠিক কী আকৃতি ধারণ করে আছে সেটাই বিভিন্ন ভৌত ধ্রুবকের মান – যেমন ইলেক্ট্রনের চার্জ- এবং মৌলিক কণিকাসমূহের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি- অর্থাৎ, প্রকৃতির বলসমূহ- নির্ধারণ করে। সবকিছুই একদম ফকফকা হয়ে যেতো যদি দেখা যেত M-তত্ব এই গুটিপাকানোর শুধু মাত্র একটি রূপ, বা অল্প কিছু সমর্থন করছে। যাদের থেকে একটা বাদে অন্য সবগুলোকে কোনোভাবে বাতিল করা যাচ্ছে, ফলে আমরা প্রকৃতির শুধুমাত্র একসেট প্রকাশ্য নিয়ম পাচ্ছি। কিন্তু, অন্তর্বর্তী জগত প্রায় ১০^{৫০০}টি ভিন্ন ভিন্ন রূপে থাকার সম্ভাব্যতার বিস্তার পাওয়া যায়, যাদের প্রত্যেকটার থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভৌত ধ্রুবকের সেট পাওয়া সম্ভব।

মহাবিশ্বের ইতিহাস যদি কেউ বটম আপ পদ্ধতিতে গঠন করে তাহলে এমন কোনো কারণ পাওয়া যায় না যার ফলে মহাবিশ্বের অন্তর্বর্তী জগতটা ঠিক এমনই হবে। এবং স্টান্ডার্ড মডেলে আমরা কণিকাসমূহের যেসব মিথস্ক্রিয়া দেখি মিথস্ক্রিয়াসমূহও ঠিক তেমনই হবে। কিন্তু টপ ডাউন পদ্ধতিতে আমরা ধরে নেই মহাবিশ্ব সবরকম সম্ভাব্য অন্তর্বর্তী জগৎ নিয়েই অস্তিত্বশীল। কোনো মহাবিশ্বে ইলেক্ট্রনের ভর গলফ বলের সমান, এবং হয়তো সেখানে মহাকর্ষ চৌম্বক বলের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। কিন্তু আমাদের মহাবিশ্ব স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ধ্রুবকসমূহ নিয়ে গঠিত। কেউ চাইলে, কোন ধরণের অন্তর্বর্তী জগৎ সীমাহীনতার শর্ত মেনে বর্তমানের স্টান্ডার্ড মডেলের জন্ম দেয় সেই সম্ভাব্যতার বিস্তার হিসাব করতে পারে। তিনটি বৃহৎ স্থানিক মাত্রার ক্ষেত্রে যেমন দেখেছিলাম, তেমনই এই সম্ভাব্যতা বিস্তার কত ছোটো তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি এই স্ট্যান্ডার্ড মডেল আমাদের মহাবিশ্বকে বর্ণনা করছে।

এই অধ্যায়ে আমরা যে তত্ব বর্ণনা করলাম সেটি পরীক্ষণযোগ্য। আগের উদাহরণগুলোতে আমরা দেখেছি, যে খুব বেশি ভিন্ন ধরণের মহাবিশ্বের, যেখানে হয়তো বৃহৎ স্থানিক মাত্রা সংখ্যা ভিন্ন, তুলনামূলক সম্ভাব্যতা কম না কি বেশি তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কাছকাছি ধরণের মহাবিশ্ব সমূহের সম্ভাব্যতার বিস্তারের গুরুত্ব আছে। সীমাহীনতার শর্ত মতে যে ইতিহাসে মহাবিশ্ব একেবারে সুবিন্যস্ত ভাবে শুরু হয় তার সম্ভাব্যতা সবচেয়ে বেশি। যে মহাবিশ্ব যত বেশি অবিন্যস্ত তার সম্ভাব্যতার বিস্তারও তত কম। এর অর্থ আদি মহাবিশ্ব প্রায় পুরোপুরি সুষম থাকার কথা, অল্পকিছু অবিন্যস্ততা বাদে। যেমন অবিন্যস্ততা আমরা আকাশের বিভিন্ন দিক থেকে আসা মাইক্রো ওয়েভের মধ্যে দেখেছি। মহাস্ফিতি তত্বের যা যা দাবি, এই পর্যবেক্ষণ তাদের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। অবশ্য এই টপ-ডাউন তত্বকে ভুল বা সঠিক প্রমাণ করতে আমাদের পরিমাপ কে আরো সূক্ষ্ম হতে হবে। যেটা ভবিষ্যতের কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে করা সম্ভব।

শতশত বছর আগে মানুষ ভেবেছিলো পৃথিবী বুঝি অনন্য সাধারণ কিছু, এবং এটা মহাবিশ্বের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত। এখন আমরা জানি আমাদের এই গ্যালাক্সিতেই শতশত বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে, যাদের অনেকেরই নিজস্ব গ্রহ আছে। এবং মহাবিশ্বে এরকম গ্যালাক্সিও আছে শতশত বিলিয়ন। আর এই অধ্যায়ে আলোচিত ফলাফল থেকে দেখা যায় আমাদের এই মহাবিশ্বটা এমন অনেক মহাবিশ্বের ভীড়ে একটা। এবং এই মহাবিশ্বে প্রকৃতির প্রকাশ্য নিয়মাবলীও অনন্য নয়। যারা আশা করেছিলেন যে এমন একটা সার্বিক তত্ব থাকবে যেখান থেকে আমাদের দৈনন্দিন পদার্থবিদ্যা স্বরূপ নির্ধারিত হবে তাদের জন্য এটা দুঃসংবাদ। আমরা বৃহৎ স্থানিক মাত্রার সংখ্যা বা অন্তর্বর্তী জগতের আকৃতি, যেটা অন্যান্য ভৌত ধ্রুবকের মান (যেমন ইলেক্ট্রনের ও অন্যান্য কণিকার ভর ও আধান) নির্ধারণ করে, অনুমান করতে পারি না। বরং এসব সংখ্যা থেকে আমরা কোন কোন বিকল্প ইতিহাস ফাইনম্যান যোগফলে অংশ নেবে সেটা নির্ধারণ করি।

মনে হচ্ছে আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন এক ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌছেছি যখন লক্ষ্য সম্পর্কে এবং ভৌত তত্ব কখন গ্রহণযোগ্য হয় সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলাতে হবে। দেখা যাচ্ছে, মৌলিক ধ্রুবকসমূহের মান, এবং এমনকি প্রকৃতির প্রকাশ্য নিয়ম সমূহের স্বরূপও, কোনো যৌক্তিক কারণ বা ভৌতবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এসব ধ্রুবক এবং এসব ভৌতবিধি মুক্ত ভাবে যেকোনো মান ও স্বরূপ ধারণ করতে পারে, যতক্ষণ তারা মিলে একটি সুসংহত গাণিতিক তত্ব তৈরি হয়। এতে অবশ্য আমাদের নিজেকে ‘বিশেষ কিছু’ ভাবার মানবীয় চাহিদা, বা এমন কোনো তত্ব আবিষ্কার করে ফেলার আশা যেটা পদার্থবিজ্ঞানের সকল আইন ধারণ করবে তা পূরণ হয় না। কিন্তু কী আর করা, প্রকৃতি এমনই।

দেখা যাচ্ছে, সম্ভাব্য মহাবিশ্বসমূহের এক বিশাল চারণভূমি রয়েছে। অবশ্য, আমরা পরের অধ্যায়েই দেখবো, এদের মধ্যে যেসব মহাবিশ্বে আমাদের মত জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব তারা রীতিমত দূর্লভ। আমরা এমন এক মহাবিশ্বে বাস করি যেখানে জীবন সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এটা যদি একটু সূক্ষ্ম ভাবেও আলাদা হতো, তাহলেও আমাদের মত স্বত্তা এখানে টিকতো না। এই যে সূক্ষ্ম-সমন্বয় এ থেকে আমরা কী বুঝি? এতে কি প্রমাণিত হয় যে মহাবিশ্ব আসলে কোনো দয়াময় সৃষ্টিকর্তার মহান নকশায় তৈরি? নাকি বিজ্ঞান আমাদের অন্য কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে?

৭

দৃশ্যত অলৌকিক

চৈনিক উপকথায় আছে, হিসা সম্রাটদের রাজত্বকালে (খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ২২০৫ - ১৭৮২) একদিন আমাদের এই মহাজাগতিক পরিবেশ ওলট পালট হয়ে গেলো। হঠাৎ করেই আকাশে দেখা যেতে লাগলো দশটা সূর্য। তাদের তাপে মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই। এসব দেখে সম্রাট এক বিখ্যাত তীরন্দাজকে বললেন সে যেন অতিরিক্ত সূর্যগুলোকে তীর মেরে ধ্বংস করে ফেলে। বিনিময়ে তীরন্দাজকে দেওয়া হলো অমরত্বের বটিকা। কিন্তু তীরন্দাজের স্ত্রী সেই বটিকা চুরি করে। পরে সেই অপরাধে তাকে (স্ত্রীকে) নির্বাসন দেওয়া হয় চাঁদে।

দশ সূর্যের একটা সৌরজগৎ যে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী হতে পারে না, সে ব্যাপারে চায়নিজদের ধারণা সঠিক ছিলো। এখন আমরা জানি যে, বাড়তি সূর্য থাকলে ট্যানিং (সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে রোদে পুড়ে বাদামি হওয়া) এর সুযোগ যতই বাড়ুক না কেন, এমন একটা সৌরজগতে জীবনের বিকাশ প্রায় অসম্ভব। এবং এর কারণ শুধুমাত্র চৈনিক উপকথায় কল্পিত সেই অসহনীয় গরম নয়। আসলে এমন গ্রহও থাকা সম্ভব যেটা একাধিক নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করার সময়ও বেশ সহনীয় তাপমাত্রায় থাকে। অন্তত বেশ কিছু সময় ধরে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে সুষম তাপমাত্রা, যেটা জীবনের বিকাশে প্রয়োজনীয়, থাকার সম্ভাবনা কম। কেন? সেটা বোঝার জন্য আসুন আমরা একদম সরলতম একটা বহুনক্ষত্রব্যবস্তা দেখি। এই ব্যবস্থায় সূর্য আছে দুইটা, ফলে এদেরকে বলে দ্বিমিক নক্ষত্রব্যবস্থা। আকাশে আমরা যত তারা দেখি তার প্রায় অর্ধেকই হচ্ছে এ ধরনের দ্বিমিক নক্ষত্র ব্যবস্থার সদস্য। নিচের চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, একদম সরলতম নক্ষত্রব্যবস্থাতেও স্থিতিশীল কক্ষপথ পাওয়া সম্ভব শুধুমাত্র কয়েক ভাবেই। এখন এসব কক্ষপথে কোনো গ্রহ থাকলেও দেখা যাবে কখনো সেই গ্রহটি অতিউত্তপ্ত আবার কখনো অতিশীতল হয়ে পড়ছে। ফলে সেখানে জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায় যদি দুটির বদলে একগুচ্ছ নক্ষত্র নিয়ে এই ব্যবস্থাটি গড়ে ওঠে।

আমাদের সৌরজগৎ বেশ “ভাগ্যবান” কারণ এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা না থাকলে এখানে জটিল জীবনের সূচনাই সম্ভব হতো না। যেমন নিউটনের সূত্র বলছে গ্রহসমূহের কক্ষপথ হবে, হয় বৃত্তাকার, না হয় উপবৃত্তাকার (উপবৃত্ত অনেকটা চ্যাপ্টা বৃত্তের মতো যেটার একদিক একটু লম্বাটে অন্য দিক একটু চাপা)। একটা উপবৃত্ত কতটা চ্যাপ্টা সেটা প্রকাশ করা হয় যে সংখ্যা দিয়ে তার নাম কেন্দ্রবিমূখীতা। এর মান থাকে শূন্য থেকে এক এর মধ্যে। কোনো উপবৃত্তের কেন্দ্রবিমূখীতা শূন্যের কাছাকাছি হলে বোঝা যায় এটি প্রায় একটা বৃত্তের মতো। অন্য দিকে কেন্দ্রবিমূখীতা একের কাছাকাছি হলে উপবৃত্তটি হয়ে পড়ে একেবারে চ্যাপ্টা। গ্রহসমূহ পুরোপুরি বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে না দেখে কেপলার বেশ মনকষ্টে ভুগেছিলেন। যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রবিমূখীতা ২ শতাংশ। মানে এর কক্ষপথ ঠিক বৃত্তাকার নয় তবে বৃত্তের কাছাকাছি। পরে দেখা গেছে, এ ব্যাপারটা আসলেই বিরাট সৌভাগ্যের।
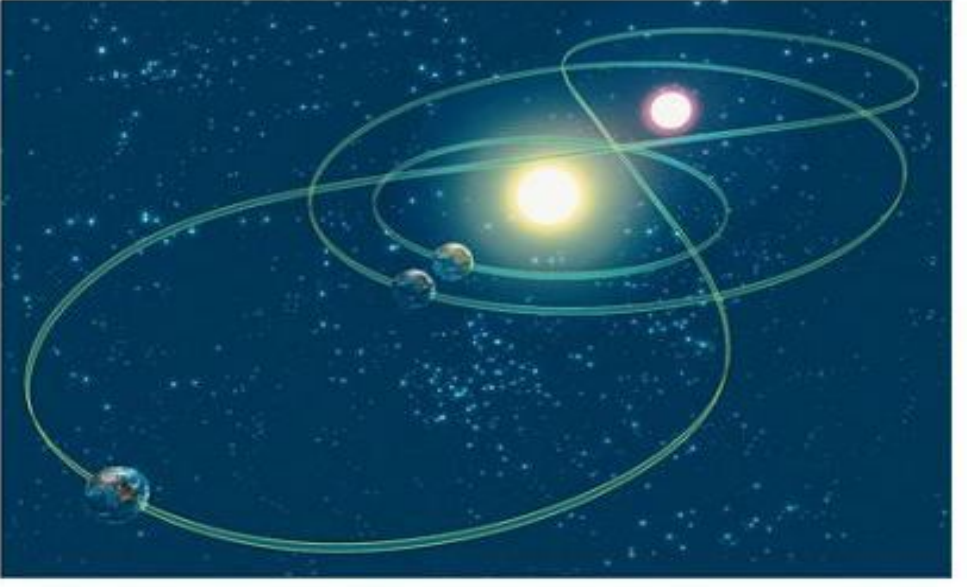
Binary Orbits Planets that orbit binary star systems will probably have inhospitable weather, in some seasons too hot for life, in others, too cold.

পৃথিবীতে মৌসুমি আবহাওয়ার যে ধারা, সেটা নির্ধারিত হয় পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর ঘূর্ণনের তলটি কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণনের তলের তুলনায় হেলে থাকার কারণে। যেমন শীতকালে উত্তর মেরু সূর্যের থেকে দূরে হেলে থাকে। যদিও এসময় পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে – ৯১.৫ মিলিয়ন মাইল, যেখানে জুলাইয়ের দিকে দূরত্ব হয় ৯৪.৫ মিলিয়ন মাইল- তারপরও সেই দূরত্ব ব্ররদ্ধির চেয়ে এই কাত হয়ে থাকার প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে সব গ্রহের কক্ষপথের কেন্দ্রবিমূখীতা অনেক বেশি তাদের ক্ষেত্রে সূর্য থেকে দূরত্বের এই হ্রাস-বৃদ্ধির প্রভাবও অনেক বেশি। যেমন, বুধ গ্রহের কেন্দ্রবিমূখীতা ২০ শতাংশ হওয়ায়, গ্রহটি যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে (পেরিহেলিওন) সে সময়কার তাপমাত্রা, যখন সবচেয়ে দূরে থাকে (এপিহেলিয়ন) তার চেয়ে ২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটেরও বেশি হয়। আবার ধরুন আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রবিমূখীতা যদি এক এর কাছাকাছি হতো তাহলে, কক্ষপথে সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে পৌছালে আমাদের সব সমূদ্র টগবগ করে ফুটতো আবার দূরতম বিন্দুতে গেলে তারা জমে একেবারে বরফ হয়ে যেত। অর্থাৎ আমাদের শীতের ছুটি বা গ্রীষ্মের ছুটি কোনোটাই আরামে কাটতো না। ফলে দেখা যাচ্ছে, কক্ষপথের খুব বেশি কেন্দ্রবিমূখীতা জীবন বিকাশে সহায়ক নয়। তাই আমরা বেশ ভাগ্যবান যে আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রবিমূখীতা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি।
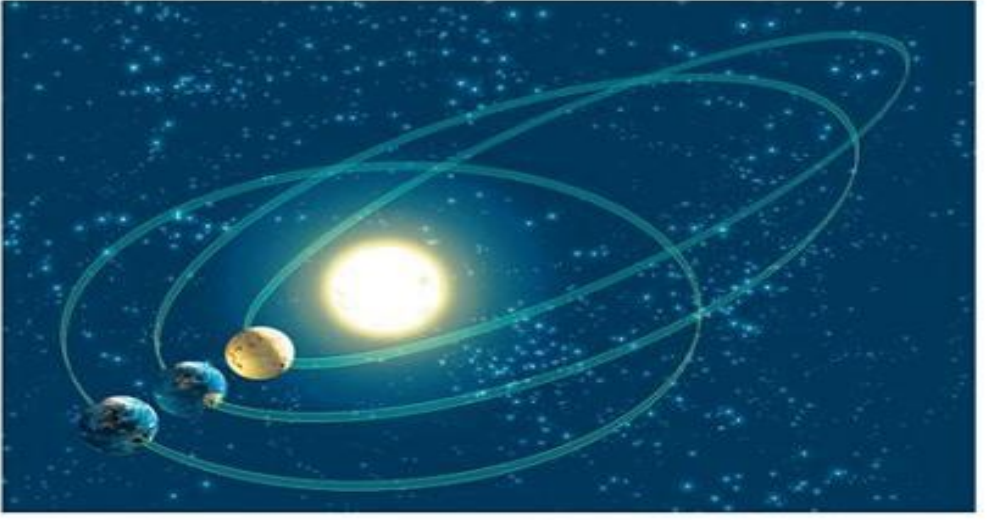
Eccentricities Eccentricity is a measure of how near an ellipse is to a circle. Circular orbits are friendly to life, while very elongated orbits result in large seasonal temperature fluctuations.

আমাদের সূর্যের ভর এবং তা থেকে আমাদের দূরত্বের হিসাবেও আমরা বেশ ভাগ্যবান। কারণ একটা নক্ষত্রের ভর থেকেই আসলে নির্ধারিত হয় কী পরিমান শক্তি এটা বিকিরিত করে। সবচেয়ে বড় নক্ষত্র আমাদের সূর্যের প্রায় একশ গুণ ভারীও হতে পারে, আবার সবচেয়ে ছোটো নক্ষত্র হতে পারে আমাদের সূর্যের ভরের প্রায় একশ ভাগের একভাগের সমান। আবার সূর্য থেকে পৃথিবীর যে দূরত্ব, তাতে সূর্যের ভর যদি ২০ শতাংশও কম বা বেশি হতো তাহলে পৃথিবী হয় মঙ্গলের চেয়েও শীতল হয়ে যেত, অথবা হতো বুধের চেয়েও উত্তপ্ত।

বিজ্ঞানীরা যে কোনো নক্ষত্রের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে একটা সংকীর্ণ স্থান সংজ্ঞায়ীত করেন বাসযোগ্য হিসাবে। এ স্থানের তাপমাত্রা এমন হয় যেন এখানে পানি তরল অবস্থায় থাকতে পারে। এই বাসযোগ্য জায়গাকে অনেকসময় বিজ্ঞানীরা “গোল্ডিলক’স জোন” বলেন। কারণ বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় তরল পানি এখানেই থাকা সম্ভব, যে কারণে এখানকার তাপমাত্রাকে বলা হয় “একদম ঠিকঠিক”। আমাদের সৌরজগতের এই বাসযোগ্য জায়গা একেবারেই সরু। কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো আমাদের এই পৃথিবী ঠিক সেই অংশেই পড়েছে।
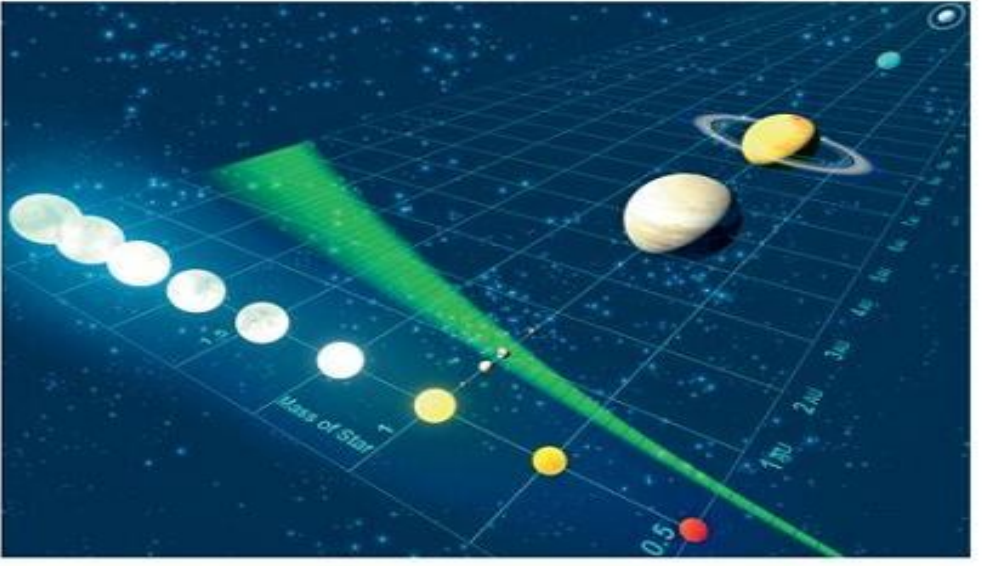
Goldilocks Zone If Goldilocks were sampling planets, she'd find only those within the green zone suitable for life. The yellow star represents our own sun. The whiter stars are larger and hotter, the redder ones smaller and cooler. Planets closer to their suns than the green zone would be too hot for life, and planets beyond it too cold. The size of the hospitable zone is smaller for cooler stars.

নিউটন বিশ্বাস করতেন আমাদের এই অদ্ভুত ভাবে বাসযোগ্য সৌরজগৎ "বিক্ষিপ্ততা থেকে এমনি এমনিই শুধু প্রকৃতির নিয়ম মেনেই উদ্ভুত হয় নি"। বরং তিনি বলেছিলেন, মহাবিশ্বের এই সুসংগততা "ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, এবং শুরু করে দেবার পরে এখনো পর্যন্ত তিনিই সক্রিয় ভাবে এই অবস্থা বজায় রেখেছেন।" এরকম ভাবার কারণ অবশ্য সহজেই অনুমেয়।যদি পুরো মহাবিশ্বে আমাদের সৌরজগতটাই একমাত্র জগৎ মনে করা হয় তাহলে এই যে এত এত প্রায় অসম্ভব কাকতাল মিলে আমাদের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তুলেছে, আমাদের বিশ্বকে করেছে মনুষ্যবান্ধব, তা দেখে সত্যিই মনে ধাঁধার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ১৯৯২ সালে প্রথম একটা গ্রহের অস্তিত্ব নিশ্চিত হয় যেটা আমাদের সূর্য ব্যতীত অন্য একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। এখন আমরা এমন হাজারটা গ্রহের কথা জানি। এবং এ নিয়ে কারো দ্বিধা নেই যে মহাবিশ্বের বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্রের মধ্যে এমন গ্রহ আছে আরো অসংখ্য। ফলে আমাদের গ্রহ ব্যবস্থার এইসব কাকতাল- একক সূর্য, সৌরভর এবং সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের দৈব সমন্বয়- এগুলো পৃথিবীকে যে শুধুমাত্র মানুষের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, তার প্রমাণ হিসাবে জোর হারিয়েছে। এখন আমরা জানি সব ধরনের গ্রহই আছে। তাদের কোনো কোনোটাতে–অন্তত একটাতে তো নিশ্চিত- জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব। আর এটাতো বোঝাই যায়, কোনো গ্রহের কোনো সত্ত্বা যখন তার চারপাশের জগৎকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে, তখন দেখবে যে সেটা ঠিক ঠিক তাদের জীবনের অস্তিত্বের উপযোগী।

শেষের এই কথাটাকে একটা বৈজ্ঞানিক নীতিতে পরিণত করা সম্ভব: আমাদের অস্তিত্ব নিজেই, কখন এবং কোন অবস্থান থেকে আমাদের পক্ষে মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, সেটা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, আমাদের সত্ত্বার অস্তিত্বই, আমরা নিজেদেরকে কী ধরনের

পরিবেশের মধ্যে খুঁজে পাবো, তার নির্ধারক। এ নীতিকে বলে দুর্বল নৃকেন্দ্রীকতার নীতি। (একটু পরেই আমরা দেখবো কেন একে "দুর্বল" বলা হচ্ছে।) "নৃকেন্দ্রীকতার নীতির" বদলে আরো ভালো হতো যদি বলা হতো "নির্বাচণ নীতি", কারণ এ নীতিতে কীভাবে আমাদের স্বীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞানই সম্ভাব্য সকল অবস্থার মধ্য থেকে সেই সব অবস্থাকে বাছাই করে ফেলছে যেখানে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব, সেটাই বলা হয়।

এসব শুনতে দর্শনের মত মনে হলেও, দুর্বল নৃকেন্দ্রীকতার নীতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক অনুমান করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, যে প্রশ্নের উত্তরে এ নীতির প্রয়োগ হয়েছে সেটা হচ্ছে, মহাবিশ্বের বয়স কত? একটু পরেই আমরা দেখবো, আমাদের অস্তিত্বের জন্য যেসব মৌল দরকার তার একটা হচ্ছে কার্বন, যা তৈরি হয় নক্ষত্রের মধ্যে আরো হালকা মৌলসমূহ রান্না হয়ে। এই কার্বন পরে সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয়ে নক্ষত্র থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে, এবং পরে ঠান্ডা হয়ে নতুন প্রজন্মের কোনো সৌরজগতের কোনো গ্রহে হাজির হয়। ১৯৬১ সালে পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট ডাইক যুক্তি দেখান যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর প্রয়োজন। তার মানে, মহাবিশ্বের বয়স অন্তত অত বছর হবেই। আবার মহাবিশ্ব ১০ বিলিয়ন বছরের চেয়ে খুব পুরাতন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ তাহলে নক্ষত্রসমূহের সব জ্বালানী শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ওদিকে আমাদের অস্তিত্বের জন্য উত্তপ্ত নক্ষত্রমন্ডলীর প্রয়োজন। অতএব, মহাবিশ্বের বয়স নিশ্চই প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর। এই হিসাব একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ নয়, তবে কাছাকাছি। বর্তমান তথ্য-উপাত্ত মতে বিগ ব্যাং হয়েছিলো আজ থেকে ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে।

মহাবিশ্বের বয়সের ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখলাম, নৃকেন্দ্রীক নীতির সাহায্যে কোনো ভৌত চলকের সুনির্দিষ্ট মান পাওয়া না গেলেও, বিভিন্ন সম্ভাব্য মানের একটা বিস্তার পাওয়া যায়। কারণ আমাদের অস্তিত্ব অনেক সময় কোনো চলকের একেবারে সুনির্দিষ্ট মানের উপর নির্ভর করে না, বরং সেসব চলকের যে মান আমরা দেখি তার কাছাকাছি কিছু থাকলেও চলে। এ ছাড়াও দেখা যায়, আমাদের জগৎ-এর অবস্থা নৃকেন্দ্রীকতার নীতি থেকে প্রাপ্ত সীমার মধ্যে পড়াটা আহমারি কিছু নয়। ব্যাখ্যা করে বললে, ধরুন কক্ষপথের কেন্দ্রবিমূখীতা শূন্য থেকে ০.৫ মধ্যে হলে সেটা জীবনের উপযোগী। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিমূখীতার মান ০.১ দেখে খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ সম্ভবত মহাবিশ্বের সকল গ্রহের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রহ পাওয়া যাবে যাদের কেন্দ্রবিমূখীতা এরকম ছোটো। কিন্তু যদি দেখা যেত পৃথিবীর কক্ষপথ পুরোপুরী বৃত্তাকার, অর্থাৎ যদি দেখা যেতো এর কেন্দ্রবিমূখীতা, ধরা যাক, ০.০০০০০০০০০০০১ তাহলে সত্যিই সেটা হতো একেবারে বিশেষ কোনো ব্যাপার। এবং তখন আমরা প্রশ্ন করতাম, কেন এই অদ্ভুত একটা গ্রহে আমরা বাস করছি। এ ধারণাকে অনেক সময় বলা হয় মধ্যমতার নীতি।

দৈবক্রমে গ্রহের কক্ষপথের আকার, সূর্যের ভর, এবং অন্যান্য চলকসমূহের যে মিলন আমরা দেখি সেটাকে পরিবেশোদ্ভুত আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ, এটার উদ্ভব হয়েছে আমাদের পারিপার্শের ঘটনাবলির দৈবসংযোগে, প্রকৃতির মৌলিক নিয়মসমূহের কোনো বিচ্যুতি থেকে নয়। আমাদের পরিমাপকৃত মহাবিশ্বের বয়সও এমন একটা পরিবেশোদ্ভুত চলক। কেন না, আমরা যে অবস্থান থেকে এ বয়স মাপি তার আগেও মহাবিশ্ব ছিলো, পরেও থাকবে কিন্তু আমরা বাস করব এই বর্তমান যুগে, কারণ মহাবিশ্বের ইতিহাসে এটাই সেই সময় যেখানে

জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। তাই পরিবেশোদ্ভুত দৈবসংযোগ বোঝা সহজ, কারণ আমাদের এই বাসস্থান মহাবিশ্বের এমন আরো অনেক স্থানের মধ্যে একটা। আর আমাদের অস্তিত্ব তো অবশ্যই তেমন একটা স্থানে থাকবে যেখানে জীবন সম্ভব।

দুর্বল নৃকেন্দ্রীকতার নীতি নিয়ে তেমন কোনো তর্কবিতর্কের সূচনা হয়নি। কিন্তু এখন আমরা এই নীতির আরো দৃঢ় একটা রূপ নিয়ে আলোচনা করবো, যেটা এমনকি অনেক পদার্থিবিজ্ঞানীরও বেশ অপছন্দ। দৃঢ় নৃকেন্দ্রীকতার নীতি অনুযায়ী আমাদের অস্তিত্ব শুধুমাত্র আমাদের পরিবেশের অবস্থার উপরই সীমা আরোপ করে না, এমনকি প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম সমূহের উপাদান এবং স্বরূপও নির্ধারণ করে। এ ধারণার উদ্ভব হয়েছে কারণ শুধুমাত্র আমাদের সৌরজগতের বৈশিষ্টাবলীই যে অদ্ভুতভাবে মানব জীবনের বিকাশের উপযোগী, তা নয় । বরং পুরো মহাবিশ্বের বৈশিষ্টাবলিই জীবন বিকাশের উপযোগী, যেটা ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন।

সেই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং অল্প কিছু লিথিয়াম নিয়ে গঠিত আদিমহাবিশ্ব কীভাবে বিবর্তিত হয়ে এমন একটা মহাবিশ্বে পরিণত হলো, যেখানে বুদ্ধিমান জীবন ধারণকারী অন্তত একটা বিশ্ব আছে, সেটা এক বিরাট ইতিহাস। যেমনটা আমরা আগেই বলেছি, প্রকৃতির বলসমূহকে হতে হয়েছে ঠিক তেমন যেমনটা হলে আদি মৌলগুলো থেকে ভারী মৌলসমূহ –বিশেষকরে কার্বন- উৎপন্ন হতে পারে এবং অন্তত কয়েক বিলিয়ন বছর সেই কার্বন স্থিতিশীল থাকে। আমরা যাদেরকে নক্ষত্র বলি এরাই আসলে এভাবে ভারী মৌল রান্না করার চুল্লি। তাই শুরুতে মৌলিক বলসমূহ এমন হতে হবে যেন এধরবনের নক্ষত্রপুঞ্জ গঠিত হওয়া সম্ভব হয়। এসব গ্যালাক্সি এবং নক্ষত্রের সূচনা হয়েছিলো আদি মহাবিশ্বের ঘনত্বের ইষৎ অসমসত্বতা থেকে। আদি মহাবিশ্ব প্রায় পুরোপুরি সুষম হওয়া স্বত্তেও ভাগ্যক্রমে তাতে ১০০,০০০ ভাগের একভাগ অনুপাতে ঘণত্বের বিচ্যুতি ছিলো। অবশ্য শুধু এসব তারকাদের অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে আমাদের গঠনকারী উপাদানের অস্তিত্বই যথেষ্ট নয়। এসব নক্ষত্রের অন্তর্বর্তী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেও এমন হতে হয়েছে যেন তাদের কেউ কেউ শেষমেষ বিস্ফোরিত হয়, এবং এমন ভাবে বিস্ফোরিত হয় যেন সেটা তাদের মধ্যকার ভারী মৌলসমূহকে শূন্যে ছড়িয়ে দিতে পারে। এছাড়াও প্রকৃতির নিয়ম সমূহকে এমন হতে হয়েছে যেন বিস্ফোরণের সে সব উচ্ছিষ্টাংশ আবার জমাট বেঁধে নতুন প্রজন্মের নক্ষত্র গঠন করে, আর সে সব ভারী মৌল মিলে তাদের ঘিরে গ্রহসমূহ সৃষ্টি হয়। আমাদের বিকাশের জন্যে যেমন আদি পৃথিবীতে ধারাবাহিক কিছু ঘটনা ঘটতে হয়েছে, তেমনই আমাদের অস্তিত্বের জন্যও আন্তনাক্ষত্রিক এসব ব্যাপারগুলো ঘটতে হয়েছে ধারাবাহিক ভাবেই। যে সকল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব বিবর্তিত হয়েছে সেগুলো যেমন প্রকৃতির মৌলিক নিয়মসমূহের একটা সাম্যাবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তেমনই এসব নিয়মসমূহের মিথস্ক্রিয়াই আমাদের অস্তিত্বকেও সম্ভব করে তুলেছে।

এই পুরো ব্যাপারটাই যে যথেষ্ট দৈবসংযোগের ফল সেটা ১৯৫০ সালে প্রথম অনুধাবন করেন ফ্রেড হয়েল। হয়েল বিশ্বাস করতেন সকল রাসায়নিক মৌল আসলে গঠিত হয়েছে হাইড্রোজেন থেকে, যেটাকে তিনি সত্যিকার প্রাথমিক উপাদান মনে করতেন। হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস হচ্ছে সবচেয়ে সরলতম কারণ, এটি শুধু একটি প্রোটন অথবা তার সাথে কখনো একটি বা দুটি সঙ্গী নিউট্রন নিয়ে গঠিত। (হাইড্রোজেনে বা অন্য কোনো

নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন রূপ, যেখানে প্রোটন সংখ্যা একই থাকলেও নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয় তাদেরকে বলে আইসোটোপ)। এখন আমরা জানি, দুটি বা তিনটি প্রোটন নিয়ে গঠিত হিলিয়াম, ও লিথিয়াম নিউক্লিয়াসও খুব অল্প পরিমাণে শুরু থেকেই সৃষ্টি হয়েছিলো, যখন মহাবিশ্বের বয়স ছিলো ২০০ সেকেন্ডের মত। অবশ্য জীবনের বিকাশ আরো জটিল সব মৌলের উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কার্বন, যেটা সকল জৈব রসায়নের ভিত্তি।

যদিও কেউ চাইলে বুদ্ধিমান কম্পিউটারের মত "জীবন্ত" কোনো জীব কল্পনা করতে নিতে পারে যেগুলো অন্যান্য মৌল, যেমন সিলিকন, দ্বারা গঠিত। কিন্তু কার্বন ছাড়া স্বতস্ফুর্ত ভাবে জীবনের বিবর্তন সম্ভব হতো কী না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণটা কার্বন কিভাবে অন্য মৌল সমূহের সাথে রাসায়নিক সংযোগ গঠন করে তার কারিগরি খুটিনাটির সাথে জড়িত। যেমন কার্বনডাই অক্সাইড স্বাভাবিক তাপমাত্রায় গ্যাসীয়, এবং জীববৈজ্ঞানিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওদিকে সিলিকন যেহেতু পর্যায় সারণিতে কার্বনের ঠিক নিচেই অবস্থিত, এদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু সিলিকন ডাইঅক্সাইড, বা কোয়ার্টজ, ফুসফুসের চেয়ে পাথরের মধ্যেই বেশি কাজের। তবুও এমন জীবন হয়তো বিকশিত হতে পারতো যেখানে প্রাণীরা পেট ভরে সিলিকন খায়, আর তরল আমোনিয়ার পুকুরে ডুবে লেজ নাড়ায়। কিন্তু শুধু লিথিয়াম, হাইড্রোজেনের ও হিলিয়ামের মত প্রাথমিক মৌল দিয়ে এমন কোনো উদ্ভট জীবনও বিকশিত হতে পারতো না। কারণ সেসব মৌল যে দুটি মাত্র স্থিতিশীল অণু সৃষ্টি করতে পারে তারা হলো, লিথিয়াম হাইড্রাইট, যেটা কঠিন বর্ণহীন কেলাস, এবং হাইড্রোজেন গ্যাস। এসব যৌগের কোনোটারই বংশ বিস্তার করা, বা অন্তত একে অপরের প্রেমে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর এত কথার পরেও এটা তো সত্যি যে আমরা হচ্ছি কার্বন ভিত্তিক জীব। তাই কীভাবে ছয় প্রোটন বিশিষ্ট কার্বন নিউক্লিয়াস এবং আমাদের শরীরের অন্যান্য ভারী মৌলসমূহ গঠিত হলো সে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়।

প্রথম ধাপটা ঘটে আদি নক্ষত্রের মধ্যে হিলিয়াম জমা হওয়ার মধ্যে দিয়ে। এই হিলিয়াম তৈরি হয় দুইটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংঘর্ষের মাধ্যমে মিলিত হয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করার ফলে। যে শক্তি আমাদের গরম রাখে, তা সৃষ্টি হয় এই ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমেই। এভাবে দুইটা হিলিয়াম পরমাণু মিলিত হয়ে গঠন করে বেরিলিয়াম, যার নিউক্লিয়াসে প্রোটন আছে চারটি। বেরিলিয়াম গঠন হয়ে যাওয়ার পরে তাত্ত্বিক ভাবে আরেকটা হিলিয়ামের সাথে মিলে সেটা কার্বন গঠন করতে পারতো। কিন্তু তা ঘটে না, বিক্রিয়ায় বেরিলিয়ামের যে আইসোটোপটি গঠিত হয় সেটি প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ভেঙ্গে আবার হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে ফেলে।

অবশ্য এই ঘটনা বদলে যেতে থাকে যখন কোনো নক্ষত্রের জ্বালানী হাইড্রোজেন প্রায় শেষ হয়ে যায়। তখন নক্ষত্রের সারভাগ সংকুচিত হতে থাকে, এর তাপমাত্রাও বাড়তে বাড়তে ১০০ মিলিয়ন কেলভিনএ উঠে যায়। এই অবস্থায় নিউক্লিয়াসগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বেড়ে যায় বহুগুণে, ফলে কিছু বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াস ক্ষয় হয়ে যাবার আগেই অন্য হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ধাক্কা খায়। আর তখনই বেরিলিয়াম হিলিয়ামের সাথে মিশে কার্বনের একটা স্থিতিশীল আইসোটোপ গঠন করে। অবশ্য রাসায়নিক যৌগসমূহের যেসব সন্নিবেশ তাদের জীবদ্দশায় মজা করে এক গ্লাস বোরডক্স (ওয়াইন) পান করবে, বা জলন্ত বোলিং

পিন জাগল করবে, বা প্রশ্ন করবে মহাবিশ্ব সম্পর্কে, তাদের সৃষ্টি করতে এই কার্বনকে যেতে হবে আরো বহুদূর। মানুষের মত স্বত্তার অস্তিত্বের জন্য নক্ষত্রের কেন্দ্রে উৎপন্ন এসব কার্বনকে আগে আরেকটু বন্ধুবাৎসল কোনো পরিবেশে পৌছাতে হবে। এবং এটা ঘটে যখন নক্ষত্ররা তাদের জীবনচক্র শেষ করে সুপারনোভা আকারে বিস্ফোরিত হয়, ফলে কার্বন ও অন্যান্য ভারী মৌলসমূহ নক্ষত্রকেন্দ্র থেকে ছিটকে বেরিয়ে এবং পরে জমাট বেধে গ্রহ সৃষ্টি করে।
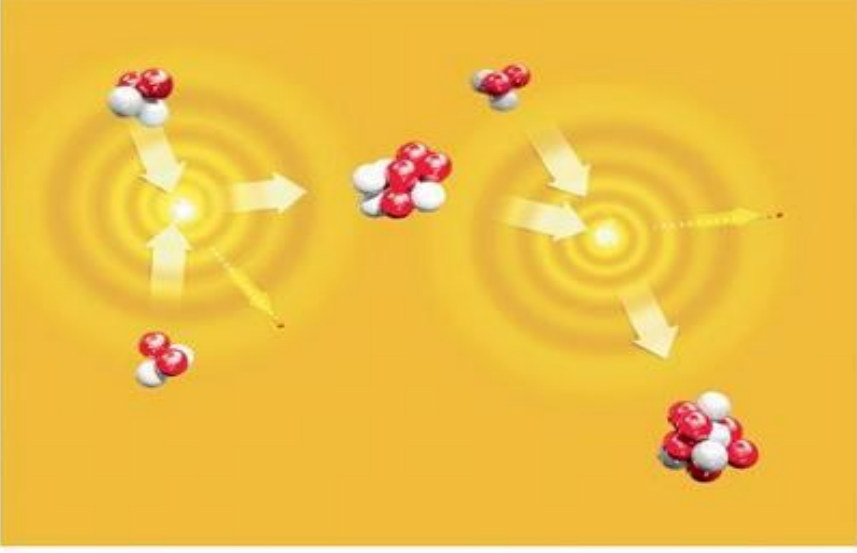
Triple Alpha Process Carbon is made inside stars from the collisions of three helium nuclei, an event that would be very unlikely if not for a special property of the laws of nuclear physics.

কার্বন প্রস্তুতির এই প্রকৃয়াকে বলা হয় ত্রি-আলফা প্রকৃয়া। কারণ অংশগ্রহণকারী হিলিয়াম আইসোটপের নিউক্লিয়াসের আরেক নাম আলফা কণিকা। আর এখানে এই নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় শেষমেষ এধরণের তিনটি আলফা কণিকা মিলে কার্বন নিউক্লিয়াস তৈরি হচ্ছে। সাধারণ পদার্থ বিজ্ঞানের হিসাব মতে এই ত্রি-আলফা-প্রকৃয়ায় কার্বন তৈরি হবার হার খুবই কম হওয়ার কথা। ১৯৫২ সালে এ ব্যাপারটা খেয়াল করে হয়েল অনুমান করেন- যে, একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং একটি বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াসের শক্তির যোগফল, নিশ্চই বিক্রিয়ায় কার্বনের যে আইসোটোপটি সৃষ্টি হচ্ছে তার কোনো একটা কোয়ান্টাম অবস্থার শক্তির সমান হবে, যাকে বলে অণুরণন শর্ত। এ শর্ত পূরণ হলে কার্বন উৎপাদনের হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। সে সময় এ ধরনের কোনো কোয়ান্টাম অবস্থার কথা জানা ছিলো না। কিন্তু হয়েলের পরামর্শের উপর ভিত্তি করে, ক্যালটেকের উইলিয়াম ফাউলার এ ধরণের একটা কোয়ান্টাম অবস্থা খুঁজে বের করেন যেটা ভারী মৌলসমূহের উৎপাদন বিষয়ে হয়েলের অভিমতকে পোক্ত করে।

হয়েল লিখেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি না, যে এসব তথ্য-প্রমাণ দেখেও কোনো বিজ্ঞানী এ উপসংহার টানতে ব্যর্থ হবেন, যে নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার নিয়মসমূহ, নক্ষত্রের মধ্যে ঘটিত এসব ঘটনার কথা মাথায় রেখেই ইচ্ছা করে বানানো।" প্রকৃতির এইসব ভৌতনিয়মাবলী যে

কী পরিমান দৈবসংযোগের ফল সেটা বোঝার মত নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা সে সময় কারোই জানা ছিলো না। আজকাল দৃঢ় নৃকেন্দ্রীকতার নীতিকে আরেকটু খতিয়ে দেখার জন্য পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, কী হত যদি প্রকৃতির নিয়মগুলো ভিন্নতর হতো? এযুগে আমরা কম্পিউটার মডেল বানাতে পারি যার সাহায্যে জানা যায়, ত্রি-আলফা-প্রক্রিয়ার হার প্রকৃতির মৌলিক বলসমূহের উপর কতটা নির্ভরশীল। এ ধরণের হিসাব থেকে দেখা যায় যদি শক্তিশালী নিউক্লিয় বলের মান ০.৫ শতাংশ বা তড়িৎ বলের মান ৪ শতাংশ এদিক ওদিক হতো তাহলে সকল নক্ষত্রের প্রায় সব কার্বন এবং অক্সিজেন পরমাণুই ধ্বংস হয়ে যেত। সেই সঙ্গে ধ্বংস হতো আমাদের পরিচত জীবন বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনাও। আমাদের মহাবিশ্বের নিয়ম সমূহকে যেই না একটু পাল্টানো হবে, অমনি হারিয়ে যাবে আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় সকল শর্তই!

মহাবিশ্বের যেসব গাণিতিক রূপায়ণ আমরা তৈরি করি সেগুলোর উপর পরীক্ষা চালিয়ে, পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে পাল্টালে কী ঘটবে সেটা নির্ণয়ে সুনির্দি পদ্ধতি আছে। এভাবে দেখা যায় শুধু যে শক্তিশালী নিউক্লিয় বল আর তড়িৎচৌম্বক বলের মানই আমাদের অস্তিত্বকে সম্ভব করতে সূক্ষ্মসন্নিবেশ করা হয়েছে তা-ই নয়, বেশিরভাগ মৌলিক ধ্রুবকও এমন ভাবে সূক্ষ্মসন্নিবিষ্ট যে তাদেরকে যদি একটুখানি বদলানো হয় তাহলেও মহাবিশ্বের গুণগত পরিবর্তন ঘটে যাবে। এবং অনেকসময় এটা জীবনের বিকাশের অযোগ্য হয়ে পড়বে। যেমন, যদি অন্য নিউক্লিয় বল, যেমন দুর্বল বল আরো বেশি দুর্বল হত তাহলে মহাবিশ্বের সব হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হতো; ফলে কোনো স্বাভাবিক তারাই থাকতো না। এটা যদি আরো শক্তিশালী হতো তাহলে সুপারনোভার বিস্ফোরণ তার বাইরের আবরণকে ছিন্ন করে ছুড়ে দিতে পারতো না, ফলে জীবনের বিকাশে প্রয়োজনীয় ভারী মৌল সমৃদ্ধ গ্রহ তৈরি হতো না। প্রোটন যদি আরো ০.২ শতাংশ ভারী হত তাহলে সেগুলো সব ক্ষয় হয়ে নিউট্রনে পরিণত হতো। এবং পরমাণুসমূহ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ত। যদি প্রোটনের গঠনকারী কোয়ার্কদের সম্মিলিত ভর ১০ শতাংশও পরিবর্তিত হতো তাহলেও আমরা অনেক কম সংখ্যক স্থিতিশীল পরমাণু দেখতাম; এমনকি দেখে মনে হয়, কোয়ার্কদের ভরের যোগফল এমন ভাবে মেলানো যেন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্থিতিশীল নিউক্লিয়াস গঠিত হতে পারে।

কেউ যদি ধরে নেয়, যে কোনো গ্রহে জীবনের বিকাশ হতে কয়েকশ মিলিয়ন বছরের স্থিতিশীল কক্ষপথ প্রয়োজন, তাহলে দেখা যাবে স্থানিকমাত্রার সংখ্যাও আমাদের অস্তিত্ব দ্বারা নির্ধারিত। কারণ মহাকর্ষের সূত্র মতে শুধু মাত্র ত্রিমাত্রিক জগতেই স্থিতিশীল উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সম্ভব। অন্যান্য সংখ্যক মাত্রার ক্ষেত্রে বৃত্তাকার কক্ষপথ অবশ্য সম্ভব, কিন্তু নিউটন যেমনটা আশঙ্কা করেছিলেন, সে সব কক্ষপথ স্থিতিশীল হবে না। যদি তিন ছাড়া অন্য সংখ্যক স্থানিকমাত্রা থাকতো, তাহলে একটুখানি বিচ্যুতি, আশেপাশের গ্রহের মৃদু আকর্ষণে যেটা হতে পারে, আমাদের গ্রহকে তার বৃত্তাকার কক্ষপথ থেকে বের করে, হয় পেঁচানো পথে সূর্যের বুকে, অথবা সৌরজগতের বাইরে পাঠিয়ে দিতো। ফলে হয় আমরা পুড়ে ছাই হতাম, নইলে জমে বরফ। এছাড়াও তিনের অধিক মাত্রা থাকলে, মহাকর্ষীয় বলও দূরত্বের সাথে সাথে এখনকার চেয়ে আরো দ্রুত হ্রাস পেত। তিন মাত্রার জগতে, মহাকর্ষীয় বল ১/৪ গুণে হ্রাসপায় যখন দূরত্ব বেড়ে হয় দ্বিগুণ। চার মাত্রার ক্ষেত্রে এটি হ্রাস পেতো ১/৮ গুণ, পাঁচমাত্রার ক্ষেত্রে ১/১৬ গুণ... ইত্যাদি। তাই মাত্রা তিনের অধিক হলে, সূর্যের অন্তর্বর্তী চাপ, তার মহাকর্ষীয় টানকে কাটাকাটি করতে পারতো না। এটা হয় ফেটে পড়তো, না হয়

সংকুচিত হয়ে একটা কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হতো। যার দুটোই আমাদের জন্য দুঃসংবাদ। এবং এক্ষেত্রে পারমাণবিক স্কেলে, তড়িৎবলও মহাকর্ষের মতই আচরণ করতো। অর্থাৎ, ইলেক্ট্রনগুলো হয় পরমাণু থেকে বেরিয়ে যেত বা পেচানো পথে গিয়ে পড়তো নিউক্লিয়াসের উপর। যার কোনো কোনোটা ঘটলেই আমাদের পরিচিত পরমাণুগুলোর আর অস্তিত্ব থাকতো না।

এইসব জটিল সংগঠন যেগুলো বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষকের উদ্ভব ঘটিয়েছে, তাদের বিকাশ খুবই ভঙ্গুর পরিস্থিতিতিতে হয়েছে বলে মনে হয়। আর প্রকৃতির নিয়মগুলো দেখে মনে হয় এগুলো খুব যত্ন করে এমন ভাবে সূক্ষ্মসন্নিবেশ করা, যেন জীবন বিকাশের সম্ভাবনা বিনাশ না করে এর খুব কমই পাল্টানো সম্ভব হয়। ভৌত নিয়মসমূহের খুটিনাটিতে এইসব ধারাবাহিক এবং চমকপ্রদ সব দৈব মিল না থাকলে, মানুষ বা এধরণের জীবের অস্থিত্বই সম্ভব হতো না।

সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দৈবসংযোগ পাওয়া যায় আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবক সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে। যেমনটা আমরা আগেও বলেছি, ১৯১৫ সালে যখন তিনি এই তত্ত্ব দাঁড় করান, আইনস্টাইনের বিশ্বাস ছিলো মহাবিশ্ব স্থিতিশীল, অর্থাৎ এটা প্রসারিতও হচ্ছে না, সংকুচিতও হচ্ছে না। যেহেতু সকল পদার্থ একে অপরকে আকর্ষণ করে, সেহেতু তিনি তার তত্ত্বে একটি প্রতি-মহাকর্ষীয় বল আমদানি করলেন, যেটা মহাবিশ্বকে নিজের উপর নিজে সংকুচিত হয়ে পড়া থেকে রক্ষা করে। অন্যান্য বলের সাথে এই বলের পার্থক্য ছিলো যে, অন্যদের মত এটা কোনো উৎস থেকে না এসে বরং একেবারে স্থান-কালের গঠনের মধ্যেই স্থাপিত ছিলো। মহাজাগতিক ধ্রুবক এই বলের তীব্রতা নির্দেশ করতো।

যখন প্রমাণিত হলো যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, তখন আইনস্টাইন তার তত্ত্ব থেকে এই ধ্রুবককে অপসারিত করেন। এবং এটা স্বীকার করেন যে এই ধ্রুবক ধরে নেওয়াটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় বোকামি। কিন্তু ১৯৯৮ সালে পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেল, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হারে, যেটা কোনো বিশেষ ধরণের বিকর্ষণ বল পুরো জগৎ জুড়ে কাজ না করলে ঘটার কথা না। ফলে মহাজাগতিক ধ্রুবককে পুনরুত্থিত করা হলো। এখন যেহেতু আমরা জানি এই ধ্রুবকের মান শূন্য নয়, তাই প্রশ্ন থেকেই যায় কেন এই ধ্রুবকের মান তত, যতটা আমরা দেখি? পদার্থবিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ঘটনাবলী থেকে এ ধ্রুবকের মান হিসাব করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যে মান তারা হিসাব করে পেয়েছেন তা সুপারনোভা পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া প্রকৃত মানের চেয়ে ১২০ সুচক গুণে বেশী (অর্থাৎ, ১ এর পিঠে ১২০ টা শূন্য গুণ বেশি)। এর অর্থ হয় হিসাবে কোনো গড়মিল আছে, অথবা এমন কোনো ঘটনা এখনো অগোচরে রয়ে গেছে যেটা অলৌকিক ভাবে এই বলের একটা অতিক্ষুদ্রাংশ বাদে প্রায় সবটুকুই বিনাশ করে ফেলে। তবে একটা জিনিস নিশ্চিত যে মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান তার বর্তমান মানের চেয়ে অনেক বেশি হলে কোনো ধরণের গ্যালাক্সি গঠিত হবার আগেই মহাবিশ্ব নিজেই ফেটে চৌচির হয়ে যেতো – ফলে আবারো- আমাদের জানা এই জীবনের অস্তিত্ব হয়ে পড়তো অসম্ভব।

তাহলে এসব কাকতাল থেকে আমরা কী বুঝবো? ভাগ্যক্রমে মৌলিক নিয়মসমূহের খুটিনাটির যে মিলন সেটা পরিবেশোদ্ভুত চলকসমূহের ভাগ্যক্রমে মিলে যাওয়া থেকে আলাদা। একে তো এটাকে এত সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তার উপর এতে গভীর

ভৌত ও দার্শনিক ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। আমাদের মহাবিশ্ব এবং তার আইনসমূহ দেখে মনে হয় যেন একেবারে নকশা অনুযায়ী দর্জির হাতে কেটে এমন ভাবে বানানো, যেমনটা হলে এখানে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব হবে, এবং যেখানে এই নকশা থেকে বিচ্যুতির প্রায় কোনো অবকাশই নেই। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা সহজ নয়, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আসে: এটা এমন কেন?

এইসব কাকতালকে যদি আমরা ঈশ্বরের কীর্তি বলি তাহলে অনেকেই খুশি হবেন। মহাবিশ্বকে মানবজাতির জন্যই বানানো হয়েছে এই ধারণা বিভিন্ন ধর্মীয় পূরাণে ও উপকথায় হাজার বছর ধরেই আছে। মায়াদের ঐতিহাসিক উপকথা পোপোল ভুহতে বর্ণীত আছে ঈশ্বর দাবি করছেন, "মানুষের অস্তিত্ব ও সংজ্ঞার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু আমরা সৃষ্টি করেছি তা থেকে আমরা কোনো গৌরব বা সম্মান পাবো না"। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালের একটা প্রাচীন মিসরীয় লেখনীতে পাওয়া যায়, "মানুষ, যারা ঈশ্বরের গবাদিপশু, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই দেওয়া হয়েছে। এবং তিনি [ঈশ্বরের পূত্র] তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আকাশ এবং পৃথিবী"। চৈনিক টাও দার্শনিক লিয়েহ উ-কউ (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৪০০) তার এক কাহিনির চরিত্রের মাধ্যমে এমন ধারণা প্রকাশ করেছেন যেখানে চরিত্রটি বলছে, "ঈশ্বর আমাদের উৎপাদনের জন্য পাঁচ প্রকারের শস্য তৈরি করেছেন, এবং পাখা ও পালকযুক্ত প্রজাতিও সৃষ্টি করেছেন আমাদেরই স্বার্থে"। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে, অর্থাৎ আদি বাইবেলে বর্ণীত সৃষ্টির কাহিনিতেও ঐশ্বরিক পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায়। অবশ্য প্রচলিত খ্রিস্টান ধ্যান-ধারণা মূলত এরিস্টটলীয় ধারণা দ্বারা প্রভাবিত, তিনি এমন একটি, "বুদ্ধিমান প্রাকৃতিক জগতে" বিশ্বাস করতেন যেটা "সুনির্ধারিত পরিকল্পনা অবলম্বনে পরিচালিত হয়"। মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক থমাস অ্যাকুইনাস ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে প্রকৃতির সুসজ্জা বিষয়ক অ্যারিস্টটলীয় যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে আরেকজন খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক তো এমন দাবিও করেন যে, খরগোশের লেজ সাদা হয়েছে যেন তাদেরকে গুলি করতে আমাদের সুবিধা হয়। ভিয়েনার যাজক কার্ডিনাল ক্রিস্টফ স্কনবর্ন কয়েকবছর আগেই এ বিষয়ে আধুনিক খ্রিস্টীয় ধ্যান-ধারণার একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "এখন, এই একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে, আধুনিক বিজ্ঞানের অভাবনীয় সব আবিষ্কারের ফলে প্রকৃতিতে বিরাজমান উদ্দেশ্য ও নকশার ছাপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে, যেগুলো ঢাকার জন্য সৃষ্ট নব্য-ডারউইবাদ এবং মাল্টিভার্সের [বহু মহাবিশ্ব] মতো প্রস্তাবনাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে, ক্যাথলিক চার্চ আবারও ঘোষণা করছে প্রকৃতিতে বিরাজমান প্রকাশ্য পরিকল্পনাই বাস্তব"। জনাব কার্ডিনাল জ্যোতির্বিদ্যা থেকে প্রাপ্ত উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার যে অভাবনীয় প্রমাণের কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে একটু আগে আমাদের বর্ণীত ভৌত নিয়মসমূহের সেই সূক্ষ্মসমন্বয়।

ইতিহাসের যে ক্রান্তিলগ্নে মানবকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণার পরিত্যাগ করা হয়েছিলো, সেটা হচ্ছে কোপার্নিকাসের সৌরমডেল আবিষ্কার, যার আগে পৃথিবীকে আর সব কিছুর কেন্দ্র হিসাবে ধরা হতো। মজার ব্যাপার হলো, কোপার্নিকাসের নিজের ধ্যান-ধারণা ছিলো এতটাই মানবকেন্দ্রীক যে তিনি বলেছিলেন, যদিও সৌরজগৎ সূর্যকেন্দ্রীক কিন্তু পৃথিবীকে মহাবিশ্বের প্রায় কেন্দ্র হিসাবে ধরা যায়। তার কথা উদ্ধৃত করলে: " যদিও [পৃথিবী] জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত নয়, তারপরও স্থির তারকারাজির দূরত্বের তুলনায় [কেন্দ্র থেকে] তার দূরত্ব কিছুই না।" টেলিস্কোপের আবিষ্কারের সাথে সাথে অন্যান্য গ্রহেরও যখন উপগ্রহ আবিষ্কার হতে লাগলো, তখন মহাবিশ্বে যে আমাদের বিশেষ কোনো অবস্থান নেই, সে ধারণা আরো

জোরদার হয়। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে যখন মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা আরো জানতে লাগলাম তখন এটাই প্রতিয়মান হলো যে আমাদের গ্রহটা আসলে অনেকগুলোরর মধ্যে স্রেফ আরেক প্রকারের একটা গ্রহ। কিন্তু ভৌত বিধিসমূহের এই সূক্ষ্মসমন্বয় যেটা অপেক্ষাকৃত নতুন আবিষ্কার, সেটা আমাদের অনেককেই আবার সেই পুরাতন ধারণার কাছেই ফিরিয়ে নিয়েছে। যা হলো, "এই মহান নকশা নিশ্চই কোনো মহান নকশাকারের কাজ।" যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে পাঠ্যসূচীতে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ, তাই এখন নতুন এক ধারণা আমদানি করা হয়েছে যার নাম বুদ্ধিদীপ্ত নকশা, যেখানে উহ্য থাকলেও এটাই বোঝানো হয় যে এই নকশাকার হচ্ছেন ঈশ্বর।

আধুনিক বিজ্ঞানের উত্তর তা নয়। আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখেছি আমাদের মহাবিশ্ব বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়ে গঠিত বহুসংখ্যক মহাবিশ্বের মাঝে একটা। এই বহুমহাবিশ্বের ধারণা ভৌতবিধিসমূহের অলৌকিক সূক্ষ্মসমন্বয়কে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গঠিত হয়নি। এটা সীমাহীনতার শর্ত সহ আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার আরো অনেক তত্ত্ব থেকে পাওয়া একটা ফলাফল। এটা সত্যি হলে, দৃঢ় নৃকেন্দ্রীকতার নীতিকে দুর্বল নৃকেন্দ্রীকতার নীতির সমতুল হিসাবে ভাবা যাবে। যেখানে পরিবেশোদ্ভুত চলক সমূহের সূক্ষ্মসমন্বয়ের মতো, ভৌতবিধিসমূহের সূক্ষ্মসমন্বয়ও একই ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কারণ তখন আমাদের জীবনসহায়ক সৌরজগৎ, যেমন এ ধরণের অনেকগুলোর মধ্যে একটি; তেমনি আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বও, যেটাতে আমাদের অবস্থান, তেমন অনেক মহাবিশ্বের ভীড়ে একটি হিসাবে প্রতিয়মান হবে। অর্থাৎ, ঠিক যেভাবে আমাদের সৌরজগৎ এর বিভিন্ন ঘটনার কাকতলীয় মিলন, এমন বিলিয়ন সৌরজগৎএর অস্তিত্ব মেনে নিলে একেবারে সাদামাটা একটা ব্যাপারে পরিণত হয়, তেমনই ভাবে বহু-মহাবিশ্বের অস্তিত্বের সাহায্যে ভৌতবিধিসমূহের সূক্ষ্মসমন্বয়ও সহজেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। যুগে যুগে অনেক মানুষই প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং জটিলতাকে ঈশ্বরের অবদান হিসাবে মেনে নিয়েছেন, কারণ তাদের সময়ে মনে করা হতো এসবের বুঝি কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু ঠিক যেভাবে ডারউইন এবং ওয়ালেস কোনো সর্বময় স্বত্তার অস্তিত্ব ছাড়াই সকল প্রাণীর এই অনেকটা অলৌকিক নকশা কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তেমনি বহুমহাবিশ্বের ধারণাও ভৌতবিধিসমূহের সূক্ষ্মসমন্বয়কে কোনো দয়াময় সৃষ্টিকর্তার- যিনি আমাদের স্বার্থে সব কিছু ঠিকঠাক সৃষ্টি করেছেন- প্রয়োজন ছাড়াই ব্যাখ্যা করতে পারে।

আইনস্টাইন একবার তার সহকারী আর্নেস্ট স্ট্রাউস কে প্রশ্ন করেছিলেন, "ঈশ্বরের কি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি না করে কোনো উপায় ছিলো?" ষোড়শ শতকের শেষদিকে কেপলার নিশ্চিত ছিলেন যে ঈশ্বর মহাবিশ্বকে কিছু নিখুঁত গাণিতিক নিয়মে বেঁধে বানিয়েছেন। নিউটন দেখিয়েছেন যেসব সূত্র মহাকাশের বস্তুসমূহের উপর খাটে সেগুলো, পৃথিবীর বস্তুসমুয়ের উপরও কাজ করে। তিনি যে সকল গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে এসব সূত্র লিপিবদ্ধ করেন সেগুলো এতটাই নান্দনিক ছিলো যে সমসাময়ীক বিজ্ঞানীদের মধ্যে রীতিতমত একটা ধর্মীয় জেল্লা চলে এসেছিলো এটা প্রমাণ করতে, যে ঈশ্বর নিজে আসলে একজন গণিতবিদ।

নিউটনের পরে, বিশেষকরে আইনস্টাইনের সময় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিলো সবকিছুর সরল গাণিতিক নিয়ম বের করা। যেমনটা কেপলারও ভাবতেন, যে এই নিয়মগুলো সবকিছুর একটা সার্বিক তত্ব দেবে এবং এদের সাহায্যে প্রকৃতিতে পর্যবেক্ষীত

সকল পদার্থ ও বলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ম্যাক্সওয়েল এবং আইনস্টাইন চৌম্বকত্ব, তড়িৎ ও আলোর একটি সম্মিলিত তত্ব গঠন কতে সক্ষম হন। ১৯৭০ সালে স্টান্ডার্ড মডেল গঠিত হয় যেটা দুর্বল ও শক্তিশালী নিউক্লিয় বল এবং তড়িৎচৌম্বক বলের একটা সম্মিলিত তত্ব। এরপরে মহাকর্ষকে এই চিত্রে আনতে আসে স্ট্রিং তত্ব এবং এম-তত্ব। লক্ষ্য ছিলো, শুধু সকল বল ব্যাখ্যাকারী একটা একক তত্ব খুঁজে বের করাই নয়, বরং যেসব মৌলিক ধ্রুবকের কথা আমরা এতক্ষণ বলেছি, অর্থাৎ বিভিন্ন বলসমূহের তীব্রতা এবং মৌলিক কণিকাদের ভর ও আধান, এদের পর্যবেক্ষীত মান এমন কেন, সেটাও ব্যাখ্যা করা। আইনস্টাইন যেমনটা বলেছেন, আশা ছিলো এটা বলতে সক্ষম হওয়া যে, “প্রকৃতি এমনভাগে ঘঠিত যেখানে যুক্তিপ্রয়োগে এমন শক্তিশালী কিছু নিয়ম বের করা সম্ভব যেসব নিয়মের ধ্রুবক সমূহ শুধুমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই পুরোপুরি নির্ধারিত হয় (অর্থাৎ এমন কোনো ধ্রুবকই থাকবে না, এই তত্বকে ধ্বংস না করে যেটার মান পরিবর্তন করা সম্ভব)।” একটা একক তত্বে, আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে যে ধরণের সূক্ষ্মসমন্বয় প্রয়জন, তা থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু বর্তমান অগ্রগতির আলোকে আমরা যদি আইনস্টাইনের স্বপ্নকে এভাবে ব্যাখ্যা করি, যে এমন একটা অদ্বিতীয় তত্ব থাকবে যেটা আমাদের এবং অন্য সকল মহাবিশ্বের সম্ভাব্য সকল ভৌতনিয়ম সমূহকে ব্যাখ্যা করে, তাহলে এম-তত্বই হতে পারে সেই তত্ব। কিন্তু এম-তত্ব কি আসলেই অদ্বিতীয়, বা শুধুমাত্র কোনো সরল যৌক্তিক নীতি থেকেই উৎসরিত? কেন এম-তত্ব?

৮

সেই মহান নকশা

এই বইয়ে আমরা বলেছি কীভাবে নভোমন্ডলের বস্তুসমূহ, যেমন- চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাদের, ছন্দবদ্ধ গতি থেকে বোঝা যায় এগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছে, কোনো দেব-দেবী বা অসুরের খেয়াল খুশি মত নয়। এ ধরণের কিছু নিয়মের যে অস্তিত্ব আছে সেটা শুরুতে সামনে আসে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে (আসলে জ্যোতিসশাস্ত্র, কারণ সে যুগে এ দুটোর চর্চা একই ছিলো)। পৃথিবীর বুকে বস্তুসমূহের গতিবিধি এতটাই জটিল, এবং একটা বস্তুর উপর এত বেশি সংখ্যক অন্য বস্তুর প্রভাব কাজ করে যে প্রাচীন সভ্যতাগুলো এদের কোনো নিয়মবিধি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছিলো। ধীরে ধীরে অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য শাখাতে বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কার হতে লাগলো, ফলে জন্ম হলো বৈজ্ঞানিক নির্ধারণবাদের। এ মতবাদ অনুযায়ী, এমন এক সেট পূর্ণাঙ্গ নিয়ম থাকবে, যার সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মহাবিশ্বের অবস্থা পুরোপুরি জানা থাকলে, পরবর্তী যে কোনো সময়ে এটি কিভাবে বিবর্তিত হবে তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। আর এই নিয়মগুলো কাজ করবে সকল স্থানে এবং কালে; অবশ্য না হলে এগুলো তো নিয়মের মর্যাদাই পেত না। ফলে বিশ্ব পরিচালনায় দেবতা বা অসুরদের নাক গলানোর আর কোনো অবকাশ থাকলো না।

প্রথম যখন বৈজ্ঞানিক নির্ধারণবাদ প্রস্তাব করা হয়, তখন আমাদের জানা প্রকৃতির নিয়ম ছিলো শুধুমাত্র নিউটনের মহাকর্ষ ও গতির সূত্রগুলো। আমরা দেখেছি আইনস্টাইন কীভাবে এ সূত্রগুলোকে তার সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধ করেছেন, এবং কীভাবে মহাবিশ্বের অন্যান্য ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার জন্য অন্যান্য সূত্রসমূহও পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রকৃতির এ নিয়মগুলো বর্ণনা করে কীভাবে আমাদের মহাবিশ্ব আচরণ করে, কিন্তু এ বইয়ের শুরুতে করা *কেন?* প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর তারা দেয় না।

কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?
কেন আমাদের অস্তিত্ব আছে?
কেন ভৌত সূত্র সমূহের ঠিক এই সেটটাই আমরা দেখছি, অন্যরকম নয় কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর হিসাবে কেউ কেউ দাবি করবেন যে, নিশ্চই এমন এক ঈশ্বর আছেন যিনি এই মহাবিশ্বকে ঠিক এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। কে বা কী এই মহাবিশ্বকে বানিয়েছে, এ প্রশ্ন উদয় হওয়া যৌক্তিক; কিন্তু তার উত্তর যদি হয় ঈশ্বর, তাহলে প্রশ্নটা স্রেফ একটু সরে গিয়ে দাঁড়ায়- ঈশ্বরকে বানিয়েছে কে? এ প্রসঙ্গে এটা গ্রহণ করে নেওয়া হয় যে, কোনো একটা স্বত্তা থাকবে যার অস্তিত্বের জন্য কোনো সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই। এই স্বত্তাকেই বলা হবে ঈশ্বর। এটাকে বলা হয় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রথম-কারণ-যুক্তি। অবশ্য আমরা দাবি করছি, এসব প্রশ্নের উত্তর, কোনো স্বর্গীয় সত্বার আশ্রয় না নিয়ে, পুরোপুরি বিজ্ঞানের আয়তাধীন থেকেই দেওয়া সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণীত রূপায়ণনির্ভর বাস্তবতা অনুযায়ী আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে পাওয়া প্রেসনার সাপেক্ষেই বহির্জগতের কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এভাবে আমরা আমাদের বাড়ি, গাছপালা, মানুষজন, বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ, অণু, পরমাণু এবং অন্যান্য মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানসিক চিত্র গঠন করি। এসব মানসিক ধারণাই আসলে আমাদের জানা একমাত্র বাস্তবতা। বাস্তবতাকে কখনোই

রূপায়ন অনির্ভর ভাবে যাচাই করা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, একটা সুগঠিত রূপায়ণ তার নিজস্ব বাস্তবতা গঠন করতে পারে। বাস্তবতা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে যে উদাহরণ আমাদের সাহায্য করতে পারে তার নাম, গেম অফ লাইফ বা জীবনের খেলা। ১৯৭০ সালে কেম্ব্রিজের তরুণ গণিতবিদ জন কনওয়ে এটি উদ্ভাবন করেন।

গেম অফ লাইফের, "গেম" বা "খেলা" শব্দটা একটু বিভ্রান্তিকর। কারণ এই খেলায় কোনো হার-জিত নেই, এমনকি নেই কোনো খেলোয়াড়ও। এটা বস্তুত কোনো খেলা নয়, বরং কিছু নিয়মের সমষ্টি, যে নিয়মগুলো একটি দ্বিমাত্রিক মহাবিশ্বকে পরিচালিত করে। তাই এটা একটা সুনির্ধারিত মহাবিশ্ব: আপনি যদি শুরুর একটা বিন্যাস বা শুরুর শর্তগুলো সাজিয়ে দেন, এরপর ভবিষ্যতে এখানে কী ঘটবে সেটা শুধুমাত্র কিছু নিয়ম দ্বারাই নির্ধারিত হবে।

কনওয়ে যে জগৎটি কল্পনা করেছিলেন সেটা অনেকটা বর্গাকার দাবার ছক এর মত কিন্তু এ ছকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সব দিকেই অসীম। আর এ জগতের প্রতিটি ঘর বা কোষ দুইটি অবস্থায় থাকতে পারে: জীবিত (সবুজ) বা মৃত (কালো)। প্রতিটি ঘরের প্রতিবেশী ঘর মোট আট (উপরে, নিচে, ডানে, বামের চারটি ঘর আর চার কোণার চারটি ঘর)। এই জগতে সময় অবিচ্ছিন্ন নয়। বরং বিচ্ছিন্ন ধাপে ধারাবাহিক ভাবে অতিবাহিত হতে থাকে। শুরুতে মৃত ও জীবিত ঘরের যে কোনো সজ্জা দেওয়া থাকলে, সে সজ্জার প্রতিটি ঘরের প্রতিবেশীদের মধ্যে কতজন জীবিত বা মৃত, সেটাই নির্ধারণ করে পরবর্তি ধাপে ঘরটির অবস্থা কী হবে। পুরো ব্যাপারটি নির্ধারিত হয় নিম্নে বর্ণীত নিময়মগুলো মেনে:

১. কোনো জীবিত ঘরের যদি দুই বা তিনটি জীবিত প্রতিবেশী থাকে তাহলে সেটি টিকে যায়। (জীবিত থাকা)
২. কোনো মৃত ঘরের যদি ঠিক তিনটি জীবিত প্রতিবেশী থাকে তাহলে কোষটি নিজেও বেঁচে ওঠে। (জন্ম)
৩. অন্য সকল ক্ষেত্রেই কোনো কোষ হয় মারা যায় অথবা মৃত অবস্থাতেই থাকে। অর্থাৎ, কোনো জীবিত ঘরের যদি শুধু শূন্য বা একটি মাত্র প্রতিবেশী থাকে তাহলে সেটি মারা যাবে একাকিত্বের কারণে; আর যদি তিনের অধিক প্রতিবেশী থাকে তাহলে মারা যাবে ভীড়ের চাপে।

পুরো ব্যাপারটার কারিগরি এটুকুই। ফলে শুরুর একটা অবস্থা নির্ধারণ করে দেওয়ার পরে এ নিয়মগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম জীবিত কোষ সৃষ্টি বা বিনাশ করতে থাকে। কোনো একটা বিচ্ছিন্ন জীবিত কোষ, বা দুজনের একটা বিচ্ছিন্ন কোষজুটি পরের প্রজন্মেই মারা পড়ে, কারণ তাদের যথেষ্ট প্রতিবেশী নেই। কোনাকুনি বরাবর তিনটি জীবিত কোষ বাঁচে একটু বেশি। কারণ, তখন প্রথম ধাপে দুকোনার দুই কোষ মারা পড়ে থাকে শুধু মাঝেরটা। এবং পরের ধাপে সেটাও মারা পড়ে। কোষদের এমন যেকোনো কোনাকুনি দাগই এভাবে সময়ের সাথে সাথে "উবে যায়"। আবার এই তিনটি জীবিত কোষকে যদি শুরুতে আনুভুমিক সারি বরাবর পাশাপাশি বসানো হয় তাহলে। প্রথম ধাপে দুপাশের দুটি কোষ মারা যায় ঠিকই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে মাঝের কোষের ঠিক উপরের এবং নিচের কোষদুটি বেঁচে ওঠে। তাই আনুভুমিক সারিটি হয়েযায় একটি খাঁড়া স্তম্ভ। এভাবে, পরের প্রজন্মে এই খাঁড়া স্তম্ভ আবার আনুভুমিক সারিতে পরিণত হয়। এবং এভাবেই একটা থেকে আরেকটা বারে বারে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। এ ধরণের পুনরাবৃত্ত সজ্জাকে বলা হয় ব্লিঙ্কার।
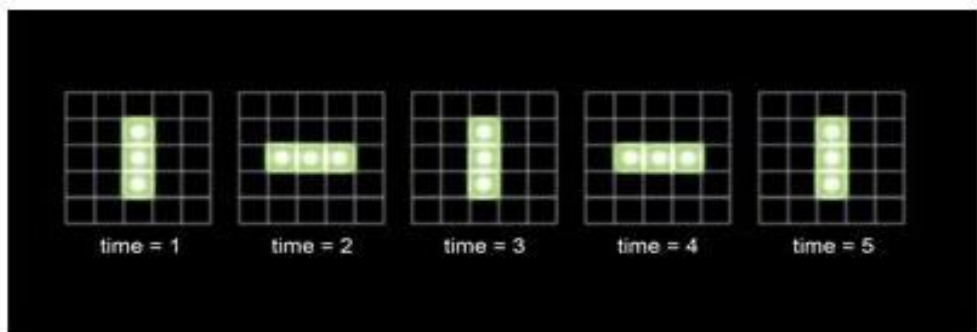
Blinkers Blinkers are a simple type of composite object in the Game of Life.

যদি তিনটা জীবিত ঘরকে L আকৃতিতে সাজানো হয় তাহলে নতুন একটা ঘটনা ঘটে। পরের প্রজন্মে L দিয়ে ঘেরা কোনার কোষটি বেঁচে ওঠে এবং জীবিত কোষের একটা ২x২ বর্গ সৃষ্টি হয়। এ বর্গটি এক ধরণের কোষ বিন্যাসের সদস্য যাদেরকে বলে "স্থির জীবন"। কারণ এধরণের বিন্যাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম অপরিবর্তিত অবস্থায় টিকে যেতে পারে। বিভিন্ন ধরণের আদি কোষ বিন্যাস আছে যারা শুরুর কিছু প্রজন্মে বিবর্তিত হয় কিন্তু শিঘ্রই হয় স্থির জীবন ধারণ করে অথবা মারা যায়, অনেকে আবার ঘুরে আদি বিন্যাসে ফিরে যায় এবং পুরো চক্রটাকেই ক্রমাগত পুণরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে।
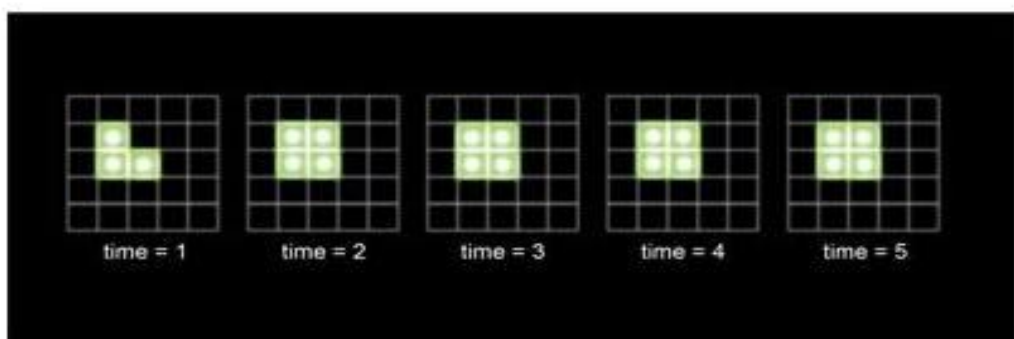
Evolution to a Still Life Some composite objects in the Game of Life evolve into a form that the rules dictate will never change.

এছাড়াও এমন বিন্যাস আছে যাদেরকে বলে গ্লাইডার, বা উড়ুক্কু। এরা বিবর্তিত হয় অন্য আকৃতি ধারণ করে, এবং এভাবে কয়েকক প্রজন্ম পরে আবার ফিরে যায় নিজের আদি আকৃতিতে, কিন্তু ততক্ষণে পুরো আকৃতিটাই সরে গেছে কোনাকুনি এক বর্গ নিচের একটা অবস্থানে। আপনি যদি এদেরকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেখতে থাকেন তাহলে মনে হবে এরা ছকের উওর কোনাকুনি হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। এ ধরণের উড়ুক্কুরা যখন একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন তারা সংঘর্ষকালীন কে কী সজ্জায় ছিলো তার উপর নির্ভর করে দারুণ সব ব্যাপার ঘটে।
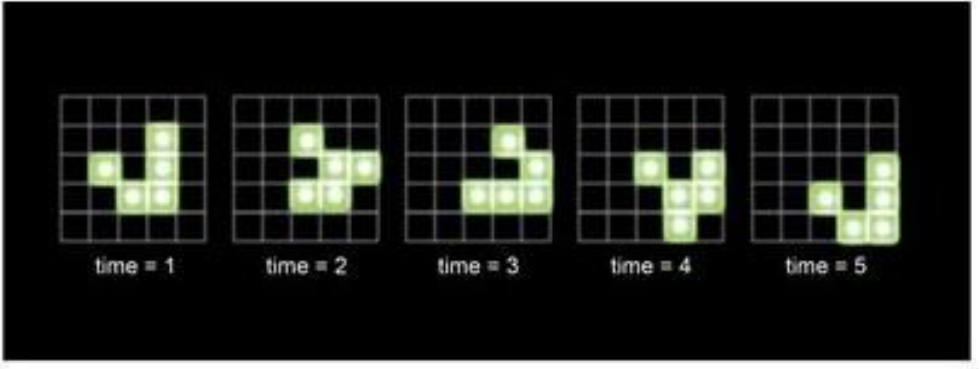
Gliders Gliders morph through these intermediate shapes, then return to their original form, displaced by one square along the diagonal.

এই ছকের মহাবিশ্বটা আগ্রোহদ্দীপক এই কারণে যে, যদিও এর মৌলিক 'পদার্থবিজ্ঞান' খুবই সরল, কিন্তু এ থেকে জটিল সব 'রসায়ন'এর উদ্ভব হতে পারে। মানে, বিভিন্ন মাত্রার জটিল বস্তুসমূহ এ জগতে থাকতে পারে। একেবারে ক্ষুদ্রতম স্কেলে এখানকার মৌলিক পদার্থবিদ্যা আমাদের বলছে শুধু দুই রকম কোষ ঘর আছে, জীবিত বা মৃত। কিন্তু আরেকটু বৃহৎ স্কেলে ভাবলে সেখানে, গ্লাইডার, ব্লিঙ্কার, এবং স্থির জীবনের বিন্যাস দেখা যায়। আরো বড়ো স্কেলে, আরো জটিল সব বস্তু থাকতে পারে, যেমন গ্লাইডার বন্দুক: এটা একটা স্থির কোষ সজ্জা, যা নির্দিষ্ট সময় পর পর নতুন নতুন গ্লাইডারের জন্ম দেয় যেগুলো সেই নীড় ছেরে বেরিয়ে পরে বাইরে।

আপনি যদি এই গেম ওফ লাইফ জগৎ এর ঘটনাবলি যে কোনো আকারের স্কেলেই পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে সেই স্কেলের বস্তুসমূহের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সূত্র আপনি নির্ণয় করতে পারবেন। যেমন হয়তো অল্প কয়েক ঘর মিলে তৈরি বস্তুদের জন্য আপনি সূত্র পাবেন "চারকোনা ব্লক কখনো সরে না", "গ্লাইডাররা কোনাকুনি সরে"। এছাড়াও দুইটি বস্তুর সংঘর্ষের ফলে কী ঘটতে পারে সেগুলোর বিবিধ সূত্র আপনি পাবেন। অর্থাৎ, আপনি যেকোনো পর্যায়ের মিশ্রবস্তুর জন্যই পূর্ণাঙ্গ একটা পদার্থবিজ্ঞান গঠন করতে পারবেন। এ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলোর মধ্যে এমন সব ধারণা এবং অনুসঙ্গ থাকবে একদম মূলসূত্রের মধ্যে যাদের কোনো স্থান নেই। যেমন, মূল সূত্রে, "সংঘর্ষ", বা "সরণ" এর কোনো ব্যাপার নেই। তারা শুধুমাত্র স্থির একটা ঘর জীবিত নাকি মৃত থাকবে সেটা বর্ণনা করে। আমাদের এই মহাবিশ্বের মত এই গেম অফ লাইফেও আপনার বাস্তবতা নির্ভর করবে কী ধরনের রূপায়ণ আপনি ব্যবহার করছেন তার উপর।
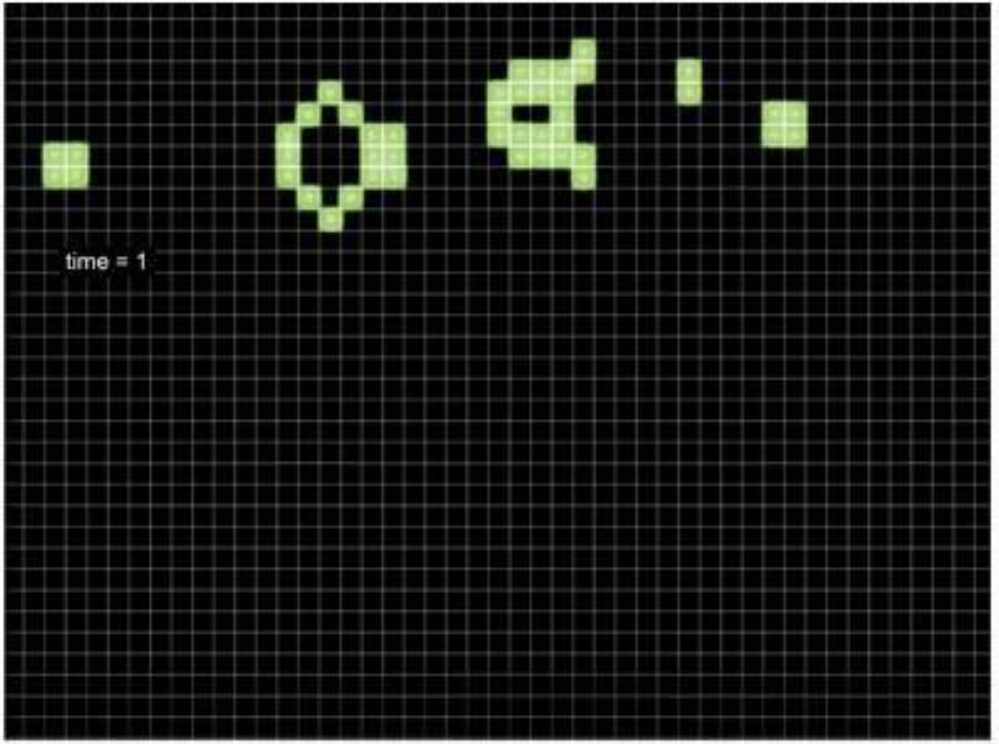
Initial Configuration of the Glider Gun The glider gun is roughly ten times as large as a glider.

কনওয়ে এবং তার ছাত্ররা এই জগৎ তৈরি করেছিলেন কারণ তারা জানতে চাচ্ছিলেন- কোনো মহাবিশ্বে, যেখানে মৌলিক নিয়মগুলো এই গেম অফ লাইফের নিয়মের মত এতটাই সরল, সেখানেও কি জটিল কোনো বস্তুর উদ্ভব হতে পারে, যা বংশবিস্তার করতে সক্ষম? এই জগৎএ কি এমন কোনো মিশ্র বস্তু থাকতে পারে যেটা, কয়েক প্রজন্ম ধরে এ জগৎ এর নিয়মগুলো মেনে চলার পরে অন্য ধরণের বস্তুর জন্ম দিতে পারে? কনওয়ে এবং তার ছাত্ররা শুধু এমন কিছু বস্তু খুঁজে পেতেই সক্ষম হননি, তারা আরো দেখিয়েছেন যে এ ধরণের বস্তু চাই কি 'বুদ্ধিমান' ও হতে পারে! প্রশ্ন আসে, এখানে বুদ্ধিমান বলতে তারা কী বোঝাচ্ছেন? তারা আসলে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, যে এসব কোষের বিশাল একটা সমাবেশ, যেটা বংশ বিস্তার করতে সক্ষম, আসলে একটা "সার্বিক টুরিং মেশিন"। এর মানে হচ্ছে, আমরা আমাদের কম্পিউটার দিয়ে যে সব হিসাব করতে পারি, সেগুলোকে এই গেম অফ লাইফের জগৎ এর এসব কোষ সমাবেশও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে করে ফেলতে পারে। অর্থাৎ কয়েক প্রজন্ম পরে এরা এমন একটা অবস্থায় যেতে পারে যেখান থেকে আমাদের কম্পিউটার হিসাব করে যে ফলাফল পেত, সে হিসাবগুলোই পাওয়া যাবে।
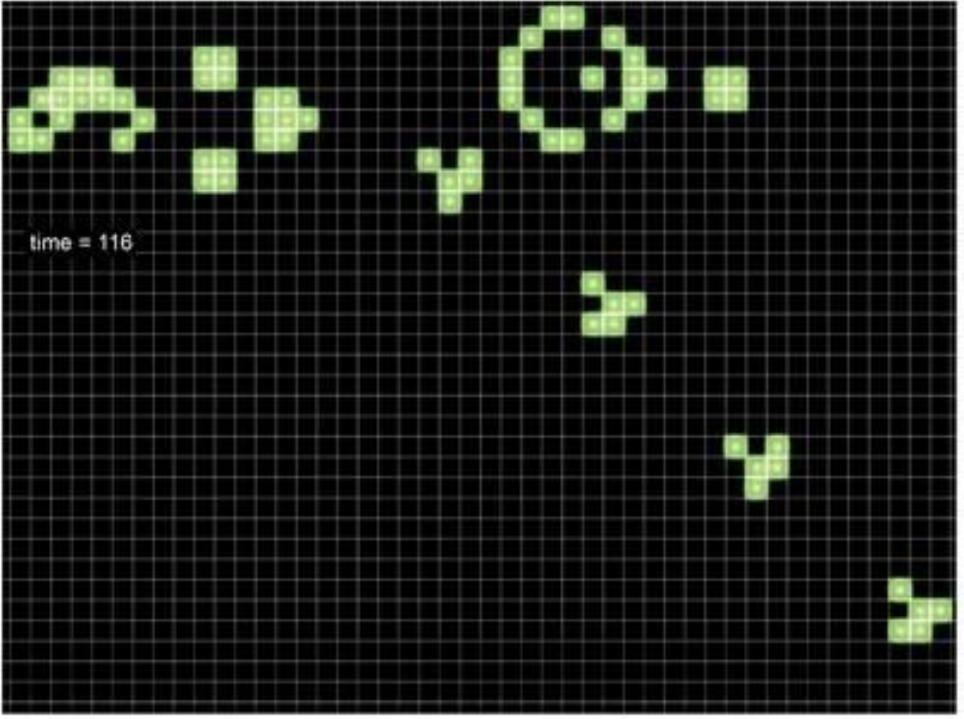
The Glider Gun After 116 Generations With time, the glider gun changes shape, emits a glider, and then returns to its original form and position. It repeats the process ad infinitum.

পুরো ব্যাপারটার একটা স্বাদ পেতে, চলুন দেখি কী ঘটবে যখন ২x২ মাপের একটা জীবিত বর্গের দিকে একটা গ্লাইডার ছুড়ে দেওয়া হয়। সংঘর্ষের সময় গ্লাইডারটা কী অবস্থায় স্থির বর্গটার কাছে পৌছাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে বর্গটা গ্লাইডারের উৎসের দিকে বা উৎস থেকে দূরে একঘর সরে যাবে। এভাবে এই স্থির বর্গ একটি কম্পিউটারের স্মৃতিকোষের মত আচরণ করতে পারে। আসলে, আধুনিক কম্পিউটারের সকল মৌলিক উপাদান যেমন AND ও OR-গেট এই গ্লাইডারের সাহায্যে তৈরি করা সম্ভব। ফলে কম্পিউটার যন্ত্রে ঠিক যেভাবে তড়িৎ সিগন্যাল পাঠিয়ে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয় তেমনি একসারি গ্লাইডার ব্যবহার করেও তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব।

এই গেম অফ লাইফের জগতে সৃষ্ট বংশবিস্তারকারী বস্তুগুলোর বিন্যাস ও ঘঠন আমাদের জগৎ এর বস্তুগুলোর মতই অনেক জটিল। জন ভন নিউম্যানের কিছু প্রাথমিক হিসাব মতে অনুমান করা হয়, গেম অফ লাইফের জগৎএ বংশ বিস্তার সক্ষম ক্ষুদ্রতম বিন্যাসে ঘরের সংখ্যা হবে প্রায় দশ ট্রিলিয়ন- প্রায় একটি মানবকোষের মোট অণু সংখ্যার সমান।

আমরা জীবন্ত সত্বা বলতে বুঝি, নির্দিষ্ট আকারের এমন কোনো জটিল ব্যবস্থা যারা স্থিতিশীল এবং বংশবিস্তার করতে পারে। একটু আগে যে জটিল বস্তুটার কথা বলা হলো, সেটা উপরের এই বংশবিস্তারের শর্ত পূরণ করে ঠিকই কিন্তু সম্ভবত সেটা স্থিতিশীল নয়। অর্থাৎ বাইরে থেকে প্রযুক্ত মৃদু আলোড়নই এর সূক্ষ্ম কারুকাজকে নষ্ট করে দিতে পারে।

অবশ্য প্রাথমিক নিয়মগুলো আরেকটু জটিল হলে সেটা এমন সব জটিল ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে পারবে যাদের জীবনের সকল গুণাবলীই আছে। এমন একটা সত্বার কথা কল্পনা করুন, যেটা কনোওয়ের জগতের মত কোনো জগতের একটা বস্তু। এ ধরণের একটা বস্তু যদি পরিবেশগত প্রেসনার সাপেক্ষে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে, তখন দেখে মনে হবে এটা বুঝি সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এধরণের একটা জীবন কি নিজের ব্যাপারে সচেতন হবে? অর্থাৎ, এটাকে কি আত্মসচেতন বলা যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে প্রসংগে তীব্র মতবিভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ দাবি করেন আত্মসচেতনতা মানুষের একটি অনন্য গুণ। এই আত্মসচেতনতাই হচ্ছে মুক্ত ইচ্ছার উৎস, যেটা তাদেরকে দিয়েছে বিভিন্ন কার্যপ্রবাহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা।

একটা সত্বার মুক্ত ইচ্ছা আছে কি না সেটা কীভাবে বলা সম্ভব? কেউ যদি একটা ভিনগ্রহবাসীর সম্মুখীন হয়, তাহলে কীভাবে নিশ্চিত হবে, যে এটা একটি রোবট নাকি, নিজস্ব মন ধারী সত্বা? একটা রোবটের আচরণ থাকবে পুরোপুরী পূর্বনির্ধারিত, যেখানে একটা মননশীল সত্বার মুক্ত ইচ্ছার ক্ষমতা থাকার কথা। ফলে কেউ হয়তো একটা রোবটকে চিহ্নিত করতে পারে এভাবে যে, এর সকল আচরণ পূর্বানুমান করা সম্ভব। যেমনটা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছি, এ কাজটা অসম্ভবরকমের কঠিন হয়ে যেতে পারে, যদি সত্বাটি বৃহৎ এবং জটিল হয়। আমরা তো এমনকি তিন বা তার অধিক কণিকার পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়াই পুরোপুরি গণনা করতে পারি না। সেখানে একটি মানবাকৃতির ভিনগ্রহবাসির গঠনকারী কণিকা হবে হাজার ট্রিলিয় ট্রিলিয়ন। তাই এটা যদি একটা রোবটও হয় তাহলেও সমীকরণ সমাধান করে এর আচরণ অনুমান করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে আমরা বলতে বাধ্য হবো, যে কোনো জটিল সত্বাই মুক্ত ইচ্ছার অধিকারী। মুক্ত ইচ্ছা এসব সত্বার একেবারে মৌলিক গুণ না হলেও, এদের আচরণ হিসাব করতে ব্যর্থতা আমাদেরকে মুক্ত ইচ্ছার অনুকল্পটিকে এদের আচরণের একটা কার্যকর তত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য করছে।

কনওয়ের জীবনের খেলা থেকে দেখা যাচ্ছে যে একেবারে সরলতম এক সেট নিয়মও জটিল সব বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটাতে পারে, যেটা বুদ্ধিমান জীবনের সমতুল্য। নিশ্চই এ ধরণের বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এমন অনেক সেট নিয়ম সম্ভব। প্রশ্ন আসে, আমাদের মহাবিশ্বকে চালনাকারী মৌলিক নিয়ম সমূহ (প্রকাশ্য নিয়ম সমূহ নয়) কীভাবে নির্ধারিত হলো? কনওয়ের মহাবিশ্বের মত আমাদের মহাবিশ্বের বিবর্তনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে এসব নিয়ম মেনেই ঘটে। কনওয়ের জগৎএ আমরা হচ্ছি সৃষ্টিকর্তা, যারা ঐ মহাবিশ্বের আদি অবস্থায় বস্তু সমূহের অবস্থান ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিচ্ছি।

গেম অফ লাইফে যেটা গ্লাইডার, ভৌত মহাবিশ্বে তার তুল্য হতে পারে ছুটে চলা বস্তুকণা। আমাদের জগতের মত অবিচ্ছিন্ন একটা জগৎকে বর্ণনাকারী কোনো নিয়মের সেটে অবশই সংরক্ষণশীল শক্তির ধারণা থাকবে। অর্থাৎ সময়ের সাথে ব্যবস্থাটির মোট শক্তির মান পরিবর্তিত হবে না। শূন্যস্থানে এই শক্তির মান স্থান এবং কাল নিরপেক্ষভাবে ধ্রুব থাকবে। স্থানের নির্দিষ্ট কোনো আয়তনে ধারণকৃত মোট শক্তি থেকে, সমআয়তনের শূন্যস্থানের মোট শক্তি বিয়োগ করে কেউ যে কোনো হিসাব থেকে এই শূন্য স্থানের শক্তিকে বাদ দিতে পারে। তাই আমরা চাইলে শূন্যস্থানের বা ফাঁকাস্থানের শক্তির মান শূন্য ধরে নিতে পারি। প্রকৃতির যেকোনো নিয়মকে অবশ্যই যে শর্তটা পূরণ করতে হয় সেটা

হলো শূন্যস্থান দিয়ে ঘেরা কোনো বিচ্ছিন্ন বস্তুর মোট শক্তি অবশ্যই ধনাত্বক হতে হবে। যার অর্থ ঐ স্থানে বস্তুটিকে গঠন করতে শুরুতে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। বিচ্ছিন্ন বস্তুর শক্তি ঋণাত্বক হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এটা ঋণাত্বক হলে সেই বস্তুটিকে এমন একটা গতিশীল অবস্থায় তৈরি করা সম্ভব হতো, যেন বস্তুটির গতিশক্তি তার নিজস্ব ঋণাত্বক শক্তিকে কাটাকাটি করে ফেলে। এই ঘটনা সম্ভব হলে যে কোনো জায়গায় হুঠ করে কোনো বস্তুর আবির্ভাব না হওয়ার কোনো কারণ থাকতো না। ফলে শূন্যস্থান তখন অস্থিতিশীল হয়ে পড়তো। কিন্তু বিচ্ছিন্ন বস্তু সৃষ্টি করতে যদি ধনাত্বক শক্তি আবশ্যক হয় তাহলে আর এ ধরণের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ আমরা জানি মহাবিশ্বের মোট শক্তি ধ্রুব। কোনো মহাবিশ্বে স্থানিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এ শর্ত আবশ্যক, না হলে শুন্য থেকে এখানে-ওখানে বিভিন্ন বস্তুর আবির্ভাব ঘটতো।

যদি একটা মহাবিশ্বের মোট শক্তির মান সবসময়ই শূন্য হতে হয়, এবং যদি বস্তুসমূহ সৃষ্টি করতে ধনাত্বক শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহলে শূন্য থেকে আস্ত একটা মহাবিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হলো? এ ব্যাপারটা থেকেই মহাকর্ষের মত নিয়মের প্রয়োজনীয়তা। যেহেতু মহাকর্ষীয় বল আকর্ষী, তাই মহাকর্ষীয় শক্তি ঋণাত্বক। আর তাই মহাকর্ষীয়ভাবে আবদ্ধ দুটি বস্তুকে, যেমন পৃথিবী ও চন্দ্র, পৃথক করতে বাইরে থেকে কাজ করতে হয়। এই ঋণাত্বক শক্তির সাথে বস্তু তৈরিতে প্রয়োজনীয় ধনাত্বক শক্তির ভারসাম্য হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা অতটা সরল নয়। পৃথিবীর মোট ঋণাত্বক মহাকর্ষীয় শক্তি, পৃথিবীকে গঠনকারী কণিকাসমূহের ধনাত্বক শক্তির বিলিয়ন ভাগের এক ভাগেরও কম। এদিকে, একটা নক্ষত্রের মত বৃহৎ বস্তুর ঋনাত্বক মহাকর্ষীয় বল অনেক বেশি হবে, আবার নক্ষত্রটি যত ছোটো হতে থাকবে (অর্থাৎ এর গঠনকারী কণিকাসমূহের পারস্পরিক দূরত্ব যত কম হবে) এই ঋণাত্বক মহাকর্ষীয় বলও তত বাড়বে। কিন্তু এভাবে ঋণাত্বক শক্তি বাড়তে বাড়তে নক্ষত্রটির ধনাত্বক শক্তির সমান হওয়ার অনেক আগেই এটি একটি কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়। আর আমরা জানি কৃষ্ণগহ্বরের শক্তি ধনাত্বক। এসব কারণেই শূন্যস্থান স্থিতিশীল, ফলে নক্ষত্র বা কৃষ্ণগহ্বরের মত বস্তু হঠাৎ করে উদয় হতে পারে না। কিন্তু একটা আস্ত মহাবিশ্ব ঠিকই পারে।

যেহেতু মহাকর্ষই স্থান ও কালকে আকৃতি দানকারী করে, সেহেতু এটা স্থান-কালকে স্থানিক স্থিতি দিলেও একটা সামগ্রিক অস্থিতি দান করে। ফলে পুরো মহাবিশ্বের স্কেলে, বস্তুসমূহের ধনাত্বক শক্তি মহাকর্ষীয় ঋণাত্বক শক্তি দ্বারা ভারসাম্য লাভ করতে পারে। তাই শূন্য থেকে পুরো একটা মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ায় কোনো বাধা থাকে না। যেহেতু মহাকর্ষের মত একটা নিয়ম আছে, সেহেতু একেবারে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব শুরু হতে পারে এবং হয়। যে প্রক্রিয়া আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এই স্বতস্ফূর্ত সৃষ্টিই হচ্ছে কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু থাকার কারণ।এ কারণেই অস্তিত্ব আছে আমাদের। আর তাই মহাবিশ্বকে করার সলতেয় আগুন দিতে কোনো ঈশ্বররের প্রয়োজন নেই।

এখনো প্রশ্ন থাকে, মৌলিক নিয়মসমূহ আমরা যেমন বললাম তেমন কেন? আমরা জানি, একটা পরম তত্বকে অবশ্যই হতে হবে সুসংহত এবং পরিমাপযোগ্য চলকসমূহের সসীম মান অনুমান করতে সক্ষম। ফলে, অবশ্যই মহাকর্ষের মত একটা নিয়ম থাকতে হবে। আর পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এও দেখেছি যে মহাকর্ষের মত একটা তত্বকে সসীম মান অনুমান করতে হলে, এ তত্বে অবশ্যই প্রকৃতির বলসমূহ এবং সেই বল যেসব পদার্থের উপর কাজ

করে, তাদের মধ্যে এক ধরনের মহাপ্রতিসাম্য থাকতে হবে। এম-তত্ত্ব হচ্ছে মহাকর্ষের সবচেয়ে সাধারণীকৃত মহাপ্রতিসম তত্ত্ব। এসব কারণে এম-তত্ত্বই হচ্ছে মহাবিশ্বের একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের একমাত্র প্রার্থী। এটা যদি সসীম হয় – এই সসীমতা এখনো প্রমাণ করা বাকি- তাহলে এটা হবে মহাবিশ্বের এমন একটা রূপায়ণ, যে মহাবিশ্ব নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে। আর আমরা বাধ্য হয়েই এই মহাবিশ্বের অংশ কারণ এ ছাড়া আর কোনো সুসংহত রূপায়ণ নেই।

এম-তত্ত্ব হচ্ছে সেই সার্বিক তত্ত্ব যেটার খোঁজ আইনস্টাইন করেছেন। আমরা মানুষরা - যারা নিজেরাই প্রকৃতির মৌলিক কণিকাসমূহের একটি সন্নিবেশ ছাড়া কিছুই না- তারা যে আমাদের চালনাকারী নিয়মসমূহকে বুঝে ফেলার এত কাছে চলে এসেছি, সেটা নিশ্চয়ই একটা বড় বিজয়। কিন্তু হয়তো সত্যিকার অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে, যুক্তির একটা বিমূর্ত রূপায়ণ থেকে এমন একটা অনন্য তত্ত্বে পৌঁছাতে পারা, যেটা বৈচিত্রময় জিনিসে পূর্ণ যে সুবিশাল মহাবিশ্বকে আমরা দেখি, সেটাকে বর্ণনা ও অনুমান করতে পারে। এই তত্ত্বকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে, এটাই হবে আমাদের প্রায় ৩০০০ বছরব্যাপি অনুসন্ধানের একটা সফল পরিসমাপ্তি। আর এভাবেই আমরা খোঁজ পেয়ে যাবো সেই মহান নকশার।